উদ্যোক্তা উৎসাহ সিরিজ-২

একুশটি ব্যবসা
আপনার জন্য
দেশের জন্য

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

উদ্যোক্তা উৎসাহ সিরিজ-২

একুশটি ব্যবসা

আপনার জন্য দেশের জন্য

মূল রচনা ও আলোকচিত্র

মনজুর শামস

তত্ত্বাবধান

সৈয়দ লুৎফর রহমান

সহযোগী

বদরুল আলম রিশাদ

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

উদ্যোক্তা উৎসাহ সিরিজ-২

একুশটি ব্যবসা : আপনার জন্য, দেশের জন্য

মনজুর শামস

জুন ২০১৭

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাড়ি ১৭, রোড ১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা
ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩
cdipbd@gmail.com, www.cdipbd.org

ডিজাইন ও প্রোডাকশন : ইনফ্রা-রেড, ফোন: ৯১২১৪৭২, ইমেইল : office@irc.com.bd

উন্নয়নযাত্রায় মেধা ও উদ্ভাবনের সহযাত্রী সিদীপ

দেশে কেবল একুশজনই আছেন তা নয়। আছেন হাজারো এমন তরুণ, যারা অনেকেই এখনো সংগ্রামে রত– আমরা যাদের কথা জানিই না। তারা যে আমাদের দেশকে অর্থনৈতিকভাবে কেবল শক্তিশালী করছেন তাই নয়, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদার সঙ্গে উপস্থিত করছেন

বিশ্ব অর্থনীতির উন্নয়নযাত্রায় বাংলাদেশও এখন তুমুল প্রতিযোগিতায় শরিক। দুনিয়াজুড়ে চলমান এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনে মেধার কোনো বিকল্প নেই। এ যুগ মেধার যুগ। যে জাতি যতো বেশি মেধাসম্পন্ন প্রতিযোগিতায় সে জাতি ততো বেশি এগিয়ে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বা বাজার অংশীদারিত্বের জন্য পুরনো প্রযুক্তি, উৎপাদন পদ্ধতি, পণ্যের রঙ-রূপ, আকার-স্বাদ, এমনকি মোড়কও দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। বাজারে আসছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। আসছে নতুন পণ্য। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ক্রেতাগোষ্ঠী, পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তা-উদ্ভাবক। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে বিস্তর। কোনো কোনো পণ্য উৎপাদন ৫ থেকে ৭ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু পরিবর্তন উদ্বেগের কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশ ও মানবদেহের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে। মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক, রাসায়নিক সার ব্যবহার ও কৃত্রিম খাদ্য মানবদেহের ক্ষতি সাধন করছে। আবার এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে পরিবেশ ও মানবদেহবান্ধব বিকল্প খাদ্য উৎপাদন করছেন কোনো কোনো উদ্যোক্তা। নীরবে-নিভৃতে কাজ করে যান এরা। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে প্রচণ্ড জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা সাধনা করছেন। গবেষণা করছেন। পর্যাপ্ত পুঁজি ও লাগসই প্রযুক্তির অভাব, আর্থিক অনটন ও বৈরী পরিবেশের মধ্যেও নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এরা একটি অদম্য স্বপ্ন বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেন জয়ের নেশায়। চলার পথে হোঁচট খাচ্ছেন, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন। অথচ একটু পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এদের কাজটা সহজ হয়ে যায়। শতভাগ সফল হতে পারে তাদের প্রয়াস। দেশের জন্য অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করার সামর্থ্য এদের রয়েছে।

দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নানাক্ষেত্রে ছোটবড় পরিবর্তন ঘটছে। যার কোনো কোনোটির রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। তবে এসবের অনেককিছুই ঘটছে চোখের আড়ালে। একটু গভীরভাবে না তাকালে এসব নজরে পড়তে চায় না।

সম্প্রতি সিদীপ এসব অজানা-অচেনা উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করার

জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য–

১. দেশের আনাচে-কানাচে কঠিন সংগ্রামে রত এই উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করে তাদের পরিচিতি ও পণ্যের পরিচয় তুলে ধরা।
২. তাদের সাফল্যের ইতিহাস ও জীবনের গল্প তুলে ধরে অন্যদের উদ্যোগী হতে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগানো।
৩. সফলতা অর্জনের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় সহযোগিতা করা।
৪. উদ্যোক্তা ও অর্থলগ্নীকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি করা।
৫. এসব উদ্যোগে সরাসরি বিনিয়োগ করা।

ইতিপূর্বে সিদীপ তার গবেষণা কর্মকর্তা মনজুর শামসের গ্রন্থনায় প্রকাশ করেছিল ‘একশত গ্রামীণ উদ্যোক্তার সফল জীবনসংগ্রাম’। তারই ধারাবাহিকতায় সিদীপ এবার মনজুর শামসের মূল রচনা ও আলোকচিত্রে, সৈয়দ লুৎফর রহমানের তত্ত্বাবধানে এবং বদরুল আলম রিশাদের সহযোগিতায় উদ্যোক্তা উৎসাহ সিরিজ-২ ‘একুশটি ব্যবসা : আপনার জন্য, দেশের জন্য’ গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশ করছে।

এর মধ্যে আছে জৈব পদ্ধতিতে ফল ও সবজি চাষ, থ্রিডি অ্যানিমেশন-ভিজুয়াল ইফেক্ট-গেম স্টুডিও, বিশ্ব মানের পনির, যশোরের ক্রিকেট ব্যাটের সম্ভাবনা, বিশ্বখ্যাত বেজিং ডাকের খামার, পাবনায় চার তরুণের দুধ পাস্তুরিকরণ কারখানা, পাহাড়ের কোলে কাজু বাদাম ও কফি চাষ, শুঁটকি রপ্তানি, ঢেউয়ের মাথায় নেচে বেড়ানো সার্ফিং বোর্ড তৈরি, সুস্বাদু সি-উইড চাষ, পাট দিয়ে সাইকেল বানানো ইত্যাদি সময়োপযোগী উদ্যোগের গল্প। আসলে গল্প নয় মোটেও, সব চমক লাগানো সত্যি ঘটনা। বাংলার তরুণ-তরুণীরা কীভাবে তাদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বৈশ্বিক পর্যায়ে তার একটা মনোমুগ্ধকর ছবি পাওয়া যাবে এ গ্রন্থে।

তাই বলে দেশে কেবল এমন একুশজনই আছেন তা নয়। আছেন হাজারো এমন তরুণ, যারা অনেকেই এখনো সংগ্রামে রত– আমরা যাদের কথা জানিই না। তারা যে আমাদের দেশকে অর্থনৈতিকভাবে কেবল শক্তিশালী করছেন তাই নয়, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদার সঙ্গে উপস্থিত করছেন।

গ্রন্থটিতে আলোচ্য উদ্যাক্তাদের জীবনের অনেক আবেগঘন কথা উঠে এসেছে। বর্ণিত হয়েছে বিজয়ের বীরগাঁথা। আবার ব্যর্থতার করুণ চিত্র ও অভিজ্ঞতাও আলোচিত হয়েছে।

তাই পড়তে পড়তে গল্পের মতো মনে হলেও এতে রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য, সাহিত্যের উপাদানসহ অনেক কিছু।

শুধু ভাল লাগার উপাদানই নয়, খুঁজলে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের দিকনির্দেশনাও পাওয়া যাবে এতে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায় বিশ্বাস না করে উপায় নেই যে-

“সাবাস, বাংলাদেশ
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।”

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
নির্বাহী পরিচালক

সূচি

আব্দুল মজিদ সরদার : জৈব চাষে নিরাপদ খাদ্য ০৬
'সাইকোর' স্টুডিও : থ্রিডি অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল ইফেক্ট, গেম ১৬
নাগিনা নাজনীন কেয়া : তৈরি করছেন বিশ্বমানের পনির ২৬
লা মোড : ডিজাইনার লেডিস ফুটওয়্যার ৩৬
কাজু বাদাম চাষি মে মং চৌধুরী ৪৪/৪৯
কফি চাষি রেভারেন্ড কাপখুপ বম ৪৪/৫৫
সি-উইড সমুদ্রজঞ্জাল নয় : সাগরতলের গুপ্তধন ৫৮
পাট দিয়ে সাইকেল ৭২
সুপারি পাতার খোলে ওয়ানটাইম প্লেট ৮২
বিষমুক্ত নিরাপদ শুঁটকি ৮৮
সার্ফিংবোর্ড তৈরি করেছেন আলমগির হোসেন ৯৮
হ্যান্ডমেড পেপার ১০৬
যশোরের ব্যাট ১১৪
মাছ-সবজি-ফল চাষে পরিবেশ সচেতন সাদিকুল ১২৪
কৃষিযন্ত্র বাংলাদেশে এখন এক লাভজনক ব্যবসা ১৩২
বেজিং ডাক ১৩৮
রফতানিমুখী কৃষিশিল্প গড়তে চান সফল ফল খামারী সেলিম রেজা ১৪২
দুধ পাস্তুরিকরণ ও বিপণন ১৫০
কফি ভেন্ডিং মেশিন ১৫৬
ওবায়দুলের সম্রাট কেমিক্যাল কোম্পানি ১৬২
অ্যাকুয়াপনিক্স: একই সঙ্গে মাছ ও সবজি চাষ ১৭০

আব্দুল মজিদ সরদার

জৈব চাষে মানুষের মুখে নিরাপদ খাদ্য তুলে দিতে চান

১৪ নভেম্বর, ২০১৬। চলেছি সেইসব উদ্যোক্তার খোঁজে– যাদের দৃষ্টান্ত পথ দেখাতে পারে বিনিয়োগে উৎসাহী অনেক তরুণকে। সুলুক সন্ধান দিতে পারে সম্ভাবনার গুপ্তমন্ত্রের। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দাপটের সঙ্গে পেরিয়ে গিয়ে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলা সেইসব কীর্তিমানের দোরে দোরে আমাদের নিয়ে চলেছেন আরেক সৃষ্টি-পাগল তরুণ বদরুল আলম রিশাদ, উদ্ভাবনের গন্ধ শুঁকে শুঁকে যিনি চষে বেড়ান দেশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এ যাত্রায় অভিজ্ঞতার শুভাশিস নিয়ে অভিভাবক হয়ে সঙ্গে চলেছেন সৈয়দ লুৎফর রহমান। কালো চকচকে মাহেন্দ্র গাড়িতে আমাদের যশোরের পথে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন তরুণ-দক্ষ চালক শ্যামল ফোলিয়া।

সকাল পৌনে সাতটায় শ্যামল আমাকে গোপীবাগের বাসা থেকে তুলে নিল। আজিমপুর থেকে রিশাদ এবং মিরপুর থেকে লুৎফর ভাইকে গাড়িতে তুলে আমাদের যাত্রা শুরু হলো সোয়া নয়টায়। গন্তব্য যশোরের কেশবপুর উপজেলার সন্ন্যাসগাছা গ্রাম। আগেভাগেই রিশাদ আমাদের জানিয়ে রেখেছিলেন সে গ্রামের খ্যাপাটে চাষি আব্দুল মজিদ সরদারের কথা। খ্যাপাটে বিশেষণটি জুড়ে দিলাম এ কারণে যে, চাষিদের– বিশেষ করে সবজিচাষিদের প্রায় সবাই যখন অতিরিক্ত মুনাফার লোভে কম সময়ে বেশি ফলনের আশায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে মানুষের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিতে ব্যস্ত, তিনি তখন মরিয়া হয়ে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছেন। মানুষের জন্য খাদ্যকে করতে চাচ্ছেন নিরাপদ। আর শুধু কি চাষাবাদ? অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফলন বাড়িয়ে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন সবাইকে। দৃষ্টি কেড়েছেন সারাদেশের সবজিচাষি এবং সবজি ব্যবসায়ীদের। 'নিরাপদ খাদ্য চাই', 'ক্ষেত থেকে শুরু হোক নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন' ইত্যাদি স্লোগানে ব্রতী হয়েছেন এক মহৎ সামাজিক আন্দোলনে। এ লক্ষ্যে তিনি যে লিফলেট প্রচার করছেন সেখানে নিজের এই উদ্যোগকে 'সৃষ্টিশীল-সৃজনশীল ও সেবামূলক' বলে উল্লেখ করেছেন। তার এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে জৈব পদ্ধতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি খামার থেকে সংগৃহীত খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ এবং এটিকে রফতানিমুখী বাণিজ্যে পরিণত করা।

মনে পড়ে যশোরের যত কথা

যশোরের নামকরণ নিয়েও বিচিত্র কাহিনিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে প্রথম ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার। তিনি উল্লেখ করেছেন, বাংলার দীর্ঘদিনের রাজধানী গৌড়ের যশ হরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে নতুন এ রাজ্যের নাম হয়েছিল 'জসর রাজ্য'। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম এ ব্যাপারে লিখেছেন– 'যশোর' শব্দটি আরবি ভাষার 'জসর' শব্দ থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলমানদের অভিযানের আগে অসংখ্য খাল-বিল-নদ-নদী থাকার কারণে এ এলাকার যোগাযোগে সেতু বা সাঁকোর ব্যবহার ছিল অনিবার্য। আরবি 'জসর' শব্দের বাংলা অর্থ সেতু বা সাঁকো। অসংখ্য সাঁকো আর সেতুর কারণে নবাগত মুসলমানেরা এ এলাকার নাম দিয়েছিল জসর। এই জসর শব্দটিই পরিবর্তিত হয়ে পরে হয়েছে যশোর। সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মোগল সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করে এ এলাকার বিদ্রোহ দমনের উদ্যোগ নেন। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের তখনকার শাসক দাউদ খাঁ মোগল আক্রমণের মুখে পড়লে তার প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাদিত্য তার কাছে গচ্ছিত সব ধন-সম্পদ নিয়ে যশোরে এসে ওঠেন এবং এভাবেই যশোর এক সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৮১ সালে এটি জেলা হিসেবে ঘোষিত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন জেলা। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর যশোর জেলা স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার কথা মনে হতেই মনে পড়ে গেল মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের বিখ্যাত 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটির কথা, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ দেশ ঘুরে ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর তিনদিনে তিনি এটি লিখেছিলেন এবং এ কবিতা সারাবিশ্বে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল–

`Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes
On Jessore Road--long bamboo huts
Noplace to shit but sand channel ruts
Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters nowhere to go
--- --- ---
September Jessore Road rickshaw
50,000 souls in one camp I saw
Rows of bamboo huts in the flood
Open drains, & wet families waiting for food'...

গাবতলী, সাভার, নবীনগর পেরিয়ে মহাসড়কে গাড়ির সংখ্যা কিছুটা কমে এলে রাস্তার দু পাশের দৃশ্যে মগ্ন হতে হতে মনে উঁকি দিচ্ছিল যশোরের নানা কীর্তিকাহিনিও। প্রথমেই মনে পড়ে গেল সেখানকার খেজুরের গুড় আর সবজির কথা। সিদীপের জেনারেল ম্যানেজার জনাব আবদুল কাদির সরকার যে উদ্দেশ্যে যশোর যাচ্ছি তা শুনে বলেছিলেন– 'খোঁজ নিয়ে দেখবেন তো, যশোরের বিখ্যাত খেজুরের গুড়কে কোনো উদ্যোক্তা আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা?' রিশাদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে জানালেন, তিনি নিজেই এ ধরনের এক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ছোট ছোট মোড়কে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে কিছু রফতানিও করেছিলেন, কিন্তু টিকতে পারেননি। সবজি উৎপাদনে যশোর এখন দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ এলাকা। আর ফুলচাষে তো পথিকৃৎ! দেশসেরাও।

যশোর নিয়ে মগ্ন ছিলাম মনের ভেতর, খেয়াল করিনি কখন আমাদের গাড়িটি পাটুরিয়া ফেরিঘাটে চলে এসেছে। তখনো আঁচ করতে পারিনি কী ভোগান্তি আছে সামনে। ড্রাইভার শ্যামল ফেরি পারাপারে যে তেমন অভ্যস্ত নয় তা টের পেলাম খানিক পরেই। আমরা মহা উৎসাহে অপেক্ষা করছিলাম আনলোড হতে থাকা এই ফেরিটিতেই পদ্মা পার হবো বলে। ফেরিতে উঠতে হলে যে আগে থেকেই টিকেট সংগ্রহ করতে হয় শ্যামলের তা জানা ছিল না। আর এই জানা না থাকার খেসারত দিতে হলো ঘাটে প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে। ইচ্ছে ছিল দুপুর দুইটা-আড়াইটার ভেতর গন্তব্যে পৌঁছে সেখানকার কাজ সেরে বিকেলের আগেই আরেক উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার নিতে পারব। সবচেয়ে বেশি যে তাগিদটা ছিল তা হচ্ছে দিনের আলো থাকতে থাকতেই দ্বিতীয় গন্তব্যে পৌঁছতে হবে, যাতে ছবি তুলতে কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু সে ইচ্ছেটা পিচঢালা মহাসড়কেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। দ্বিতীয় গন্তব্য তো দূরের কথা, ভীষণ শঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলাম দিনের আলো থাকতে থাকতেই সন্ন্যাসগাছা গ্রামে পৌঁছতে পারব কিনা সেই ভাবনায়।

শঙ্কাটাই ঠিক হয়েছিল। যশোর শহর থেকে রাজাহাট হয়ে কেশবপুর উপজেলার একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে সন্ন্যাসগাছা গ্রামটির অবস্থান। আমাদের গাড়ি সেখানে ঢুকল খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর বাজার হয়ে। এই চুকনগর বাজারেই আব্দুল মজিদ সরদার তার সবজি, ফল ও মাছ বিক্রি করেন। রাস্তার পাশের দোকানগুলোর সাইনবোর্ডে 'চুকনগর' লেখা দেখেই মনে পড়ে গেল '৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যতম ভয়ঙ্কর গণহত্যার কথা। ১৯৭১ সালের ২০ মে এই চুকনগরে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল বর্বর হানাদারেরা।

দুপুর থেকেই টেবিলে খাবার সাজিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন আব্দুল মজিদ সরদার এবং তার স্ত্রী মুক্তা পারভিন। আমরা পৌঁছতেই অভ্যর্থনা জানিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন খাবার পরিবেশনে। আমি বাদ সাধলাম। বললাম– প্রথমে ছবি তুলে নিতে চাই, পরে যেটুকু দিনের আলো আছে তাও থাকবে না। এরপর তিনি আমাকে তার সবজি ক্ষেতে নিয়ে চললেন। সবজি বাগানের ছবি তুলে তার উঠোনজুড়ে চাষ করা নানা ধরনের ঔষধি, মসলা আর ফল গাছের ছবি তুললাম। এরপর খাওয়াদাওয়া সেরে তার সঙ্গে কথা বলতে বসলাম।

আবদুল মজিদ সরদারের বয়স ৬১ বছর।

অনেক ঘাট মাড়িয়ে এখন উঠে-পড়ে লেগেছেন জৈব পদ্ধতির চাষাবাদে। মাছ চাষ করেন এবং সেখানেও কোনো রাসায়নিক ব্যবহার করেন না। তার স্ত্রী মুক্তা পারভিন এলাকার জনপ্রিয় নারীনেত্রী। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা কাউন্সিলর। ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির একজন নেত্রীও তিনি। এই দম্পতির দুই পুত্রসন্তানের বড়জন আবু রায়হান লিখন বিবিএ শেষবর্ষের ছাত্র আর ছোটজন শাহরিয়ার হাসিব স্নাতক পর্যায়ে পড়ার সময়ই বিজিবিতে যোগ দিয়েছেন।

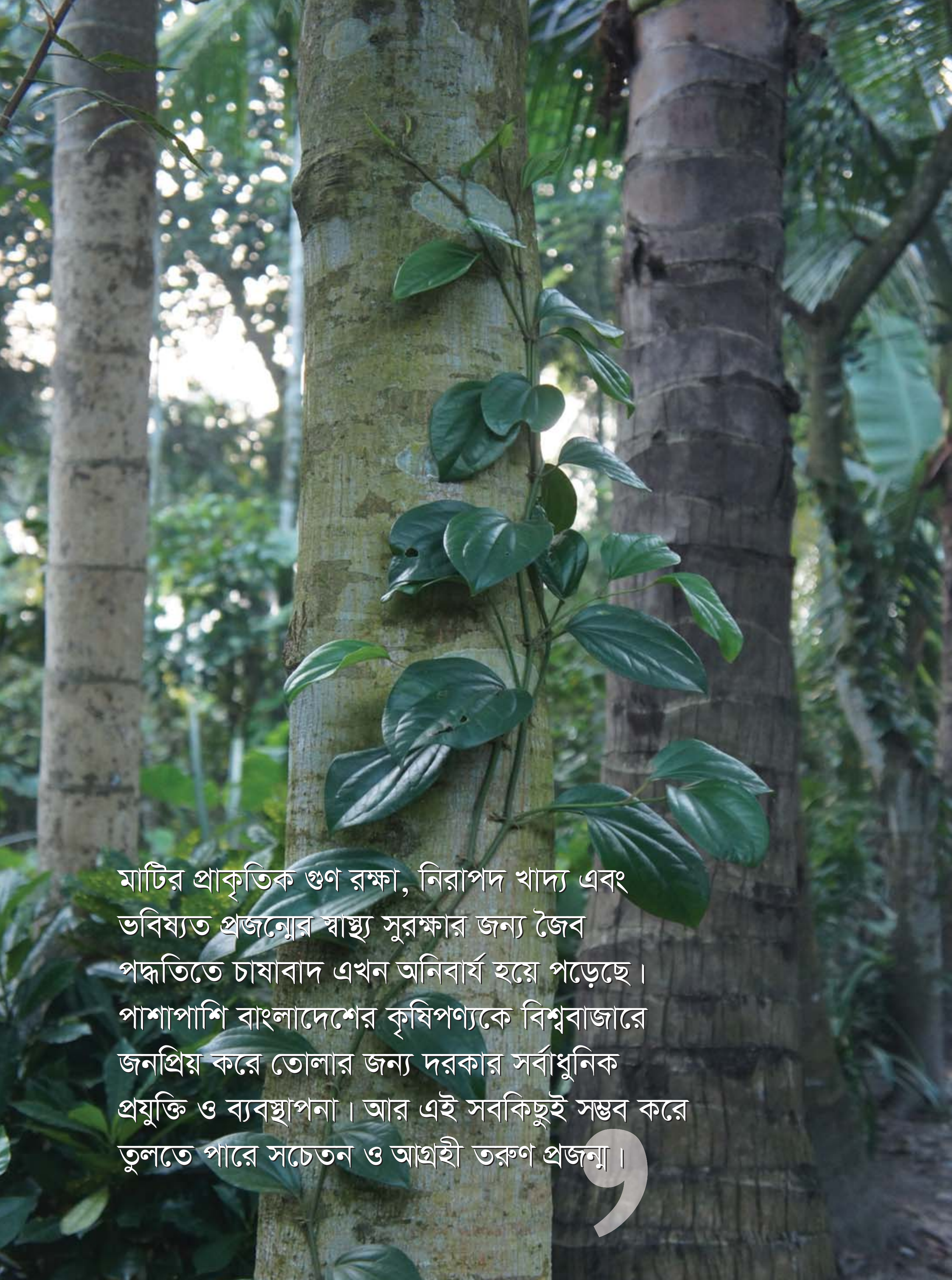

মাটির প্রাকৃতিক গুণ রক্ষা, নিরাপদ খাদ্য এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ এখন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষিপণ্যকে বিশ্ববাজারে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দরকার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা। আর এই সবকিছুই সম্ভব করে তুলতে পারে সচেতন ও আগ্রহী তরুণ প্রজন্ম।

তার এই উদ্যোগটির নাম ইউনিক অ্যাগ্রো ফুড প্রোডাক্টস। 'আব্দুল মজিদ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস' নামে একটি কনসালটেন্সি ফার্মও আছে তার, যেখানে তিনি সাধারণত জৈব পদ্ধতিতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ওপর পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তিনি জৈব পদ্ধতিতে সবজি-ফল-মসলা-ঔষধি এবং মাছ চাষ করেন। উদ্যোগটি শুরু করেছেন ২০০৩ সালে। প্রাথমিক অবস্থায় কোনো পুঁজি ছিল না। শুধু নিজস্ব জমি ছিল ৬ বিঘা। বর্তমানে তার পুঁজি ৫ লাখ টাকা। ২০০৩ সালে উদ্যোগটি শুরু করার কয়েক মাস পর কৃষি ব্যাংক থেকে প্রথমে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। পর্যায়ক্রমে সেখান থেকে তিনি দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নেন। সে ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে তার এই উদ্যোগে মহাজনী ঋণ রয়েছে ৩ লাখ টাকা।

উদ্যোগটি প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল না। তবে লোকসানও হতো না। যা আয় হতো তা দিয়ে সংসার-খরচ মিটিয়ে বাকিটা দিয়ে উৎপাদন-ব্যয় মেটানো যেত। ৪ বছর পর থেকে মোটামুটি লাভের মুখ দেখতে থাকেন।

এখন পর্যন্ত যতটুকু লাভের মুখ দেখেছেন তাতে তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ আশাবাদী। বিশেষ করে মানসিকভাবে। জানতে চাইলাম তিনি এ উদ্যোগে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন তা কি নিজস্ব, নাকি কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ গুণ অর্জন করেছেন। জানালেন– এই উদ্যোগের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তার নিজস্ব। তবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের অধ্যাপকগণ এবং স্থানীয় কৃষিবিদদের পরামর্শ নিয়েছেন।

নিজস্ব উদ্ভাবনে একটি জৈব কীটনাশকও তৈরি করেছেন তিনি! নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখেছেন ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনে তার এই কীটনাশক খুবই কার্যকর, এমনকি রাসায়নিক কীটনাশকের চেয়েও। উপরন্তু এতে বিষমুক্ত ফলন লাভ করা যায়। আতাগাছের পাতা ও শেকড়, মেহগনির ফল, বিষকাটালি, দূর্বা, গাঁদাফুলের গাছ ইত্যাদি শুকিয়ে গুঁড়ো করে একসাথে মিশিয়ে তাতে পরিমাণমতো পানি মিশিয়ে দু সপ্তাহ পচালেই তৈরি হয়ে যায় এই জৈব কীটনাশক।

আব্দুল মজিদের ঔষধি গাছের নার্সারিতে অর্জুনের চারা

'ক্ষেত থেকে শুরু হোক নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন'– নিজস্ব এই দর্শনকে ফলপ্রসূ করতে পারবেন– এই ভরসায় তিনি এ উদ্যোগ শুরু করেছেন। প্রথম অবস্থায় তিনি চুকনগর বাজারে নিজে গিয়ে সবজি ও ফল বিক্রি করতেন। স্থানীয় আড়তেও সবজি সরবরাহ করেন, এ ছাড়া পাইকাররা বাড়িতে এসে তার কৃষিপণ্য নিয়ে যায়।

বাজার সম্প্রসারণের জন্য তিনি 'স্বপ্ন', 'আগোরা'র মতো বাংলাদেশি চেইন শপ এবং বিদেশি বায়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। জানতে চাইলাম তার পণ্যের চাহিদা কেমন। জানালেন সবজি, ফলমূল এবং মাছ বিষমুক্ত বলে সচেতন ক্রেতাদের ভেতর তার পণ্যের ব্যাপক চাহিদা। তবে উদ্যোগটিকে আরো চাঙ্গা করে তুলতে প্রচারের প্রয়োজন। স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা জানতে চাইলে বললেন, আপাতত পারছেন না। আর পারছেন না মূলত পুঁজির অভাবে। যথেষ্ট পুঁজি থাকলে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে পারতেন। তেমনটি পারলে বাধ্য হয়ে তাকে তার কৃষিপণ্য সস্তায় পানির দরে বিক্রি করতে হতো না। এরপর জানতে চাইলাম এ ধরনের উদ্যোগ তিনি কেন গ্রহণ করলেন। বেশ দৃঢ়তার সাথে জানালেন, সমগ্র দেশ এখন বিষাক্ত খাদ্যঝুঁকিতে জিম্মি ও দিশেহারা। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সুস্থ দেহ ও সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তার জন্য তিনি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে তার বাবা মারা যান। বড় দুই ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে এইচএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এরপর পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এক পর্যায়ে ১৯৮১ সালের ২০ জানুয়ারি খালিহাতে বাড়ি ছাড়েন। প্রথমে তিনি খুলনায় গিয়ে এক আত্মীয়ের বাসায় ওঠেন। তার সেই আত্মীয়ের অটোমোবাইলের ব্যবসা ছিল। মোটামুটি বড় ব্যবসায়ী; সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড থেকে মোটর-পার্টস আমদানি করতেন। সেই মুহূর্তে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করাটাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই বিনা পারিশ্রমিকেই সেই আত্মীয়ের ব্যবসায় লেগে গেলেন। শুধু লেগেই গেলেন না, আন্তরিক নিষ্ঠায় অটোমোবাইলের বিভিন্ন পার্টসের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে দক্ষতাও অর্জন করতে থাকলেন। অল্পদিনেই সেই আত্মীয়ের পুরোপুরি আস্থা অর্জন করে নিলেন। সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে আরো দুটি দোকান খুলে দিলেন সেই আত্মীয়ের। অবিবাহিত সেই আত্মীয়ের বিয়ের ব্যাপারেও মুখ্য ভূমিকা পালন করলেন। অটোমোবাইলের বিভিন্ন পার্টস তৈরির উদ্ভাবনী কৌশলও আয়ত্ত করেছিলেন। চার বছর বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার পর তিনি নিজে কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন।

এ সময় ঠিকাদারি করার ইচ্ছে হলো। ১৯৮৩/৮৪ সালে পাবলিক হেলথের লাইসেন্সও বের করলেন। অবশ্য সেখানকার অনিয়ম ও দুর্নীতি দেখে সে ব্যবসা তার আর ভালো লাগেনি। ফিরে আসেন অটোমোবাইলেই। ১৯৮৭ সালে খুলনার সোনাডাঙা বাসস্ট্যান্ডে 'শাপলা অটোমোবাইলস' নামে একটি দোকান খোলেন। মোটামুটি চলছিল। পরের বছর ১৯৮৮ সালে বিয়ে করেন। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে ব্যবসা দাঁড় করাতে পারেননি টাকার অভাবে। কেউ কেউ তার উদ্ভাবিত গাড়িতে ব্যবহৃত লাইটের ছোট ছোট পার্টসের কারখানা খুললে তিনি তাদের নানা

অবিচল উদ্যোক্তার প্রতিচ্ছবি

প্রায় সবাই যখন অতিরিক্ত মুনাফার লোভে কম সময়ে বেশি ফলনের আশায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে মানুষের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিতে ব্যস্ত, তিনি তখন মরিয়া হয়ে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছেন। মানুষের জন্য খাদ্যকে করতে চাচ্ছেন নিরাপদ

পরামর্শ দিতেন। এ সময় অন্য একটি ঝোঁক চেপে বসল তার মাথায়। বিষমুক্ত, জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা ও খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। ১৯৯৪ সালের শেষের দিকে জৈব পদ্ধতির চাষাবাদের জন্য একটি পরামর্শক ব্যবসাকেন্দ্র খোলেন। কিন্তু সে ব্যবসা লাভজনক হয়নি। কোনোভাবেই সুবিধা করতে পারছিলেন না। অগত্যা অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঢাকার পথে পা বাড়ান ১৯৯৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। সে যাত্রায় ঢাকা পর্যন্ত আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। পথের মাঝে মানিকগঞ্জের গোলরায় নেমে পড়েন। সেখানে তার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে এক উদ্যোক্তা গাড়ির মিনিয়েচার বাল্ব তৈরির একটি কারখানা খুলেছিলেন। সেই কারখানায় আব্দুল মজিদ কাটিয়ে দেন ৬ মাস। এরপর ঢাকার মিরপুরে এসে নিজে চামড়ার বেল্ট, মানিব্যাগ ইত্যাদির ছোট্ট একটি ফ্যাক্টরি খোলেন। কিন্তু বিধি বাম! কারিগর একদিন তার পুরো পুঁজি (৩০ হাজার টাকা) নিয়ে পালিয়ে গেলে তিনি একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। সেই বছরই, অর্থাৎ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে এক পরিচিত দরদীজন তাকে মতিঝিলে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ছোট্ট একটি কক্ষে তাকে কম্পিউটার ও ফ্যাক্সের ব্যবসায় লাগিয়ে দেন। কিন্তু সে ব্যবসাও তিনি দাঁড় করাতে পারেননি। ২০০২ সালে পরিবারসহ দেশে ফিরে আসেন শূন্যহাতে। এ সময় তাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন তার ভায়রাভাই আবদুস সামাদ গাজী। মাত্র ৬০ হাজার টাকায় তিনি খুলনায় তার ৫৫ বিঘার একটি চিংড়িঘের তাকে দলিল করে দেন। নিজস্ব জমি বিক্রি করে আব্দুল মজিদ সরকার সেই ঘেরে ৬ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন। বেশ লাভজনক হয়ে উঠতে শুরু করেছিল চিংড়িঘেরটি। কিন্তু এখানেও তাকে হোঁচট খেতে হয়। ২০০৪ সালে ওয়াপদা 'টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টে'র আওতায় পরিচালিত এক প্রকল্পের কারণে বেড়িবাঁধ কেটে দিলে সর্বনাশ হয় তার। চিংড়িসহ সমস্ত ঘের ভেসে যায়। কপর্দকশূন্য হয়ে ফিরে আসেন নিজেদের বাড়িতে। এরপর এক একর জমিতে শুরু করেন জৈব পদ্ধতির সবজি-ফল-মসলা-ঔষধি চাষ। গোলমরিচ, ছোট এলাচ, হলুদ, আদা ইত্যাদি মসলার পাশাপাশি

স্ত্রী মুক্তা পারভিন ও বড় ছেলে লিখনের সঙ্গে আব্দুল মজিদ (বাঁয়ে)

হরীতকী, বহেরা, আমলকী, অর্জুন ইত্যাদি ঔষধি চাষ করছেন নিজের ভিটেতে। আর সফেদা, পেয়ারা, আমড়া, কতবেল, নারকেল, আম-জাম-লিচু ইত্যাদি তো আছেই। এরই মধ্যে রাস্তার পাশে লাগানোর জন্য জেলা পরিষদকে অনেক অর্জুন-চারা সরবরাহ করেছেন। শুধু চাষবাসই নয়, জৈব পদ্ধতিতে চাষ করার প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যও তার এখন ডাক পড়ে বিভিন্ন জায়গায়। তার একটি মাঝারি আকারের পুকুর আছে। দেশি মাছ চাষ করেন সেখানে। মাছচাষেও তিনি কোনো রাসায়নিক ব্যবহার করেন না। সেটিও দিনদিন বেশ লাভজনক হয়ে উঠছে।

প্রতিযোগিতায়
টিকে থাকতে হলে
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির
কৃষিযন্ত্রপাতি
ব্যবহার
অপরিহার্য
- আব্দুল মজিদ সরদার

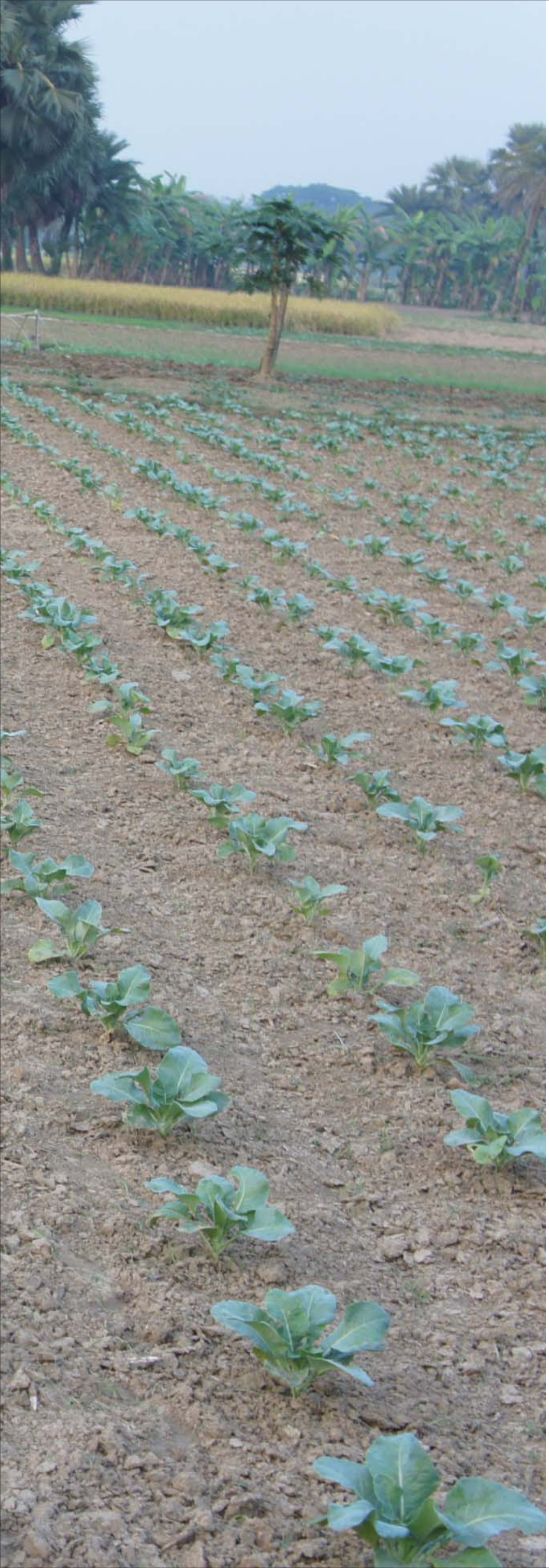

এবার জানতে চাইলাম, মানবস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ চমৎকার উদ্যোগটি গড়ে তুলতে তাকে কী কী প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়। বললেন– সরকারের জৈব নীতিমালার অভাব, পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব, দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিপণন সুবিধার অভাব– এগুলোই হচ্ছে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। চট করে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কীভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে পেরেছেন। কিছুটা হতাশার সঙ্গে জানালেন, ছোটখাটো দু-একটা প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা সম্ভব হলেও বেশির ভাগ প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে এখনো পর্যন্ত তিনি অক্ষম। তবে ভবিষ্যতে পারবেন বলে আশাবাদী।

নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে জানতে চাইলে বললেন, মাটির প্রাকৃতিক গুণ রক্ষা, নিরাপদ খাদ্য এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ এখন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষিপণ্যকে বিশ্ববাজারে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দরকার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা। আর এই সবকিছুই সম্ভব করে তুলতে পারে সচেতন ও আগ্রহী তরুণ প্রজন্ম। তাই নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার প্রতি পরামর্শ থাকবে তারা যেন এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে দৃঢ় মনোবলে জৈব পদ্ধতির চাষাবাদ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে লেগে থাকে।

সীমিত সঙ্গতির কারণে তিনি এখনো হাতে-চালানো প্রচলিত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। তবে মনে করেন, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কৃষিযন্ত্রপাতি ব্যবহার অপরিহার্য। তার স্থায়ী জনবল ৩জন। তবে কখনো কখনো ১০ থেকে ১৫ জনও দরকার হয়। এর ভেতর দক্ষ ২জন। এখনো তিনি নিজস্ব হিসেবের খাতায় নিজেই হিসেব লিখে রাখেন। তবে তিনি ই-কমার্সের পক্ষে।

এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সম্পর্কে বললেন, সচেতন তরুণ সমাজ এবং সরকারের সার্বিক সহযোগিতা পেলে এ ধরনের চাষের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

আব্দুল মজিদ সরকার তরুণ, সচেতন কৃষি-উদ্যোক্তাদের সামনে এক অনুকরণীয় উদাহরণ। এই স্বাপ্নিক চাষির শুভকামনা করে আমরা বিদায় নিলাম রাত প্রায় আটটার দিকে। ■

স্ক্যান্ডিনেভিয়া জয় করে হলিউডের পথে 'সাইকোর' স্টুডিও

থ্রিডি অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল ইফেক্ট, গেম

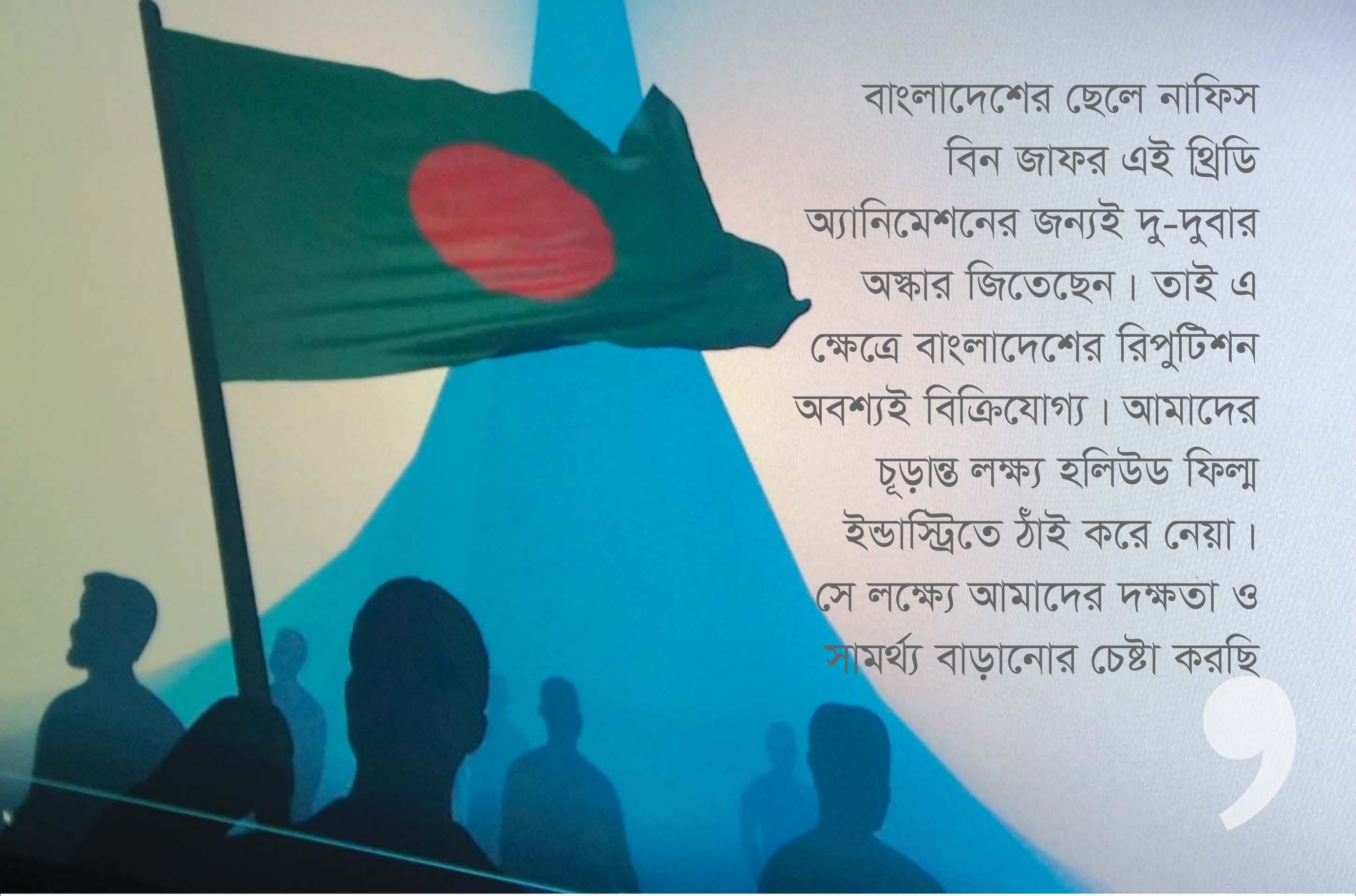

বাংলাদেশের ছেলে নাফিস বিন জাফর এই থ্রিডি অ্যানিমেশনের জন্যই দু-দুবার অস্কার জিতেছেন। তাই এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রিপুটিশন অবশ্যই বিক্রিযোগ্য। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ঠাঁই করে নেয়া। সে লক্ষ্যে আমাদের দক্ষতা ও সামর্থ্য বাড়ানোর চেষ্টা করছি ’

আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে দেশ এবং বিশ্ববাজারে এই সময়ের সম্ভাবনাময় কোন কোন খাতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা সফলতার পরিচয় দিচ্ছেন। যারা মোটামুটি দুই/তিন কোটি টাকা বিনিয়োগের সঙ্গতি রাখেন, অথচ খুঁজে পাচ্ছেন না বা ভরসা পাচ্ছেন না ঠিক কোন ধরনের উদ্যোগে বিনিয়োগ করলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হবে না– তাদের জন্য নির্ভরযোগ্য উদ্যোগের খোঁজ দিতেই আমাদের এই সুলুক সন্ধান। কম্পিউটারকেন্দ্রিক সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি খাতেও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ। নানা ধরনের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, আউটসোর্সিং, অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল ইফেক্ট ইত্যাদি প্রযুক্তিতে অনেকেই দেশ ছাড়িয়ে ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছেন বহির্বিশ্বেও। রিশাদ এমনই এক উদ্যোগের খোঁজ আনলে তাই সোৎসাহে চলে গেলাম উত্তরায়। গন্তব্য সাইকোর স্টুডিও, যেখানে তিন তরুণ উদ্যোক্তা নিজস্ব মেধা আর কর্মকৌশলে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন সাফল্যসোপান বেয়ে।

২০১৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারিতে যখন আমরা উত্তরার সাইকোর স্টুডিওতে পৌঁছলাম তখন তিন তরুণের দুজনই ছিলেন অনুপস্থিত। ছিলেন কেবল হেড অব অপারেশন্স কাজী তানজিদুল এরশাদ। সিইও মুরাদ তালকিন এবং আরেক উদ্যোক্তা আইসাম মোহাম্মদ কামাল অফিসের বাইরে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন।

মাঝারি গড়নের তানজিদুল এরশাদ তাদের স্টুডিওতে আমাদের স্বাগত জানালেন। তার চোখ-মুখ এবং গোটা অবয়ব থেকে মেধার আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে। পরিচয়পর্ব সেরে প্রথমেই জানতে চাইলাম তারা ঠিক কী কী কাজ করেন। জানালেন এখন তারা মূলত অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল ইফেক্ট, গেম ডেভেলপ, সফটওয়্যার ডেভেলপ, ফেসবুক বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন বিজ্ঞাপন ইত্যাদি করেছেন। এইসব কাজ করার জন্য তাদের স্টুডিওতে এমনসব কারিগরি প্রযুক্তির সন্নিবেশ রয়েছে যা দেশের অন্য কোথাও নেই। কোনো বস্তুর বাস্তবিক সরা-নড়ার দৃশ্য ধারণের জন্য তাদের এমন যন্ত্রকৌশল

রয়েছে, যা বাংলাদেশে প্রথম সংযোজন। **থ্রিডি অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরির জন্য তারাই প্রথম বাংলাদেশে অটোডেস্ক মায়ার ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।** ২০১০ সাল থেকে তারা এই স্টুডিওটি চালিয়ে আসছেন। শুরু করেছিলেন ৩ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে। বর্তমান পুঁজি প্রায় দুই কোটি টাকা। তারা ঋণী আছেন ১ কোটি টাকা, কিন্তু কোনো ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেননি, নিয়েছেন তিনজনের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে। প্রথমে বেশ লাভজনক ছিল, কিন্তু ২০১৫ সালে লিমিটেড কোম্পানি করায় মুনাফার হার কমে গেছে। প্রথম অবস্থায় তাদের বার্ষিক লাভের হার ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ। তাদের বর্তমান মুনাফার হারে তিনি সন্তুষ্ট কিনা জানতে চাইলে জানালেন– হ্যাঁ তিনি সন্তুষ্ট। তবে এই হার আরো অনেক বাড়িয়ে নিতে চান।

এরপর জানতে চাইলাম, এই যে তারা দেশে-বিদেশে এতো সুচারুভাবে কাজ করে চলেছেন, দৃষ্টি কাড়ছেন আগ্রহীদের, সম্প্রসারণ করে চলেছেন ব্যবসা– এই চমৎকার ব্যবস্থাপনাটা কি তাদের নিজস্ব, নাকি এর ওপর কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিলেন– একেবারেই তাদের নিজস্ব। তাদের তিনজনেরই রয়েছে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান চালানোর পূর্বঅভিজ্ঞতা। তাদের সিইও মুরাদ তালকিন থ্রিডি অ্যানিমেশনের ওপর স্নাতক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইউনিভার্সিটি থেকে। তিনি নিজে যুক্তরাজ্যের বেশ কয়েকটি সংস্থায় আইটি সেকশনে বিভিন্ন পদে চাকরি করেছেন। আর আইসাম মোহাম্মদ কামাল বেশকিছুকাল গ্রামীণফোনে কাজ করেছেন। সুতরাং তিনজনই তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এই স্টুডিওর ব্যবস্থাপনা সাজিয়েছেন।

এবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ব্যক্তিগতভাবে কোন ভরসায় এই উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে জড়ালেন? জানালেন, তাদের সিইও মুরাদ তালকিনই মূলত তার আস্থা ও ভরসার স্থল। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ফুল সেইল ইউনিভারসিটি থেকে মুরাদ থ্রিডি অ্যানিমেশনের ওপর স্নাতক করে এসে বেশ সুনামের সঙ্গে দেশের কয়েকটি সংস্থায় কাজ করেছেন। থ্রিডি অ্যানিমেশনের ওপর বিশ্বের সবচেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি হচ্ছে ফুল সেইল ইউনিভারসিটি। আরেক ব্যবসায়ী শরিক আইসাম মোহাম্মদ কামাল গ্রামীণফোনে বেশ দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন। সুতরাং দুই শরিকের ব্যবসায়ী অভিজ্ঞতাই তার ভরসার জায়গা। তবে সব চাইতে বড় ভরসা ছিল মুরাদ তালকিন। তিনি এ পেশায় এতো মটিভেটেড একজন পারসন যে তার ওপরে ভরসা করাই যায়।

যে কোনো ব্যবসার জন্যই মার্কেটিং তথা বাজারজাতকরণ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাই তার কাছে জানতে চাইলাম– প্রথম অবস্থায় কীভাবে বাজারজাত করতেন। জানালেন– প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে, তারপর ই-মেইল মার্কেটিং, ফেসবুক মার্কেটিং এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা বাজারজাতকরণের কাজটুকু সারতেন।

তিনি থামতেই জানতে চাইলাম– এখন কীভাবে বাজারজাত করছেন? জানালেন ইউরোপে, বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর জন্য তাদের একজন নিজস্ব প্রতিনিধি রয়েছেন। তিনি নরওয়ের বাসিন্দা। বিজনেস অ্যাগ্রিমেন্টের ওপর নির্ভর করে তার মাধ্যমে তারা ইউরোপে মার্কেটিং করছেন। ওয়েবসাইট

> ইউরোপে, বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর জন্য তাদের একজন নিজস্ব প্রতিনিধি রয়েছেন। তিনি নরওয়ের বাসিন্দা। বিজনেস অ্যাগ্রিমেন্টের ওপর নির্ভর করে তার মাধ্যমে তারা ইউরোপে মার্কেটিং করছেন। ওয়েবসাইট পরিচিতির ভিত্তিতে ফোনে যোগাযোগ করে, অনলাইনে যোগাযোগ করে ক্রেতারা তাদের কাছে আসে

পরিচিতির ভিত্তিতে ফোনে যোগাযোগ করে, অনলাইনে যোগাযোগ করে ক্রেতারা তাদের কাছে আসে। তা ছাড়া বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের (বিএএসআইএস) ক্যাটালগে তাদের স্টুডিওর পরিচিতি এবং প্রোডাক্ট প্রোফাইল রয়েছে– এর মাধ্যমেও গ্রহকেরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

এতক্ষণ মনের ভেতরে যে কৌতূহল চেপে রেখেছিলাম এবার তার বাঁধন খুলে দিলাম। জানতে চাইলাম তারা কীভাবে কী কী কাজ করেন? এবার তিনি বলে যেতে থাকলেন তাদের কার্যক্রম– 'টিভিতে যে অডিও ভিজুয়াল ইমেজগুলো দেখেন তা দুই রকম; আগে যেগুলো হতো সেগুলো ছিল টুডি প্রেজেন্টেশন। টম অ্যান্ড জেরি, টারজান, মীনা– এই সবই ছিল টুডি অ্যানিমেশন বা ট্রাডিশনাল অ্যানিমেশন। হাতে ড্রয়িং করে এই কার্টুনগুলো তৈরি করা হতো। কম্পিউটার থ্রিডি অ্যানিমেশন আসার আগে এই টুডি অ্যানিমেশনই ছিল বিশ্বসেরা।

পরবর্তীতে আমরা অ্যানিমেশনের মেইন স্ট্রিম যেটা, সেটাতে ঢুকি। বিশ্বে এখন থ্রিডি কম্পিউটার অ্যানিমেশনেরই জয়জয়াকার। বেশ কয়েকটি সফটওয়্যারের সাহায্যে বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে তৈরি করা হয় থ্রিডি অ্যানিমেশন। এই থ্রিডি অ্যানিমেশনের কাজ খুব বেশি একটা হয়নি আমাদের দেশে, অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। তবে ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড যেটা, অর্থাৎ হলিউড স্টান্ডার্ড– সেই ধরনের থ্রিডি অ্যানিমেশন আমাদের দেশে প্রায় হতোই না বলা যায়। এটাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যে টুলটি তার নাম অটোডেস্ক মায়া। এই মায়ার প্রোপার কোনো পাইপলাইন বাংলাদেশে ছিলই না। এই পাইপলাইন বলতে আমি বোঝাচ্ছি– কেউ আপনাকে কোনো থ্রিডি অ্যানিমেশন করতে দিল– তাকে সেই সংক্রান্ত সব কাজ ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটিতে করে একসাথে ফিনিশ্ড প্রোডাক্ট তাকে সরবরাহ করা। ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি বলতে আমি বোঝাচ্ছি পিক্সার বা ড্রিমওয়েভ ইত্যাদি বিশ্বখ্যাত স্টুডিওতে যে মানের কাজ করা হয়। এই স্ট্যান্ডার্ডের কাজ করার স্টুডিও ভারতে কিছু আছে, আমাদের দেশে ছিলই না। এই মানের কাজ আমরা করতে চাই বলেই এই স্টুডিওটা চালু করেছি। এই উদ্দেশ্যেই আমরা কয়েকজন কর্মী নিয়োগ করতে চাই এবং তাতে প্রথমেই একটা হোঁচট খাই। আমরা যে ধরনের কাজ করতে চাই সেই ধরনের দক্ষ কর্মী পাওয়া যায়নি। থ্রিডি অ্যানিমেশন করতে আমাদের টেকনোলজিক্যালি তিন-চারটি ধাপ অকিক্রম করতে হয়। একেবারে ছোট করে করতে হলেও প্রত্যেকটা ধাপে এক/দুইজন লোক তো লাগেই। প্রথমেই লাগে কনসেপ্ট আর্টিস্ট। তাকে চারুকলা ব্যাকগ্রাউন্ডের হতে হয়। তার কিছু ডিজিটাল প্লাটফর্মে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। রেদারট্যাঙ্ক, ড্রয়িং-অন, পেন্সিল অ্যান্ড পেপার ইত্যাদিতে দক্ষ হতে হবে। এই কাজে আমাদের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড সিনারিও করতে হয় আর সেই কাজগুলোই এদের করতে হয়। এরপর লাইট অ্যান্ড শেডিং, আরডি, মডেল আর্ট– যারা ক্যারেকটারগুলো তৈরি করবে, যেমন একটি মাছি তৈরি করা দরকার, একজন স্পোর্টসম্যান তৈরি করা দরকার, একজন পথচারী তৈরি করা দরকার, এগুলো তারা করবে। এগুলো বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ।

আরো লাগে যারা রিগ আর্ট করবে, যেটিকে আমরা রিগিং

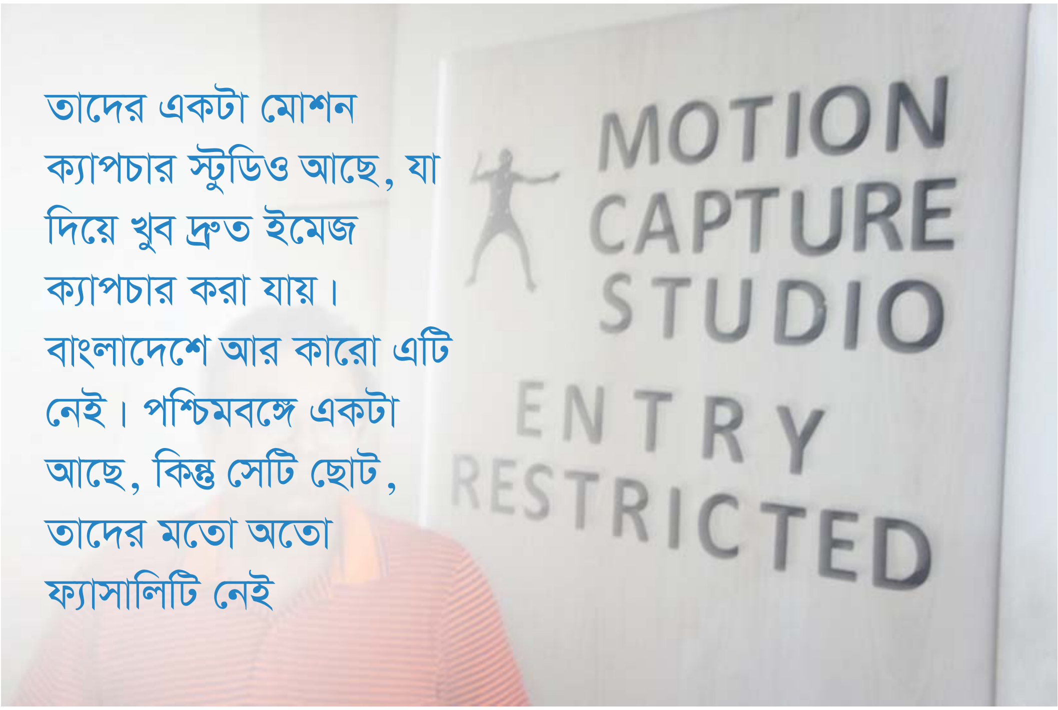

তাদের একটা মোশন ক্যাপচার স্টুডিও আছে, যা দিয়ে খুব দ্রুত ইমেজ ক্যাপচার করা যায়। বাংলাদেশে আর কারো এটি নেই। পশ্চিমবঙ্গে একটা আছে, কিন্তু সেটি ছোট, তাদের মতো অতো ফ্যাসালিটি নেই

বলি– আমরা যখন কোনো মডেল তৈরি করি তখন তার একটি স্কেলিটন, অর্থাৎ মেরুদণ্ড দাঁড় করাতে হয় মডেলটিকে মুভ করানোর জন্য– এটিই হচ্ছে রিগিং। এবং তার পরে হলো অ্যানিমেশন। একটা মডেলকে দিয়ে আমরা অ্যাকটিং করাই তার ভেতরে। থ্রিডিতে সুবিধা হলো ঐ একই ক্যারেকটারকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ব্যবহার করে বিভিন্ন স্টোরি করা যায়। তো এই ধাপগুলোতে দক্ষ কর্মীর দরকার। এই অ্যানিমেশনের ব্যবহার বহুমুখী। যেমন কোনো ওয়েবসাইট ওপেন করলেই ছোট্ট একটা ইন্ট্রো দেখায়, তারপর কিছু একটা প্রেজেন্টেশন দেখানোর পরে মূল ওয়েবসাইটটা আসে– এটা একটা কনসেপ্ট। মূল কাজ হচ্ছে অ্যানিমেশন, মডেল, স্পেশাল ইফেক্ট। এইসব করতে গিয়ে দেখলাম হাতে গোনা খুব অল্প লোক আছে যারা অল্প অল্প এই কাজগুলো পারে। মোদ্দাকথা হচ্ছে পুরো কাজের দক্ষ কর্মী পাচ্ছিলাম না। কারণটা হলো কেউ পুরো কাজটা একসঙ্গে করতো না, অর্থাৎ ফুল চেইনটা মেইনটেইন করতো না। বিচ্ছিন্নভাবে একেকটা অংশ করতো। দেখবেন টিভিতে খবর শুরু হওয়ার আগে একটি অ্যানিমেশন দেখায়। হয়তো ঐ চ্যানেলের যে এটি করেছে সে শুধু ঐটুকুই পারে বা অ্যানিশেনটি হয়তো বিদেশ থেকে করিয়ে এনেছে– এ রকম আরকি! তাই আমরা ঠিক করলাম একটা প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করব। চাইছিলাম যারা প্রশিক্ষণ নেবে তারা তাদের নিজেদের মতো কাজ করুক এবং যারা সেখানে ভালো করবে তাদের ভেতর থেকে আমরা অনবোর্ড করব, অর্থাৎ কর্মী নিয়োগ করব। সে অনুযায়ী আমরা অটোডেস্ক মায়ার ওপর প্রশিক্ষণ করাই এবং যারা ভালো করছে তাদেরকে দিয়ে ইন্টার্নশিপ করাই। বছর দেড়েক ধরে আমরা এই কোর্সটি চালাচ্ছি। এর ভেতর আমরা মেইনস্ট্রিমে কিছু কাজ করেছি, ইউরোপেও কিছু কাজ করেছি।'

এ পর্যায়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এভাবে শুরু করলেন, কিন্তু আপনারা তো এখানে বেশকিছু অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, তো সেই বিনিয়োগের রিটার্ন পাওয়ার জন্য আপনারা কী কী উদ্যোগ নিচ্ছেন। জবাবে জানালেন, 'আমাদের ফাইন্যান্সের ব্যাপারটা খোলাসা করে বলি। যখন ঠিক করে ফেললাম যে থ্রিডি অ্যানিমেশন স্টুডিও করব তখন মূলধন সংগ্রহের জন্য ভাবলাম নির্ধারিত ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ইএফআর ঋণের জন্য আবেদন করব। কিন্তু ব্যাপারটা এতো জটিল! আর প্রতিবছরই এর পলিসি বদল হয়; তা

ছাড়া এটা মোটেও প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল নয়; সেখানে বেশকিছু আনঅফিসিয়াল খরচ করতে হয় লোন পেতে; তার ওপর আমাদের মুনাফার বড় একটা অংশ দিয়ে দিতে হবে ব্যাংককে; আমরা আসলে এতো ঘোরপ্যাঁচ পছন্দ করি না, আর এভাবে কাজ করতে আমরা মোটেও প্রস্তুত নই এবং আমাদের জন্য সেটা গ্রহণযোগ্যও নয়। কেউ যদি জেনুইনলি, অনেস্টলি ইনভেস্ট করে, ব্যাপারটা যদি উইন-উইন কন্ডিশনের হয় তা হলে হয়তো ভেবে দেখা যায়। যদি ব্যাংককেই মুনাফা দিয়ে দিই তা হলে আমরা চলব কীভাবে? আমাদের তো সেক্ষেত্রে কোনো গ্রোথ হবে না। আমরা তাই ঠিক করলাম কারো কাছ থেকে ঋণ নেব না। অগত্যা আমরা আমাদের অপারেশন চালু করার জন্য নিজেদের ফান্ড থেকেই তহবিল সংগ্রহ করলাম, অর্থাৎ আমরা পার্সোনাল লোন নিয়ে অপারেশন চালু করে দিলাম এবং সেখান থেকে প্রতিমাসে কিছু কিছু করে তিনজনই রিটার্ন নিচ্ছি। আমাদের এখন যে অপারেশন তাতে কিছু সারপ্লাস থাকে; একেবারে আহামরি কিছু নয় ঠিকই, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ চলে যাচ্ছে আরকি! আমাদের পারসোনাল লোন যদি পে-ব্যাক হয়ে যায় তখন ভালো একটা পজিশনে থাকব।'

এরপর আমি তাদের বাজারজাতকরণের ব্যাপারটা জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন, 'আগেই আমাদের কিছু ফুটপ্রিন্ট ছিল। আমাদের এই সাইকোর স্টুডিওটি লিমিটেড কোম্পানি হওয়ার আগে সাইকোর স্টুডিওস নামে প্রোপ্রাইটারশিপ একটা ছোট ফার্ম ছিল আমাদের বাকি দুই পার্টনারের। তারা সেখানে ব্যক্তিগতভাবে কিছু কাজ করতো। বেশিরভাগ টেলিকমিউনিকেশনের কাজ করতো, তারপর বিটিসিএলের কিছু কাজ করেছি– ওয়েবসাইট তৈরি, অ্যানিমেশন এবং কয়েকটি ব্যাংকের মিউজিক ভিডিও তৈরি (শুটিং এবং অন্যান্য কাজ) ইত্যাদি। তারপর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে– সেখানে আমাদের কাজের কিছু উদাহরণ আছে। এগুলো থেকে কিছু কাজ আসে। পাশাপাশি আমরা কিছু ফেইসবুক মার্কেটিং করি, যেটি খুবই পপুলার। কোনো প্রতিষ্ঠান চাইলে ফেইসবুকে বিজ্ঞাপন দিতে পারছেন তো আমরা; সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ফেইসবুক বিজ্ঞাপন করে থাকি। এ ছাড়া প্রতিমাসে আমরা একটা স্টুডিও ট্যুরের ব্যবস্থা করি। তাতে আমরা আগ্রহী বায়ারদের আমন্ত্রণ জানাই এবং আমাদের কাজ ও ফ্যাসালিটিগুলো দেখাই এবং ইফরমেশন দিই– কী কী কাজ হচ্ছে। তো এ থেকে অনেকে কিছু ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে আসে, অনেকে আমাদের ট্রেইনিং প্রোগ্রামে যোগ দেয়। আর আমাদের কয়েকজন বন্ধু আছেন স্ক্যানডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলোতে, যাদের সঙ্গে আমরা প্রোফিট শেয়ার অ্যাগ্রিমেন্টে কিছু কাজ করি। তারা মূলত আমাদের হয়ে মার্কেটিং করে থাকেন। ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ডে আমাদের বেশকিছু কাজের মার্কেটিং করতে পেরেছি এভাবে। তারা কিছু মিউজিকও করে গেছে আমাদের এখানে এসে। হাইপার রিয়েলিস্টিক ইমেজও অনেকে তৈরি করিয়ে নেয় আমাদের দিয়ে। আমাদের এখানে সব ভিজুয়াল, স্টিল হোক, অ্যানিমেটেড হোক, অর্থাৎ চোখে দেখা যায় এমন ধরনের কাজ হয়। এ ছাড়া আমরা গেম ডেভেলপমেন্ট করি।' এ পর্যায়ে জানতে চাই গেমের মার্কেটটা কেমন, এটা তো অনেক বড় মার্কেট, নাকি? তিনি জানান, 'এটা অনেক বড় একটা মার্কেট, বিলিয়নস ডলারের মার্কেট। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডেস মানুষ স্যালারি পেয়ে ঐদিনই থার্টি পারসেন্ট খরচ করে গেম কেনার জন্য। তো গেম মার্কেট ইজ বুমিং। এটা আমাদের সঙ্গে বেশ যায়, এখানে অনেক অ্যানিমেশন করতে হয়, ভিজুয়াল ইফেক্টের দরকার হয়।'

এরপর তিনি আমাকে তাদের তিন তরুণ উদ্যোক্তার ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই স্টুডিওকে একটি লিমিটেড কোম্পানিতে রূপ দেয়ার গল্পটি শোনালেন। তিনি বলে চললেন– 'আমাদের মূল সংগঠক, সমন্বয়ক এবং পরিচালক হচ্ছেন মুরাদ তালকিন (২৭)। এই থ্রিডি অ্যানিমেশনের ওপর তিনি মোটামুটি একজন বিশেষজ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্রের যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন সেখানে তার সাবজেক্টই ছিল থ্রিডি অ্যানিমেশন। আগে থেকেই তিনি এই সাইকোর স্টুডিও চালাতেন এবং এখানে টুডি অ্যানিমেশন করতেন। তিনি আমাদের অনেক জুনিয়র যদিও, কিন্তু তিনজন মিলে এটিকে লিমিটেড কোম্পানি করার পেছনে তিনিই ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। আমাদের আরেক পার্টনার আইসাম মোহাম্মদ কামাল (৩৫) আমার বন্ধু। তিনি গ্রামীণফোনের বেশ উপরের দিকের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তো মুরাদ তালকিন তখন গ্রামীণফোনের জন্য টুডি অ্যানিমেশনের কিছু কাজ করতেন। সেই সুবাদেই আইসাম মোহাম্মদ কামালের সঙ্গে তার পরিচয়। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা। কামালের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আমিও (৩৫) এক সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠি তার। আমি নিজেও দীর্ঘদিন ধরে আইটি সেকশনে কাজ করছি। তো আমরা প্রায়ই ইনফরমাল আলোচনা করতাম এ ধরনের কাজ করা যায়

কিনা। বেশকিছুদিন আলোচনার পর আমরা এই স্টুডিওকে একটি লিমিটেড কোম্পানি করে থ্রিডি অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল ইফেক্ট, গেম ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি কাজ করব বলে সম্মত হই এবং এই স্টুডিওকে একটি লিমিটেড কোম্পানিতে রূপ দিই ২০১৫ সালে। মুরাদ তালকিনকে এটির সিইও করা হয়। ফাইন্যান্সার হিসেবে আমি ও কামাল বেশ বড় অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করি। আমি এই কোম্পানির হেড অব অপারেশন্সও।'

তিন উদ্যোক্তার একজনকে পেয়েছিলাম, তাই শুধু তারই, মানে কাজী তানজিদুল এরশাদেরই ব্যক্তিগত তথ্য জানা সম্ভব হলো। তার বাবা মরহুম কাজী আনোয়ার হোসেন ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মসের ডেপুটি রেজিস্ট্রার, আর মা কাজী রেহানা হোসেন প্রিন্টিং ব্যবসায় জড়িত। তার অন্য কোনো ভাই নেই, বোন রয়েছে তিনজন। ভাই-বোনদের ভেতর তিনিই সবার বড়। তার পিঠেপিঠি ছোট বোন বিবাহিত এবং সে কানাডায় থাকে আর ছোট দুই বোন স্কুলে পড়ে। তিনি ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৯৯৬ সালে এসএসসি এবং ১৯৯৮ সালে এইচএসসি পাস করেন। এরপর তিনি ২০০২ সালে ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানে তিনি কম্পিউটার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর স্নাতক করেন এবং মাস্টার্স করেন ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। তার স্পেশালাইজেশন ছিল বায়োমেডিক্যাল ইনফরমেটিভ। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি সেখানে কাজও করতেন। মাস্টার্স পাসের পর তিনি উলওয়ার্থস নামের একটি প্রতিষ্ঠানে আইটি সেকশনে টিম লিডার হিসেবে কাজ করতেন এবং এর পাশাপাশি ক্যাপিটাল সলিসিটর, ব্লকবাস্টার ইত্যাদি নামের বেশ কয়েকটি সংস্থায় পার্টটাইম জব করতেন এই আইটি সেকশনেই। এরপর ২০১০ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ২০১১ সালের প্রথম দিকে এক সিকিউরিটির সিআইও (চিফ ইফরমেশন অফিসার) হিসেবে কাজে যোগ দেন। এখনো সে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এরপর এই স্টুডিওটি লিমিটেড কোম্পানি হওয়ার পর এখানে টাকা বিনিয়োগ করেন এবং হেড অব অপারেশন্স হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি একটি চমকপ্রদ তথ্য দেন– বাংলাদেশে তিনিই প্রথম ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজার এবং প্রথম তিন বছর তিনিই ছিলেন বাংলাদেশে একমাত্র ফেসবুক অ্যাডভারটাইজার। এখনো তিনি ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থেকে এ কাজ করেন। তবে একটু বড় ধরনের কাজ হলে এই সাইকোর স্টুডিওর মাধ্যমে করেন।

এরপর জানতে চাইলাম বাজার সম্প্রসারণের জন্য তারা কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? জানালেন– মান নিয়ন্ত্রণ এবং দিনদিন মানের আরো উৎকর্ষ সাধনই এ ক্ষেত্রে তাদের মোক্ষম অস্ত্র। কিছুটা গর্বের সঙ্গেই বললেন, এই উপমহাদেশে সর্বোচ্চ মানের থ্রিডি অ্যানিমেশন এবং ভিজুয়াল ইফেক্ট সরবরাহ করতে পারেন তারা। তাদের ইনফরমেশন-পণ্যের চাহিদা কেমন জানতে চাইলে

জানালেন– তাদের পণ্যের প্রচুর চাহিদা। ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, চাহিদাটা হচ্ছে গ্লোবাল। বাইরের যারা এ ধরনের কাজ করায় তারা অনেকে জানে না যে বাংলাদেশে এমন একটা স্টুডিও আছে এবং এ ক্ষেত্রে আমরা একটি এস্টাবলিশ্‌ড ফার্ম। আমাদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানা না থাকার কারণে বিশ্বের বড় বড় কোম্পানি আমাদের দিয়ে কাজ করানোর বেলায় কিছুটা দ্বিধায় থাকে। তবে বিশ্বব্যাপী এ কাজের ব্যাপক চাহিদা। বাংলাদেশের ছেলে নাফিস বিন জাফর এই থ্রিডি অ্যানিমেশনের জন্যই দু-দুবার অস্কার জিতেছেন। তাই এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রিপুটিশন অবশ্যই বিক্রিযোগ্য। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ঠাঁই করে নেয়া। সে লক্ষ্যে আমাদের দক্ষতা ও সামর্থ্য বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

খোলাখুলিই জানালেন তারা এখনো স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী পুরোপুরি ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। এ ধরনের উদ্যোগ কেন গ্রহণ করলেন প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বললেন– এ বিষয়ে তাদের তিনজনেরই সীমাহীন আগ্রহের কারণেই মূলত তারা এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন। তারা মনে করেন এ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল এবং তারা দারুণভাবে আশাবাদী।

এ ব্যবসা চালাতে গিয়ে তাদের কী কী প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয় জিজ্ঞেস করলে জানান– পেমেন্টের দীর্ঘসূত্রতা, দক্ষ জনবলের অভাব, বিদ্যুৎবিভ্রাট, আয়কর-জটিলতা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে তাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। বিদ্যুৎবিভ্রাটের ক্ষেত্রে জেনেরেটর ব্যবহার করে, দক্ষ জনবলের অভাবের ক্ষেত্রে নিজেরা প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী গড়ে তুলে এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তারা এগিয়ে যেতে পারছেন। নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাদের জন্য তার পরামর্শ হচ্ছে– দক্ষ জনশক্তি রিক্রুট করতে হবে। নিজের দক্ষতা ও আগ্রহ থাকতে হবে।

তাদের প্রযুক্তির ধরন জানতে চাইলে জানালেন– থ্রিডি অ্যানিমেশন সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার, অটোডেস্ক মায়া– তারাই বাংলাদেশে প্রথম পূর্ণাঙ্গ অটোডেস্ক মায়া স্টুডিও চালু করেছেন, এ ছাড়া তাদের একটা মোশন ক্যাপচার স্টুডিও আছে, যা দিয়ে খুব দ্রুত ইমেজ ক্যাপচার করা যায়। বাংলাদেশে আর কারো এটি নেই। পশ্চিমবঙ্গে একটা আছে, কিন্তু সেটি ছোট, তাদের মতো অতো ফ্যাসালিটি নেই।

তাদের মোট জনবল ১৫ জন এবং তাদের ভেতরে ৮ জন দক্ষ। হিসেব পদ্ধতি সম্পর্কে বললেন– হিসেব সংরক্ষণের জন্য তারা ছোট একটা ওয়েব টুল ব্যবহার করেন। এটিকে কুইকবুক (অনলাইন অ্যাকাউন্টিং সলিউশন) বলে। এছাড়া মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করেন।

সবশেষে জানালেন, সঠিক কর্মপন্থা বেছে নিয়ে পদক্ষেপ নিতে পারলে এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অনেক।

বাবার স্বপ্ন পূরণে ব্রতী কন্যা-বহ্নিশিখা

নাগিনা নাজনীন কেয়া

তৈরি করছেন বিশ্বমানের পনির

অদম্য বহ্নিশিখা নাগিনা নাজনীন (কেয়া)। বাবার ভাবমূর্তিকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে নেমেছেন নিজস্ব পণ্যের সফল বাজারজাতের মিশনে। ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচণ্ড স্পৃহা নিয়ে সঙ্গে রয়েছেন ছোটভাই তাসলিমুর রেজা। আপাতত তিন ধরনের পনির উৎপাদন করে ঢাকাসহ দেশের বেশকিছু বড় শহরে বাজারজাত করলেও ইচ্ছে রয়েছে দুগ্ধজাত আরো অনেক পণ্য উৎপাদন করে শুধু দেশ নয়, বিশ্ববাজারেও পোক্ত একটি জায়গা করে নেয়ার।

তার কিন্তু নিজস্ব পণ্য বাজারজাত করার এই চরম প্রতিযোগিতার অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ানোর কথা ছিল না! মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। স্নাতকোত্তরে বলে বেড়ানোর মতো ভালো রেজাল্ট করে বেশ ভালো বেতনে, মর্যাদাবান পদে চাকরি করতেন দেশের অন্যতম সেরা এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে পেশায় নিজেকে সাফল্যের নক্ষত্র-দুয়ারে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্নে যখন ভবিষ্যতের ছবি আঁকছিলেন, ঠিক তখনই ঘটে গেল তাদের পরিবারের সবচেয়ে বড় অঘটনটি। ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্পে হাঁসফাঁস করতে করতে এক সময় তার বাবা হুমায়ুন রেজা স্ট্রোকের শিকার হলেন। একমাত্র ছোটভাই তাসলিমুর রেজা বিদেশে পড়াশোনা করে সবে ফিরেছেন। ছোটবোন ব্যস্ত তার সংসার নিয়ে। ছোটভাই ও মাকে সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়লেন বাবাকে বাঁচানোর দুঃসাধ্য সাধনে। প্রথম ধাক্কা সামলে বাবাকে ঠাকুরগাঁও থেকে নিয়ে এলেন ঢাকায়। ভর্তি করলেন বারডেমের কার্ডিয়াক সেন্টারে। ডাক্তাররা আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু কেয়া নাছোড়বান্দা। যে করেই হোক বাবাকে যে তাকে বাঁচাতেই হবে! বাবা যে তার জীবনের সব! স্বামী ফয়সাল বিন মজিদ এ সময় ভরসার উৎস হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা নারী উন্নয়ন সংঘের কো-অর্ডিনেটর তিনি। বাবাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে পারিবারিক বিপর্যয় ঠেকিয়ে বাবার অভিলাষ পূরণের দৃঢ়তা নিয়ে আর ষড়যন্ত্রকারীদের মোক্ষম জবাব দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠা ছোটভাই তাসলিমুর রেজাও ছিলেন সঙ্গে। দুই ভাই-বোন কয়েকদিন রাত-দিন প্রতিটি মুহূর্ত সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন অসুস্থ-অসহায় বাবার দিকে।

সে যাত্রা বাবার জীবন রক্ষা করতে পারার পর ডাক্তাররা বললেন– এমন পিতৃসেবা তারা কখনো দেখেননি, সুপুত্র-সুকন্যার সেবাতেই বেঁচে উঠেছেন তাদের রোগী। বাবা কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তাকে বাসায় নিয়ে

এলেন। বাধ্য হলেন পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরতে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় চাকরিটা ছেড়ে দিতে একটুও দ্বিধা করেননি।

কেয়ার বাবা দেশের মানুষের কল্যাণচিন্তা এবং তাদের নিরাপদ কর্মসংস্থানের সদিচ্ছা থেকেই গঠন করেছিলেন হ্যাডস (HADS) নামের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। নিগৃহীত নারীদের কর্মসংস্থানের প্রতি ছিল তার বিশেষ মনোযোগ। নিজের জেলা ঠাকুরগাঁওসহ দিনাজপুর, রংপুরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে গাভী কেনার জন্য ঋণ দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছিলেন দেশের দুধের ঘাটতি। এক সময় ভাবলেন, শুধু দুধ নয়, দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রীও উৎপাদন করবেন। সে উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সফর করলেন দুগ্ধজাত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনকরী বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ। মুগ্ধ হলেন ডেনমার্কের বিশাল এক পনিরের কারখানা দেখে। মুগ্ধতার আবেশে পনিরের কারখানা গড়ার সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন। সে লক্ষ্যে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে এলেন সে দেশের পনির তৈরির বিশেষজ্ঞ হেনরিক ক্যাম্পিকে। আন্তরিক নিষ্ঠায় গড়ে তুললেন 'হ্যাডস চিজ' নামে পনিরের এক কারখানা, যেখানে বেশির ভাগ কর্মীই ছিলেন নারী। তার উদ্দেশ্য ছিল আমদানিকৃত পনিরের বদলে দেশের

কোথা থেকে কী করে এলো পনির

পনিরের ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। পনির খুবই প্রাচীন একটি দুগ্ধজাত খাবার। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে পনির খেয়ে আসছে। ঠিক কোথায়, কবে থেকে মানুষ পনির তৈরি এবং খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে আসছে তার সঠিক তথ্য জানা যায়নি। হতে পারে ইউরোপ, মধ্য এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যে এর ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কিন্তু এর চর্চা যে রোমান সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'প্লিনি দি এলডারে'র লেখায়। প্লিনি লিখেছেন, রোমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের পর থেকেই পনিরের ব্যবসা বেশ জমে উঠেছিল।

পুরাতাত্ত্বিক তথ্য অনুযায়ী পনির তৈরির সর্বপ্রথম প্রামাণিক নজির পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ৫,৫০০ বছর আগে বর্তমান পোল্যান্ডের কুজাউয়িতে। এই তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা হয়ে থাকে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৮,০০০ বছর আগে থেকেই পনির তৈরি করা হতো, যখন থেকে ভেড়াকে গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে পালন করা হয়ে আসছে। এমনও হয়ে থাকতে পারে যে, কোনো জন্তুর পাকস্থলীকে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করে হয়তো দুধ রাখা হয়েছিল আর তা দৈ ও ঘোলে পরিণত হয়েছিল। পনির তৈরির প্রক্রিয়াটা বোধ হয় এভাবে শুরু হয়েছিল যে, নিজের মনমতো দৈ হয়ে যাওয়া দুধকে কেউ চাপ দিয়ে এবং তাতে লবণ মিশিয়ে সংরক্ষণ করেছিল এবং তা থেকেই তৈরি হয়েছিল পনির। পশুর পাকস্থলীতে দুধ রেখে পনির তৈরি করলে তা আরো শক্ত ও সুগঠিত হয়– এই পর্যবেক্ষণ থেকে পনির তৈরির সময় দম্বল (দধির বীজ) ব্যবহার বেড়ে যায় বহুগুণে। পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুযায়ী মিসরীয় পনিরের আলামত পাওয়া যায় মিসরীয় মন্দিরের ম্যুরালগুলোয়, যেগুলো খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরের পুরনো। প্রাচীন আমলের পনির খুব টক ও লবণাক্ত থাকার সম্ভাবনাই

বেশি আর গঠনবিন্যাসে তা ছিল গ্রিসের গ্রামীণ কুটিরশিল্পে তৈরি ঘ্রাণময় পনির বা ফেটার মতোই। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় ইউরোপে পনির তৈরিতে লবণ ব্যবহার করতে হয় কম। সবচেয়ে আগেকার সংরক্ষিত পনির পাওয়া গেছে চীনের ঝিনজিয়াং-এর টাকলামাখান মরুভূমিতে, যা তৈরি করা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৬১৫ সালের দিকে। হোমারের ওডিসিতে ভেড়া ও ছাগলের দুধ দিয়ে পনির তৈরির বর্ণনা রয়েছে। রোমান সাম্রাজ্যে পনির ছিল দৈনন্দিন খাবার এবং পনির তৈরি ছিল একটি পরিণত শিল্প।

আধুনিক কালে ইউরোপীয় সংস্কৃতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত পূর্ব এশিয়ার মানুষ বলতে গেলে পনিরের নাম শোনেইনি। একই কথা খাটে কলম্বাসের আবিষ্কারের আগেকার আমেরিকার বেলায়ও। সীমিত ব্যবহার ছিল সাব-মেডেটারিয়ান আফ্রিকাতে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রসার এবং পরবর্তীতে ইউরো-আমেরিকান খাদ্য-সংস্কৃতির বিস্তারের সাথে সাথে সারাবিশ্বে এক জনপ্রিয় খাবারে পরিণত হয় পনির। পনিরের প্রথম কারখানাটি গড়ে ওঠে ১৮১৫ সালে সুইজারল্যান্ডে। ১৮৫১ সালে বৃহৎ শিল্পের পর্যায়ে প্রকৃত সফল পনিরের কারখানাটি স্থাপন করেন নিউইয়র্কের জেসে উইলিয়ামস। এ দশকের ভেতর সারাবিশ্বে এ ধরনের শত শত কারখানা গড়ে ওঠে। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পনির উৎপাদন করে যুক্তরাষ্ট্র (২০১৩ সালের হিসেব অনুযায়ী বছরে ৫৪ লাখ মেট্রিক টন)। তার পরেই রয়েছে জার্মানি (একই বছরের হিসেব অনুযায়ী ২২ লাখ মেট্রিক টন), ফ্রান্স (১৯ লাখ মেট্রিক টন), ইতালি (১২ লাখ মেট্রিক টন) এবং নেদারল্যান্ডস (৮ লাখ মেট্রিক টন)।

মানুষ যেন দেশে তৈরি বিশ্ব-মানের পনিরেই আস্থা রাখতে বাধ্য হয়। বেশ ভালোই চলল কয়েক বছর। এক সময় ষড়যন্ত্রকারীরা ভীষণ তৎপর হয়ে উঠল। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস– সেই ষড়যন্ত্রকারীদের ভেতর ছিল তার আপন ছোটভাইও। এক সময় তারা তার পরম যত্নে গড়া বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাটি দখল করে নিল। সঙ্গে পনিরের কারখানাটিও। এই নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না কেয়ার বাবা। স্ট্রোকের শিকার হলেন।

বাবাকে কিছুটা সুস্থ করে পরিবারের সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন কেয়া। স্ট্রোকের পর বাবা আর স্পষ্ট করে কথা বলতে পারেন না। এবার কেয়া নেমে পড়লেন বাবার অসম্পূর্ণ সদিচ্ছার সফল বাস্তবায়নে। কুচক্রীদের বিষাক্ত ছোবলে বাবার যে বিজয়পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল, তিনি সেই পতাকা আবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সবদিক কিছুটা গুছিয়ে নেয়ার পর কেয়া আবার গড়ে তুললেন পনিরের কারখানা। নাম দিলেন 'এমিনেন্ট ডেইরি অ্যান্ড ফুড'। প্রথম প্রথম তিনি যখন নামি-দামি দোকানের দোরে দোরে ঘুরতেন উৎপাদিত পনির বাজারজাতকরণের জন্য– নারী উদ্যোক্তা বলে সেসব দোকানের মালিকেরা কিছুটা করুণার চোখে আবার কেউ কেউ কিছুটা অবহেলার চোখে তার দিকে তাকাতো। তার ভীষণ অস্বস্তি হতো। কিন্তু তাতে একটুও পিছপা হননি অদম্য-অকুতোভয়-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেয়া। একদিন নিজে পনির বহন করে যখন একটি অভিজাত শপিংমলে ঘাম ঝরিয়ে ছোটাছুটি করছেন, তার আগের কর্মস্থল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়ন গাড়ি নিয়ে কার জন্য যেন সেখানে অপেক্ষায় ছিল। তো সে তাকে সিএনজিতে করে পনিরের বোঝা নিয়ে যেতে দেখে আক্ষেপ করে বলেছিল– 'ইস, আপা আপনে আগে তো গাড়িতে করেই চলাফেরা করতেন, চলেন না আজ আমাদের গাড়িতে!' কেয়া স্মিত হাসি দিয়ে সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পিয়নের সে অফার।

এভাবে তিলে তিলে তিনি সম্প্রসারণ করে চলেছেন তার ব্যবসা। মনের ভেতর টগবগিয়ে ফুটছে দেশের প্রতিটি কোণে নিজস্ব পনির জনপ্রিয় করার অদম্য স্পৃহা। শুধু দেশে নয়, বিশ্ববাজারেও ভোক্তাদের মুখে বাংলাদেশি পনিরের স্বাদ এমনভাবে লাগিয়ে রাখতে চান, যাতে তারা বারবার চেখে দেখতে চায় তার তৈরি তিন ঘরানার পনির– মোজারেলা, ফেটা এবং চেডার চিজ।

নাগিনা নাজনীন কেয়া তার এই পনিরের কারখানায় প্রাথমিক পুঁজি বিনিয়োগ করেছিলেন ২৫ লাখ টাকা। এর পুরোটাই ছিল নিজস্ব অর্থ। তার বাবা হ্যাডস চিজ কারখানাটি গড়েছিলেন ১৯৯৮ সালে। আর কেয়া তার 'এমিনেন্ট ডেনরি অ্যান্ড ফুড' নামের কারখানাটি চালু করেন ২০১১ সালে। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে ২০১২ সাল থেকে তিনি পনির বাজারজাত করতে সক্ষম হন। অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম আর আন্তরিক নিষ্ঠায় তিনি মোটামুটি দাঁড় করাতে পেরেছেন তার এই ব্যবসা। পেরেছেন যে তার প্রমাণ– এখন তার পুঁজি বেড়ে দাঁড়িয়েছে দেড় কোটি টাকায়।

প্রথম বছর তার লাভ হয়েছিল ৯ লাখ টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে তার মূলধন থেকে চুরি হয় ১১ লাখ টাকা।

বাবাই কেয়ার আইকন

ডেনমার্কে এক পনির কারখানা পরিদর্শন করছেন হুমায়ুন রেজা (বাঁয়ে)

তার সকল প্রেরণার উৎস তার বাবা হুমায়ুন রেজা মানুষের কল্যাণচিন্তায় বিভোর থাকতেন সব সময়। কথা প্রসঙ্গে কেয়া আমাকে জানিয়েছেন– তার বাবা যখন মানুষের সামনে কথা বলতেন তখন সাধারণ মানুষ এমন মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে পড়তো যে, জাঁদরেল কোনো রাজনৈতিক নেতাও মানুষকে সেভাবে আকর্ষণ করতে পারে না। তিনি যখন ছোট, প্রায়ই দেখতেন তার বাবা মানুষকে নানামুখী কর্মসংস্থানের উপায় বাতলে দিয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন আর তার চোখ-মুখ থেকে এক ধরনের দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে, কেয়া তখন মুগ্ধ-বিস্ময়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতেন

ভীষণ আঘাত পান মনে। তবে দমে যাননি একটুও। পরিশ্রম বাড়িয়ে দিলেন দ্বিগুণ। ফলও পেলেন। চতুর্থ বছর থেকেই আবার লাভের মুখ দেখতে শুরু করলেন। তবে এখনো তিনি তার বার্ষিক গড় লাভের হারে সন্তুষ্ট নন। অতৃপ্তির সঙ্গেই বললেন– 'আরো সচেতন থাকতে পারলে লাভের হার আরো বাড়তে পারতো।'

ব্যবসার গোটা ব্যবস্থাপনা তার নিজস্ব। এর কিছুটা শিখেছেন বাবার পুরনো 'হ্যাডস' কারখানার কার্যক্রম দেখে আর কিছুটা শিখেছেন বাবার আনা ডেনমার্কের সেই পনির বিশেষজ্ঞ হেনরিক ক্যাম্পির কাছ থেকে।

একজন নারী হয়ে এই ব্যবসা সফলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তার ভরসার জায়গা কোথায় জানতে চাইলে জানালেন– বাবার সুনাম এবং এমিনেন্ট চিজের বাজার-পরিচিতিই এখন তার মূল ভরসা। প্রথম অবস্থায় তিনি ঢাকার দোকানে দোকানে পনির সরবরাহ করতেন। পরে একজন মার্কেটিং ম্যানেজার নিয়োগ

এমিনেন্টের ৩ পনির

মোজারেলা

মোজারেলা মূলত ইতালিতে তৈরি এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী পনির। মোষের দুধ থেকে পাস্তা ফিলেতা পদ্ধতিতে এ পনির তৈরি করা হয়। ১৯৯৮ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এটিকে ট্রাডিশনাল স্পেশালিটিজ গ্যারান্টিড সার্টিফিকেট দেয়। বিশেষ করে পিৎজা তৈরিতে এ পনির ব্যবহৃত হয়।

ফেটা

ফেটা হচ্ছে গ্রিস ঘরানার এক ধরনের সাদা পনির, যা তৈরি করা হয় ভেড়া বা ছাগলের দুধ থেকে তৈরি নোনা দৈ থেকে। একই ধরনের সাদা নোনতা পনির তৈরি হয় ইউরোপে আংশিক বা পুরো গরুর দুধ দিয়ে এবং এগুলোকেও অনেক সময় ফেটা নামেই ডাকা হয়। এ ধরনের পনির পুরনো হয়ে গেলে খুব ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। সাধারণত এ পনির ব্লকে তৈরি করা হয়। কিছুটা দানাদার এ ধরনের পনির। খাবার টেবিলে এ পনির ব্যবহৃত হয়, ব্যবহৃত হয় সালাদে ও পেস্ট্রিতে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ফিলো দিয়ে পরিবেশিত বিশেষ ধরনের খাবার স্প্যানাকোপিতা ও টাইরোপিতায়। এ পনির রান্না করে বা গ্রিল করেও পরিবেশিত হয়।

চেডার চিজ

ঘিয়ে রঙের এ ধরনের পনির অন্য পনিরের চেয়ে শক্ত। কোনো কোনো চেডার চিজ খেতে খানিকটা তেতো লাগে। ব্রিটেনের সমারসেটের চেডার নামের এক গ্রামে এই চিজের উৎপত্তি বলে এর নাম হয়েছে চেডার চিজ। এখন সারা দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই এই চেডার চিজ তৈরি হয়। যুক্তরাজ্যে এই চেডার চিজ সবচেয়ে জনপ্রিয় পনির। সেখানকার বার্ষিক ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন পাউন্ডের পনিরের বাজারের ৫১ শতাংশই এই ধরনের পনিরের দখলে। যুক্তরাষ্ট্রে এই পনির দ্বিতীয় জনপ্রিয়তম পনির। সেখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে মোজারেলা। আর সে দেশের প্রত্যেক নাগরিক গড়ে বছরে ১০ পাউন্ড (৪.৫ কেজি) চেডার চিজ খায়। ১২ শতাব্দ থেকে ব্রিটেনে চেডার চিজ প্রস্তুত হয়ে আসছে। ঐতিহাসিক নথি অনুযায়ী ব্রিটেনের রাজা দ্বিতীয় হেনরি (১১৫৪-৮৯) ১১৭০ খ্রিস্টাব্দে ১০,২৪০ পাউন্ড চেডার চিজ কিনেছিলেন প্রতিপাউন্ড ১ ফার্দিং দরে। বর্তমানে যে স্বাদের ও মানের চেডার চিজ সারাবিশ্বে জনপ্রিয়, উনিশ শতকে তার রেসিপির গোড়াপত্তন করেছিলেন সমারসেটের দুগ্ধজাত খাবারের প্রস্তুতকারক জোসেফ হার্ডিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরবর্তী এক দশক ব্রিটেনে উৎপাদিত প্রায় সব দুধ 'সরকারি চেডার' তৈরিতে ব্যবহার করা হতো। অর্থনৈতিক কারণে এবং রেশনিংয়ের অংশ হিসেবে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের এক গবেষকের মতে চেডার চিজ হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পনির আর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পনির।

দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি মাকেটিং ম্যানেজারের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরে এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারাদেশে পনির বাজারজাত করছেন। বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত মান সংরক্ষণের ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তার পণ্যের চাহিদার ব্যাপারে জানতে চাইলে জানালেন– মন্দ নয়।

স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা জানতে চাইলে বললেন, এখনো সেভাবে পারছেন না। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার বিশ্লেষণ করে নিজের পণ্যের চাহিদা বাড়ানোর উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। উৎপাদন বাড়ানো এবং বিশ্বসেরা পনিরের মান অর্জনের জন্য নিজস্ব একটি পন্থা উদ্ভাবনের জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া ভবিষ্যতে ঘি, জুস, জ্যাম ও জেলি উৎপাদনেরও ইচ্ছে রয়েছে। তা করতে সক্ষম হলে তার বাজার আরো বাড়াতে পারবেন বলে আশা করছেন।

জানতে চাইলাম, এত ভালো এবং নির্ভরযোগ্য একটি পেশায় ছিলেন, লেগে থাকলে অনেক দূর যেতে পারতেন, অনেক আরাম-আয়েশে জীবন কাটাতে পারতেন, তো তা ফেলে এমন পরিশ্রমের আর চ্যালেঞ্জিং একটি উদ্যোগ গ্রহণ করতে এলেন কেন? একটু মুচকি হাসলেন। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে সুদূরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বললেন– ঠিকই বলেছেন। আমি আমার আগের পেশায় খুব সুখে ছিলাম। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতাম সেটির উপাচার্য আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু বাবাকে যে আমি নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসি! সবকিছু হারিয়ে চরম মনোকষ্টে স্ট্রোক করার পর বাবার সেই চরম বিপদের সময় আমি কী করে দূরে থাকি, বলুন? বাবার পাশে তাই আমাকে দাঁড়াতেই হলো। বলতে পারেন অসুস্থ বাবাকে সার্বিক সহযোগিতা করতে এবং তার স্বপ্ন পূরণের অভিযাত্রী হতেই ভাইকে পাশে রেখে আমি এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করেছি।

আমি এই উদ্যোগের ভবিষ্যৎ কতটা সম্ভাবনাময় জানতে চাইলে একটুও সময় না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন– বাংলাদেশে পনিরের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দেশি-বিদেশি নানা ধরনের খাবারের রেসিপি প্রচার এবং বাজার অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পনিরের ভোক্তা দিনদিনই বাড়ছে। তাদের চাহিদা মেটাতে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের পনির, যেমন– মোজারেলা, ফেটা, চেডার চিজ আমদানি করা হয়। এই সুযোগটাই নিতে চাচ্ছি আমি। বিশ্বমানের এসব পনির দেশেই তৈরি করে প্রথমে বাংলাদেশের বিশাল বাজারটা ধরতে চাই পোক্ত করে। তারপর চেষ্টা করব বিশ্ববাজারে ঢুকতে।

এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা কী জানতে চাইলে জানালেন– পুরুষশাসিত সমাজে তিনি মেয়ে– এটা একটা প্রতিবন্ধকতা। তা ছাড়া পর্যাপ্ত পুঁজির অভাবও অন্যতম বড় একটি প্রতিবন্ধকতা। তবে এও জানালেন– প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি আর দৃঢ় মনোবল দিয়ে এসব প্রতিবন্ধকতা সফলভাবেই মোকাবেলা করে চলেছেন।

তার এই অদম্য কর্মস্পৃহায় মুগ্ধ হলাম। মনের ভেতর তখন সুর তুলেছিল নজরুলের সেই গানটি– 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'। শত বছর আগে বেগম রোকেয়া অন্তঃপুরে বন্দি নারীদের মুক্ত করতে সাহসী উদ্যোগ নেয়ার পরও আজ যখন দেখি পাঁচ বছর বয়সী কন্যাশিশুকে পুরোদেহ কালো কাপড়ে ঢেকে রাখা হচ্ছে, তখন ভীষণ আঁতকে উঠি দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। কিন্তু আজ সফল নারী উদ্যোক্তা কেয়ার মাঝে সাফল্য ছিনিয়ে আনার যে অদম্য স্পৃহা দেখতে পেলাম তাতে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ আশাবাদী হয়ে উঠলাম। একটু পরে জানতে চাইলাম– নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিতে চাইলে তার জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে? একটু ভেবে নিয়ে কেয়া

বাংলাদেশে পনিরের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দেশি-বিদেশি নানা ধরনের খাবারের রেসিপি প্রচার এবং বাজার অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পনিরের ভোক্তা দিনদিনই বাড়ছে। তাদের চাহিদা মেটাতে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের পনির, যেমন– মোজারেলা, ফেটা, চেডার চিজ আমদানি করা হয়। এই সুযোগটাই নিতে চাচ্ছি আমি। বিশ্বমানের এসব পনির দেশেই তৈরি করে প্রথমে বাংলাদেশের বিশাল বাজারটা ধরতে চাই পোক্ত করে। তারপর চেষ্টা করব বিশ্ববাজারে ঢুকতে ,

বললেন– সব ধরনের পরিস্থিতি বিবেচনা করে এগুতে হবে। আর সব সময় সজাগ থাকতে হবে ঝুঁকি সম্পর্কে।

তার পনিরের কারখানায় কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে জানতে চাইলে জানালেন– এখনো ম্যানুয়াল প্রযুক্তিই তার ভরসা। তবে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা পুঁজি সংগ্রহ করতে পারলে পুরো অটোমেশনে যাবেন। তখন তার আরো অনেক দক্ষ কর্মচারীরও দরকার হবে। বর্তমানে তার কর্মচারী ২১ জন। বেশির ভাগই নারী। এদের ভেতর ৬ জন দক্ষ। এখন তিনি তার ঢাকা অফিসের মার্কেটিং ম্যানেজারের সহায়তায় নিজেই হিসেব সংরক্ষণ করেন। এ ছাড়া ঠাকুরগাঁওয়ে নিয়োগকৃত একজন খণ্ডকালীন অ্যাকাউন্ট্যান্ট ব্যালান্সশীট তৈরি করে দেন। মূল হিসেবটা তিনিই সমন্বয় করেন।

অবশেষে জানালেন, তার এই উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে পনির এখন বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে দেশে। পিৎজা তৈরিতে তো বটেই, বিভিন্ন ধরনের বিস্কুট, সমুচা ইত্যাদি নানা খাবারে এবং বিভিন্ন রকমের মুখরোচক খাবারের রান্নায় পনির ব্যবহৃত হচ্ছে। আর খাবার টেবিলে তো এর দাপুটে উপস্থিতি রয়েছেই! ■

Exclusives
EXOTIC EDITIONS
BY LA MODE

লা মোড

ডিজাইনার লেডিস ফুটওয়্যার

দেশের পাদুকাশিল্পে
নতুন মাত্রা যোগ করেছেন

ফাহিম শফিউল আলম

বাংলাদেশের পাদুকাশিল্পের সামনে এখন সম্ভাবনার বিশাল দুয়ার খোলা। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন– এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে পোশাকশিল্পের পরেই স্থান করে নিতে পারবে পাদুকাশিল্প। তাই রিশাদ যখন এক সম্ভাবনাময় জুতোর কারখানার কথা বললেন তখন একবাক্যে রাজি হয়ে গেলাম সেখানে গিয়ে তাদের সবকিছু জেনে আসতে। ১৭ জানুয়ারি পাটের সাইকেল দেখে আসার পর তাই ছুটলাম বনানীতে 'লা মোড' ডিজাইনার লেডিস শু-এর আউট লেটে।

বাংলাদেশে পাদুকাশিল্প দিনদিনই উন্নত হচ্ছে। একে একে খুলে যাচ্ছে রফতানির সব দুয়ার। মস্ত বড় একটি সুযোগও এসে গেছে সামনে। সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারলে রফতানি-পণ্য হিসেবে এটি পোশাক খাতকেও টপকে যেতে পারবে বলে আশাবাদী দেশের পাদুকাশিল্পসংশ্লিষ্টরা। বর্তমান বিশ্বে পাদুকাশিল্পের বাজার রয়েছে প্রায় ২৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের। দীর্ঘদিন এ বাজারের ৭৫ শতাংশেরই নিয়ন্ত্রণ ছিল চীনের। কিন্তু চীনে শ্রমিকদের বেতন বেড়ে যাওয়ায় জুতোর বিশ্ব বাজার থেকে চীন নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে বিশ্ব বাজারে তাদের নিয়ন্ত্রণ ৬৫ শতাংশ। চীনের চামড়া শিল্প নিয়ে রিসার্চ অ্যান্ড মার্কেট ডটকমের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১২-১৩ সালে চীনে চামড়ার তৈরি জুতো শিল্পের উৎপাদন ৫ দশমিক ২৯ শতাংশ থেকে ৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ কমেছে। আরো দুটি বড় জুতো উৎপাদনকারী দেশ ভিয়েতনাম ও ব্রাজিলও এ খাত থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে। এই তিনটি দেশের ছেড়ে দেয়া বিশ্বের জুতোর বাজারের ওই অংশটিই ধরতে চাইছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। আর তাই বাড়ছে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের রফতানি। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্য রফতানিতে আয় হয় ৯৮ কোটি ৩ লাখ ডলার। সর্বশেষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বেড়ে হয় ৩০৯ কোটি ৩৬ লাখ ডলার। অর্থাৎ তিন বছরে খাতটিতে আয় বেড়েছে ২১১ কোটি ৩৩ লাখ ডলার। বর্তমানে চামড়া শিল্প থেকে বাংলাদেশের রফতানি আয় ১ দশমিক ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এটিকে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে যা-যা করা দরকার, তার সবকিছু করবে সরকার। এ ছাড়া চামড়াজাত পণ্য রফতানি খাতে ১৫ শতাংশ হারে নগদ আর্থিক প্রণোদনা দেয়া এবং সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তরিত শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রাস্ট ও ফিনিশড লেদার রফতানির বিপরীতে ৫ শতাংশ হারে রফতানি ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। ফরাসিদের 'ফ্রেঞ্চ কাফে'র পর মানের দিক থেকে বাংলাদেশের চামড়াই পৃথিবীর সেরা। এ রকম স্মুথ গ্রেইনের চামড়া বিশ্বের অন্য কোথাও মেলে না। এছাড়া এ শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত কাঁচামাল, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, সস্তা শ্রম এবং জুতো তৈরির জন্য যন্ত্রপাতি আমদানিতে রয়েছে শুল্কমুক্ত সুবিধা। এই সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে চামড়াজাত পণ্যের ব্যবসায়ীরা মনে করেন, প্রবৃদ্ধি ও সম্ভাবনার নিরিখে তৈরি পোশাক খাতের পরেই স্থান করে নিতে যাচ্ছে এ খাত। লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি জানিয়েছেন, এরই মধ্যে অন্তত ৫১টি প্রতিষ্ঠান যৌথ বিনিয়োগে বাংলাদেশের পাদুকা শিল্পে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আর বর্তমানে দেশে মোট ১১০টি রফতানিমুখী কারখানায় চামড়ার জুতো তৈরি হয়। এসব তথ্য জেনে উৎসাহী উদ্যোক্তারা এ শিল্পে বিনিয়োগে আরো আগ্রহী হয়ে উঠবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

ডিজাইনার লেডিস শু'র ইতিবৃত্ত

মানুষের জুতো তৈরির ইতিহাস অনেক প্রাচীন। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা অনুযায়ী ৪০,০০০ থেকে ২৬,০০০ বছর আগে থেকে মানুষ পায়ে আবরণ পরে আসছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রামাণিক নমুনা হচ্ছে নব্য প্রস্তর যুগের, অর্থাৎ ৭,০০০ থেকে ৮,০০০ খ্রিস্টপূর্ব সালের আগেকার এক জোড়া স্যান্ডেল, যা পাওয়া গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন অঙ্গরাজ্যের 'ফোর্ট রক কেভ'-এ। আর সবচেয়ে প্রাচীন চামড়ার জুতোটি পাওয়া গিয়েছিল আরমেনিয়ায়। এটি ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩,৫০০ বছর আগেকার।

বনানীতে ফাহিম শফিউল আলম নামে আমি যে উদ্যোক্তার শো-রুম দেখতে যাচ্ছি তিনি কেবল মেয়েদের জন্য নকশা করা জুতো তৈরি করেন। সঙ্গে লেডিস ব্যাগও তৈরি করেন তিনি। লেডিস শু তথা মেয়েদের জুতোর ইতিহাস বেশ বৈচিত্র্যময়।

যেসব নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রেওয়াজ অনুযায়ী মানুষ খালি পা কিংবা বড়জোর স্যান্ডেল পরা পা দেখতেই অভ্যস্ত সেখানে মেয়েদের পা নিয়ে আগ্রহ খুব কমই থাকে। যাই হোক, অনেক সংস্কৃতিতেই কিন্তু আবার মেয়েদের পায়ে এঁটে থাকা নকশা করা জুতো ও বুট-জুতো প্রবল এক কামোদ্দীপক আকর্ষণ হিসেবে কদর পেয়ে থাকে। পুরুষের পায়ের তুলনায় নারীদের ছোট ও সরু পা যদি পেলব ও কমনীয় হয় তবে সবাই যেমন তার প্রশংসা করে, তেমনি তার গুরুত্ব যে অনেক বেড়ে যায় ইতিহাসে এর প্রমাণ বেশ মেলে। প্রাচীন চীনের মেয়েদের পা বেঁধে রাখার রেওয়াজ ছিল মূলত তাদের পা পেলব-মসৃণ-কমনীয় করে প্রদর্শনের উকেণশ্যেই।

এক হাজার বছর ধরে চীনের মেয়েরা পাকে পরিমার্জিত ও কামোদ্দীপক করে তোলার জন্য নিজের পা দুটোকে ফিতে দিয়ে পেঁচিয়ে রাখত। সৌন্দর্যচর্চার প্রক্রিয়ায় সাপ্তাহিক শরীর ধৌতকরণ ও সুগন্ধি প্রয়োগের পাশাপাশি তারা তাদের পা দুটিকেও খুব এঁটে বেঁধে রাখত। মাঞ্চুরিয়ান শাসনামলে, এমনকি ১৯১২ সালে প্রজাতন্ত্র কায়েম হওয়ার পরও বেশ কয়েকবার এই প্রথা নিষিদ্ধের চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সেই সব উদ্যোগই শেষমেশ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবে সময়ের প্রবহতায় এ প্রথা অনেকটাই লোপ পেয়েছিল। অবশেষে ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখলের পর এ প্রথা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। পাদুকার ইতিহাসে যৌন বিভেদের এটিই সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। বেশির ভাগ নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতেই নারী ও পুরুষের পাদুকায় প্রভেদ বেশ স্পষ্ট। কানাডার উত্তরাঞ্চলে এস্কিমোরা সিলের চামড়া দিয়ে যে বুটজুতো তৈরি করে তাতে পুরুষদের বুটজুতোয় সিলের চামড়াকে ব্যবহার করা হয় খাড়াখাড়িভাবে আর মেয়েদের বুটজুতোর বেলায় তা ব্যবহার করা হয় সমান্তরাল বিন্যাসে। দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী জুনি মেয়েরা সাদা চামড়ার লম্বা বুটজুতো বা সাধারণ জুতো পরে, আর এ সম্প্রদায়ের পুরুষেরা পরে খাটো বুটজুতো বা সাধারণ জুতো। গ্রিনল্যান্ডের মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে উরু পর্যন্ত লম্বা রক্ত-লাল রঙের সিলের চামড়ায় তৈরি জুতো ব্যবহার করা হয়। তাতে আবার বিভিন্ন রঙের চামড়ার নকশা করা হয়। কিন্তু তাদের পুরুষেরা পরে কালো রঙের খাটো বুটজুতো।

ইউরোপে মেয়েরা সাধারণত বিশেষ গড়নের দৃষ্টিনন্দন পাদুকা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে ১৬০০ শতক, অর্থাৎ ইউরোপীয় রেনেসাঁর আগে পর্যন্ত মেয়েদের পাদুকা বেশ সাদামাটাই ছিল। মেয়েদের পাদুকার প্রতি তেমন একটা আগ্রহ ছিল না কারো, কারণ লম্বা, ঢিলা পোশাক পরার জন্য তাদের পা সাধারণত কারো নজরে আসত না। কিন্তু পাদুকার দিক দিয়ে পুরুষরা ছিল তখন ময়ূর। অর্থাৎ ময়ূরীর চেয়ে ময়ূর যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি সে সময়ে পুরুষের পাদুকা ছিল মেয়েদের চেয়ে সুন্দর।

প্রাচীন মিসর, গ্রিস ও রোমে মেয়েরা যেসব স্যান্ডেল ব্যবহার করত তাতে পুরুষের স্যান্ডেলের তুলনায় ফিতে যেমন কম থাকত, তেমনি দেখতেও ততটা আহামরি ছিল না। তাদের পায়ের আঙুল তাই বেশি বেশি বেরিয়ে থাকত। রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে, অর্থাৎ বাইজান্টাইন সম্রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রাচীন জীবনাচারকে আমূল বদলে দেয়। খ্রিস্টান ধর্মের নীতি অনুযায়ী শরীরকে অনাবৃত রাখাকে পাপ বলে গণ্য করা হতো। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট ক্লেমেন্ট হুকুম জারি করলেন যে কোনো নারী তার পায়ের আঙুল অনাবৃত রাখতে পারবে না। বাইজান্টাইনেও প্রচলিত হয়ে গেল পুরো পা আবৃত করে তৈরি পাদুকার ব্যবহার। আর স্যান্ডেলের জায়গা দখল করে নিল জুতো। চার্চের হোমরাচোমরাদের ভেতর অবশ্য তখনো রোমান ঘরানার স্যান্ডেলের প্রচলন কিছুটা থেকেই গিয়েছিল। ৭৫০ সাল নাগাদ মুসলমানেরা পুরনো রোমান সম্রাজ্যের মিসরসহ এর খ্রিস্টান এলাকাগুলো দখল করে নেয়। অষ্টম শতক নাগাদ সামনের দিকে চোখা গলাঅলা জুতোর প্রচলন হয়। ল্যাটিন ভাষায় এই জুতোকে বলা হতো মুলিয়াস। এখনো মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যে এ ধরনের জুতো দেখতে পাওয়া যায়।

খ্রিস্টীয় দশম শতকের দিকে অন্ধকার যুগ থেকে ইউরোপ মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। রেশমি কাপড়, এমব্রয়ডারি, বোতামের ব্যবহার আবারো শুরু হয়ে যায়। এভাবেই ইউরোপে ফ্যাশন একটি পণ্য হয়ে ওঠে। এরই পরিণতিতে এগারো শতকের শেষের দিকে চোখা মাথার জুতোর প্রচলন হয়। তেরো শতকের শুরুর দিকে পোল্যান্ডে 'পওলেইন' নামে এক ধরনের জুতো তৈরি শুরু হয় এবং এভাবেই পোলিশ ঘরানার জুতোর ব্যবহার শুরু হয়। জুতোর ফ্যাশন নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে যায় এক সময় গোটা ইউরোপে। ললনাদের

কমনীয় চরণযুগলকে আরো লালিত্যময় করে তুলতে থাকে ডিজাইনার্স লেডিস শু।

ফরাসি বিপ্লবের পরে সাদামাটা মসৃণ চামড়ার জুতোই পাদুকাশিল্পের ফ্যাশন হয়ে ওঠে। এর আগে অভিজাতেরা যেসব জাঁকালো আলঙ্করিক এবং দামি সিল্কের জুতো পরতো সেসবের তুলনায় সাদামাটা চামড়ায় তৈরি এই জুতোগুলোকে টেকসই, সামর্থ্যের নাগালে এবং অধিকতর গণতান্ত্রিক বলে গণ্য করা হতে লাগল। ফরাসি বিপ্লবের পর 'সব মানুষই সমান হয়ে জন্মায়'– নতুন এই গণতান্ত্রিক দর্শনের প্রভাবে জুতোয় হিলের ব্যবহার উঠে যায়। নতুন ফরাসি প্রজাতন্ত্র এবং আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলো সে সময় মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে গণতন্ত্রের ধ্রুপদী মডেল খুঁজছিল। তারই পথ ধরে জুতোর ক্ষেত্রেও নব্য ধ্রুপদী ডিজাইন জনপ্রিয় হতে থাকে। রঙের দিক দিয়ে পম্পেই রেড, ক্রোকোডাইল গ্রিন এবং গাঢ় সোনালি রঙ বেশি বেশি ব্যবহৃত হতে থাকে। এ সময় স্যান্ডেলের ব্যবহারও আবার শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তা সেভাবে হালে পানি পায়নি। বিশেষ করে শীতপ্রধান উত্তর ইউরোপে। সেখানে বরং নতুন নতুন ডিজাইনের জুতো জনপ্রিয় হতে থাকে। নেপোলিয়নের যুদ্ধগুলো যখন চলছিল তখন জুতোর ফ্যাশনেও অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। কোনো ফ্যাশনই থিতু হয়নি এ সময়ে। জুতোর হিল ও আগার ডিজাইন ঘন ঘন বদলাতে থাকে।

উনিশ শতকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত মেয়েদের জুতোর ফ্যাশনে দাপট ধরে রাখে কালো, বাদামি ও সাদা রঙের জুতো। দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের পোশাকের সঙ্গে মানানসই করে এসব জুতো পরতো মেয়েরা। ২০০০ সালের পর থেকে জুতোর ফ্যাশনে একের পর এক যোগ হয়ে চলেছে বহুমাত্রিক মাত্রা। রঙ, মেটেরিয়াল, আকার-আকৃতি, নকশা ইত্যাদিতে এখন প্রতিদিনই আসছে বৈচিত্র্যময় বিন্যাস। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ফ্যাসনসচেতন মেয়েরা এখন খুঁজে নেন তাদের জন্য মানানসই 'ডিজাইনার্স লেডিস শু'।

ফাহিম শফিউল আলম এই সবকিছু মাথায় রেখেই তার 'লা মোড' ডিজাইনার লেডিস শু-কে ফ্যাশনসচেতন নারীদের ভেতর জনপ্রিয় করে তোলার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তার এই ব্র্যান্ডকে শুধু দেশেই নয়, বিশ্ববাজারেও জনপ্রিয় করে তুলতে চান। ত্রিশের কোঠায় পা রাখা উদ্যোমী তরুণ ফাহিম বিবাহিত এবং তার স্ত্রী ফাহমিদা ইসলামও তার মতোই উদ্যোমী এক তরুণী। উদ্ভাবনী প্রতিভাও রয়েছে। মেয়েদের এই জুতো তৈরি ও বাজারজাতকরণে স্বামীকে সার্বিক সহযোগিতা তো করছেনই, পাশাপাশি নিজেও হ্যান্ডমেড অর্গানিক সাবান তৈরির এক দারুণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যা খুব শিগগিরই বাজারজাত করতে পারবেন বলে জানালেন। পরিচয় জানার পরে বুঝলাম– গুণী মায়ের গুণী মেয়ে। তার মা, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া নারী উদ্যোক্তা জাহানারা ইসলাম একাই লড়ে চলেছেন বাংলাদেশের সি-উইডকে জনপ্রিয় করতে। আমরা যখন তাদের বনানীর শোরুম পরিদর্শন করি তখন ফাহমিদাও তার ডেস্কে কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ফাহিম একজন বিবিএ। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বদৌলতে চাকরি-বাকরি করে ক্যারিয়ার গড়বেন– এমন ইচ্ছে তার কক্ষনো ছিল না। কারো চাকরি না করে নিজেই কিছু করে দেখানোর বাসনা লালন করে আসছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। মনে মনে খুঁজেও বেড়াচ্ছিলেন– কী করা যায়! হঠাৎ করে পেয়েও গেলেন এক সময়; মনেও ধরে গেল ব্যাপারটা। বাংলাদেশের পাদুকাশিল্পের সম্ভাবনার কথা শুনছিলেন বহুদিন ধরে। রফতানি-সম্ভাবনার কথা বাদ দিলেও দেশেই রয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকার বিশাল বাজার। চোখের সামনে জুতো তৈরির বেশ কয়েকটি দেশি প্রতিষ্ঠানকে তরতরিয়ে ঢুকেও পড়তে দেখেছেন বিশ্ববাজারে। নিজস্ব পর্যবেক্ষণে এক সময় তিনি দেখতে পেলেন, বাংলাদেশে প্রায় সব ধরনের জুতো তৈরি হলেও জিডাইনার লেডিস শু কেউ তৈরি করছে না। ব্যস, পেয়ে গেলেন সুলুক সন্ধান!

জুতো তৈরির কৌশল আর নানা রকমের তথ্য জেনে নিতে যাতায়াত শুরু করলেন পুরনো ঢাকার জুতোর ফ্যাক্টরিগুলোয়। পাশাপাশি নিজের সৃজনশীলতারও অনুশীলন করতে থাকলেন; তার ভবিষ্যত পরিকল্পনার ডিজাইনার লেডিস শু-এর ডিজাইনারের কাজ যে তিনি নিজেই করতে চান। এরপর বিবিএ পাস করার পর খুব একটা দেরি করেননি। ৬ মাসের মধ্যেই উৎপাদন শুরু করেন নিজস্ব ব্র্যান্ড 'লা মোড'-এর। ২০ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে নেমেছিলেন। এর ভেতর নিজের ছিল ৮ লাখ টাকা, বাকিটা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। বর্তমানে তার পুঁজির পরিমাণ দেড় কোটি টাকা। এর ভেতর নিজস্ব পুঁজি ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা। বাকি ২০ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন ইস্টার্ন ব্যাংক

থেকে। প্রথম প্রথম মোটেও লাভজনক ছিল না তার এই উদ্যোগ। লোকসান গুনতে হয়েছে টানা দুই বছর। মাঝে মাঝে অন্ধকার দেখেছেন এ ব্যবসার ভবিষ্যত নিয়ে, কিন্তু কখনো হাল ছেড়ে দেননি। এরপর ধীরে ধীরে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন। উদ্যোগটি লাভজনক হওয়ার পর প্রথম দিকে বার্ষিক লাভের হার ছিল ২০%-এর কাছাকাছি। এ সময় চট করে জিজ্ঞেস করলাম, এখন পর্যন্ত যে মাত্রায় লাভ করতে পারছেন তাতে কি আপনি সন্তুষ্ট? প্রথমে একটু মুচকি হাসলেন। তারপর একটু ভেবে বললেন– হ্যাঁ, সন্তুষ্ট। এরপর জানতে চাইলাম, এই যে এমন একটা উদ্যোগ নিলেন, যে ব্যাপারে আগে কোনো জ্ঞানগম্যি ছিল না– তো এর জন্য যে ব্যবস্থাপনা আপনাকে গ্রহণ করতে হয়েছে তা কি আপনার নিজস্ব, নাকি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কোনোখান থেকে? একটু গর্বের সঙ্গেই জানালেন– এই গোটা উদ্যোগের পুরো ব্যবস্থাপনা-কৌশল একেবারেই তার নিজস্ব। তবে সবদিক সামলানোর নিজস্ব উপায় বের করার ক্ষেত্রে পুরনো ঢাকার জুতোর ফ্যাক্টরিগুলোর গভীর পর্যবেক্ষণ বেশ কাজে দিয়েছে। এই উদ্যোগের পেছনে ভরসা হিসেবে কাজ করেছে তার নিজস্ব একটি মূল্যায়ন। সার্বিক বিবেচনায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা চামড়া উৎপন্ন হয় এটি মাথায় রেখে তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন এখানে চামড়াজাত, বিশেষ করে পাদুকাশিল্পের ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল। কিন্তু দেশে মেয়েদের নকশা করা ফ্যাশনেবল জুতো তৈরিতে কেউ হাত দিচ্ছে না, উন্নত বিশ্বে যার অভিজাত উচ্চারণ– ডিজাইনার লেডিস শু। এই শূন্য জায়গাটা পূরণ করতে পারলে অবশ্যই তিনি এ খাত থেকে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করতে পারবেন– এমন দৃঢ় বিশ্বাস তাকে এ কাজে অনুপ্রাণিত করতে থাকল। তিনি ঠিক করলেন, প্রথমে ১৭ থেকে ২৬ বছর বয়সের মেয়েদের জুতোই তৈরি করবেন কেবল। এখনো অবশ্য তার টার্গেট এই বয়সের মেয়েরাই। প্রস্তুতি নিচ্ছেন বেবি শু তৈরিরও।

উৎপাদন শুরু করার পর থেকেই তিনি অনলাইনে সেল করে আসছেন। তার ক্রেতা সাধারণত গুলশান-বনানীর অভিজাত পরিবারের মেয়েরা। আরো এক ধরনের ক্রেতা আছে তার প্রথম থেকেই। যারা বিদেশে, বিশেষ করে ইউরোপ-আমেরিকায় থাকে তারা দেশে এলে তার জুতো কিনে নিয়ে যায় বা অনলাইনে কেনে। অনলাইনে যারা কেনে তারা তার নিজস্ব অনলাইনের জুতোর ছবি এবং মূল্য দেখে পায়ের সাইজ জানিয়ে পছন্দের জুতোর

অর্ডার দেন এবং অনলাইনেই পরিবহন মাসুলসহ মূল্য পরিশোধ করেন। তখন তিনি ক্রেতার ঠিকানায় কুরিয়ারে সেই জুতো পাঠিয়ে দেন। যারা বিদেশে থাকেন তারা তার কাছ থেকে ডিজাইনার লেডিস শু কেনেন, কারণ এতে তারা আন্তর্জাতিক মানের জুতো অনেক কম দামে কিনতে পারেন। এ ছাড়া তিনি নিজস্ব শোরুম থেকেও জুতো বিক্রি করে থাকেন। ঢাকা মহানগরীতে বর্তমানে তার চারটি আউটলেট রয়েছে। অনলাইন শপিংয়ের মাধ্যমে তার বেশ ভালো বিক্রি হয় বলে জানালেন। শুধু দেশি প্রবাসীরাই নন, বিদেশি ক্রেতারাও অনলাইন শপিংয়ের মাধ্যমে তার ডিজাইনার লেডিস শু কিনছেন এখন। তবে বাজার সম্প্রসারণের জন্য তিনি ভবিষ্যতে আরো উদ্যোগ নেবেন বলে জানালেন। বর্তমান বাজারে টিকে থেকে ভবিষ্যতে এ উদ্যোগকে ক্রমেই বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে দারুণ এক ব্যবসায়ী কৌশল বেছে নিয়েছেন তিনি। আর তা হচ্ছে লাভ কম করে বিক্রির পরিমাণ বাড়াতে থাকা। সে লক্ষ্যে সাধ্যমতো উৎপাদন বাড়াতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে জুতোর গুণগত মানও সমৃদ্ধ করার ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর অবশ্যই নজর রাখছেন– তাদের তৈরি জুতো যেন পরতে আরামদায়ক হয়। যেন, একবার যে নারী তাদের জুতো পায়ে গলিয়েছেন, তিনি জুতো কেনার জন্য বারবার তাদের আউটলেটেই আসতে থাকেন, সঙ্গে চেনা-পরিচিতজনদেরও নিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে জুতোর সোল তৈরিতে বিশেষ যত্ন নিতে হয়। এও জানালেন, অনেক মুনাফালোভী জুতো প্রস্তুতকারক একই রকম দেখতে দু-নম্বরি সোল– অর্থাৎ ৬ শ টাকা দামের সোলের বদলে ১ শ টাকা দামের সোল লাগিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে– ক্রেতার বোঝার কোনো উপায় নেই যে এটি দু-নম্বরি সোল। কিন্তু তিনি সাময়িক মুনাফার চেয়ে স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান মুনাফাকেই বেশি গুরুত্ব দেন বলে ব্যবহারকারীরাই তার পণ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডারের হয়ে ওঠেন। তবে একটি ব্যাপার তিনি আগেভাগেই জানিয়ে রাখলেন যে, ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে যারা জুতো তৈরি করে তাদের সঙ্গে তার উদ্যোগের রয়েছে বেশ গুণগত পার্থক্য। নানা রকমের ডিজাইনের জুতো তৈরি করতে হয় বলে তার বেশির ভাগ জুতোই তৈরি হয় হাতে। অবশ্য সারাবিশ্বেই বেশির ভাগ ডিজাইনড শু হাতেই তৈরি হয়, এর কিছু কিছু অংশই কেবল মেশিনে তৈরি হয়। কারখানায় যেমন একই ছাঁচে একই মাপের জুতো একসাথে তৈরি করা হয়, ডিজাইনড শু সেভাবে তৈরি সম্ভব হয়ে ওঠে না। অবশ্য ব্যাপক চাহিদা থাকলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তাতে সঠিক মান বজায় রাখা যায় না। আর তা ছাড়া ফাহিম এখন কেবল নির্দিষ্ট একটা বয়সের মেয়েদের জন্যই ডিজাইনড শু তৈরি করছেন বলে

চাহিদা কম। জানালেন, যখন সব বয়সের মেয়েদের জন্য তার ডিজাইন করা জুতো তৈরির সঙ্গতি অর্জন করবেন, তখন তিনিও কিছু কিছু কাজ মেশিনে করবেন।

এবার আমি জানতে চাইলাম চমৎকার এই উদ্যোগটিকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসতে তাকে কী কী প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়েছে। পাশের ডেস্কে ল্যাপটপে কাজ করতে থাকা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভেবে নিলেন খানিকক্ষণ। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে তাকে এ পর্যায়ে আসতে হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে তাকে কারিগরের সমস্যা। ভালো কারিগর খুঁজে পাওয়া যেমন মুসকিল, তেমনি তাকে ধরে রাখাও ভীষণ মুসকিলের ব্যাপার। তারা যেহেতু ডিজাইনার শু তৈরি করেন, তাই তাদের দরকার হয় খুব অভিজ্ঞ কারিগরের। এই জুতো তৈরিতে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ বছরের অভিজ্ঞ কারিগরের দরকার হয়। কিন্তু এমন অভিজ্ঞ কারিগর পাওয়া দুষ্কর। অনেক কারিগরই সাত-আট বছর কাজ করে এ পেশায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে দেশে ফিরে গিয়ে অন্য পেশায় লেগে যায়। দেখা যায়, তিনি হয়তো অনেক খুঁজে একজন ভালো কারিগর পেয়ে তাকে তার কারখানায় কাজে লাগিয়ে দিলেন, কিন্তু কিছুদিন কাজ করে সে চলে গেল, তখন ফাহিমকে সেই শূন্যস্থান পূরণে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। এ ধরনের জুতো তৈরির চামড়া জোগাড় করাও বেশ কষ্টকর। জুতো তৈরিতে তার দরকার হয় টেক্সচার করা চামড়া। কিন্তু এ দেশে কেউ চামড়ার টেক্সচার করে না। তাকে ভালো মানের চামড়া জোগাড় করে তা চীন বা ভারত থেকে টেক্সচার এবং ডিজাইন অনুযায়ী প্রিন্ট করিয়ে আনতে হয়। আমি আরেকটি প্রতিবন্ধকতার কথা পাড়লাম। বললাম, দেশের বড় বড় জুতার কারখানা, যেমন অ্যাপেক্স যদি ডিজাইনার লেডিস শু তৈরি শুরু করে তা হলে তো আপনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বেন! তখন আপনি কী ব্যবস্থা নেবেন? আত্মবিশ্বাসের হাসি দিয়ে বললেন– 'ওরা এ ধরনের জুতো তৈরি করবে না। কারণ এতে ওদের খরচ অনেক বেড়ে যাবে বলে পোষাতে পারবে না। সুতরাং এদিক দিয়ে আপাতত আমি কোনো বিপদ দেখতে পাচ্ছি না।'

এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে তাকে কিছু কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, কারিগরেরা প্রায়ই চলে যায়, তাই এ সমস্যা সমাধানে তিনি সব সময়ই ওয়েটিং লিস্টে কয়েকজন করে বাড়তি কারিগর রাখেন। চামড়া টেক্সচার ও প্রিন্ট করিয়ে আনতেন চীন থেকে। সম্প্রতি ভারতের চেন্নাইয়ে এ ধরনের কিছু কারখানার সন্ধান পেয়েছেন; আশা করছেন, ভারত থেকে এ কাজ করিয়ে এনে এখন খরচ অনেক কমাতে পারবেন।

নতুন কোনো উদ্যোক্তা ডিজাইনার শু তৈরি করে বাজারজাত করতে চাইলে তার প্রতি আপনার কী পরামর্শ থাকবে– আমার এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, এ ব্যবসায় ঢোকার আগে ভালোমতো খোঁজখবর নিতে হবে, আগে নিজেকে কাজ শিখতে হবে। কারিগর ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে নিতে হবে।

প্রযুক্তি প্রসঙ্গে জানালেন– এখনো পর্যন্ত তিনি ম্যানুয়াল প্রযুক্তিতেই কাজ করছেন। আমার অবগতির জন্য জানালেন, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানসম্পন্ন ডিজাইনার শু তৈরি হয় হাতেই। হাতে সেইপ ও ডিজাইন যেভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় মেশিনে তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এ ধরনের জুতোর বেশির ভাগ কাজই হাতে করতে হয়। তবে ব্যাপকভাবে বাজার বাড়াতে পারলে এবং রফতানিতে যেতে পারলে, অর্থাৎ একই ডিজাইন ও গড়নের হাজার হাজার জুতো যখন তৈরি করতে হবে তখন হয়তো অটোমেশনে যেতে হতে পারে।

বর্তমানে চারটি আউটলেট ও কারখানা মিলে তার জনবল মোট ১০০ জন। এদের মধ্যে ১৫ জন দক্ষ।

এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল বলে জানালেন ফাহিম। ২০২০ সাল নাগাদ তিনি আরো তিনটি আউটলেট বাড়াতে চান এবং অনলাইন সেলিংয়ের ব্যাপ্তিও অনেক বাড়াতে চান।

বাংলাদেশ পাদুকাশিল্পের যে বিপুল সম্ভাবনা দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে তাতে এ ধরনের আরো অনেক উদ্যোক্তা এসে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেবেন– মনে মনে এমন প্রত্যাশা করে এবং 'লা মোড' একটি ব্র্যান্ড আইকনে পরিণত হোক এই শুভ কামনা করে ফাহিম ও ফাহমিদা দম্পতির কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। ■

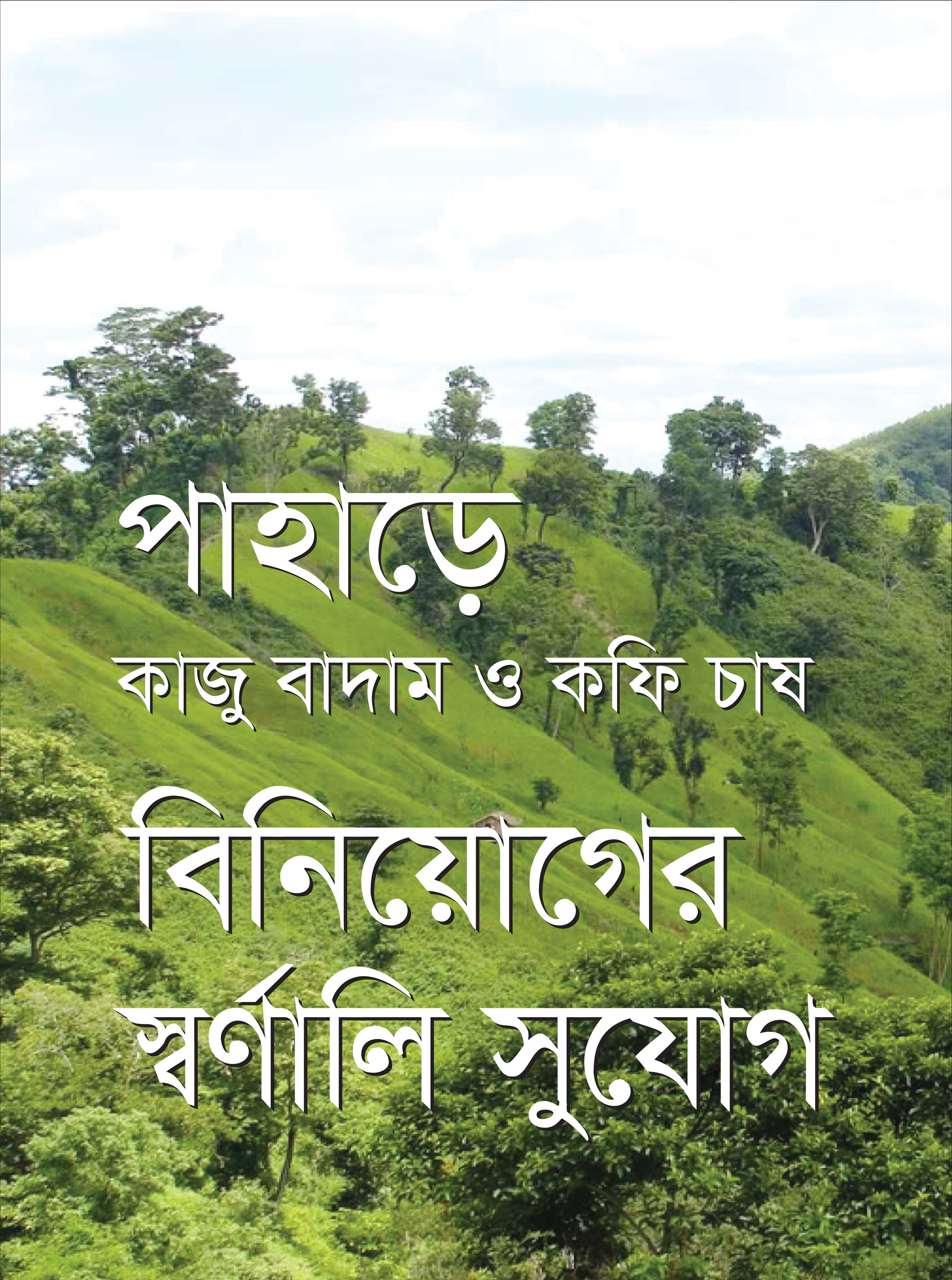

পাহাড়ে
কাজু বাদাম ও কফি চাষ
বিনিয়োগের স্বর্ণালি সুযোগ

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা প্রাকৃতিক সম্পদের আকর। পাহাড়ের ঢালে ঢালে, সবুজের গহিন অরণ্যে, ঝরনা, ছড়া আর নদীর বাঁকে বাঁকে কত যে লুকোনো সম্পদ তা বলে শেষ করার নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে উন্নতির সোপানে পা রেখেছে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে উঠে এসেছে বেশ কয়েকটি ধাপ। সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কল্যাণে মাঝারি আয়ের দেশের তকমাটা ছুঁইছুঁই করছে। দিনদিনই বড় হচ্ছে রফতানি পণ্যের তালিকা। এমনকি বাউণ্ডুলে তরুণরাও এখন কিছু একটা করে, করতে পারে, আয় বাড়াতে পারে পরিবারের এবং দেশের, সমৃদ্ধ হয় দেশের অর্থনীতি। রকের আড্ডাবাজি তেমন একটা চোখে পড়ে না। সবাই এখন খুঁজে বেড়ান– কী করা যায় যাতে নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা যায়। সোজা কথায় বলতে গেলে উৎসাহী উদ্যোক্তারা এখন খুঁজে বেড়ান কোথায় বিনিয়োগ করলে লোকসানের তেমন কোনো ঝুঁকি থাকবে না বরং ধীরে ধীরে উদ্যোগটি আরো বড় হবে এবং এক সময় দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও এ উদ্যোগের বাজার সম্প্রসারণ করা যাবে। সেইসব উদ্যোক্তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অরণ্যে ছড়িয়ে আছে সম্ভাবনার নিরাপদ হাতছানি। সেখানে এমন অনেককিছুই আছে যার সন্ধান এখনো কেউ জানে না। আবার এমন অনেককিছুও আছে যার সন্ধান এবং দেশি ও বিদেশি বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সঠিক বিনিয়োগ-কৌশল নিয়ে এগিয়ে আসেনি কেউ। অবশ্য চেষ্টা যে কেউ করছে না– তেমনটি বলা যাবে না। বান্দরবানের তেমনই দুটি সম্ভাবনা কাজু বাদাম ও কফি। স্রেফ প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে এ দুটি পণ্য বর্তমানে কাঁচামাল হিসেবেই রফতানি হচ্ছে বিদেশে। অথবা চোরাইপথে পাচার হচ্ছে ভিনদেশে। আর বিদেশে প্রক্রিয়াজাত হয়ে এ দেশের বাজারে ফিরে এসে তা বিক্রি হচ্ছে ৫/৬ গুণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি দামে।

কাজু বাদাম

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় রয়েছে কাজু বাদাম চাষের আদর্শ পরিবেশ। পাহাড়ের ঢালে, বেলে দো-আঁশ মাটিতে এর গাছ সবচেয়ে ভালো জন্মে এবং বেশি ফল দেয়। কাজু বাদামের জন্মস্থান ব্রাজিলে। ষোড়শ শতকে পর্তুগিজরা প্রথমে মোজাম্বিক এবং পরে ভারতবর্ষে নিয়ে আসে এর গাছ। পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই বাদাম স্বাদেও অনন্য। বর্তমান বিশ্বে ভিয়েতনাম সবচেয়ে বেশি কাজু বাদাম উৎপাদন করে। অথচ দেশটি মাত্র ১২ বছর আগে কাজু বাদাম চাষ শুরু করেছিল। সেই নিরিখে গোটা পার্বত্য অঞ্চল কাজু বাদাম চাষের জন্য অত্যন্ত অনুকূল বলে বাংলাদেশে এ খাতে বড় স্বপ্ন দেখতেই পারে। শুধু পাহাড়েই নয়, বাংলাদেশের সমতলেও কাজু বাদাম চাষ সম্ভব, যশোরে এক শৌখিন ব্যক্তি তার বাগানে উন্নত জাতের কাজু বাদাম ফলিয়ে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক এলাকাতে বহু আগে থেকেই কাজু বাদাম ফলিয়ে আসছেন সেখানকার অধিবাসীরা। আমি নিজে ১৯৮১ সালে কাপ্তাই লেকের পাড়ে অনেক কাজু বাদাম গাছের তলায় কাজু বাদাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। তবে সেগুলো বুনো না কারো চাষ করা সে তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। ২০১৬ সালের ৭ ডিসেম্বর আমরা বান্দরবানের রুমা উপজেলায় বড় একটি কাজু বাদাম বাগান পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বান্দরবানের রুমা উপজেলার পাশাপাশি থানচি, রোয়াংছড়ি ও সদর উপজেলায় কাজু বাদামের চাষ হচ্ছে। এসব জায়গায় প্রতি হেক্টরে দেড় থেকে দুই মেট্রিক টন কাজু বাদামের ফলন পাওয়া যায়। বিক্ষিপ্তভাবে রুমায় ৩৫০ এবং থানচিতে ২২০ মেট্রিক টন কাজু বাদাম উৎপন্ন হয়। দেশে এখনো কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কাজু বাদামের প্রকিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নেয়নি। বহির্বিশ্বে ব্যাপক চাহিদা থাকায় প্রক্রিয়াজাতহীন অবস্থায়ই উৎপাদিত কাজু বাদামের প্রায় পুরোটা খোসাসহ রফতানি হচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় স্থানীয় চাষিরা ১২০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা মণ দরে কাজু বাদাম বিক্রি করলেও বিদেশি ক্রেতারা যখন এ দেশ থেকে বেশি পরিমাণে কাজু বাদাম কিনে নেয় তখন দাম অনেক বেশি পান চাষিরা। আমাকে রুমার কাজু বাদাম চাষি মে মং চৌধুরী জানালেন গত বছর তিনি ৭ হাজার টাকা মণ দরে কাজু বাদাম বিক্রি করেছেন! এতেই প্রমাণিত হয় বিশ্ব

বর্তমান বিশ্বে ভিয়েতনাম সবচেয়ে বেশি কাজু বাদাম উৎপাদন করে। অথচ দেশটি মাত্র ১২ বছর আগে কাজু বাদাম চাষ শুরু করেছিল। সেই নিরিখে গোটা পার্বত্য অঞ্চল কাজু বাদাম চাষের জন্য অত্যন্ত অনুকূল বলে বাংলাদেশ এ খাতে বড় স্বপ্ন দেখতেই পারে।

বাজারে কাজু বাদামের চাহিদা কী হারে বাড়ছে! বাংলাদেশ থেকে খোসাসহ কাজু রফতানি হয় আর তা প্রকিয়াজাত আমদানি পণ্য হয়ে দেশের বাজারে ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়।

ব্যাপক চাহিদার কারণে বিশ্ব বাজারে এখন কাজু বাদাম উৎপাদনকারী দেশগুলোর ভেতরে চলছে তীব্র প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় সব দেশকে টপকে শীর্ষে উঠে এসেছে ভিয়েতনাম। ২০১৬ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে ভিয়েতনামের বার্ষিক কাজু বাদাম উৎপাদন ছিল ১২ লাখ ৩৭ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল নাইজেরিয়া, তাদের বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৮ লাখ ৩৬ হাজার ৫ শ মেট্রিক টন। তৃতীয় অবস্থানের ভারত উৎপাদন করেছিল ৬ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। চতুর্থ অবস্থানে ছিল আইভরি কোস্ট, উৎপাদন ছিল ৪ লাখ ৫০ হাজার টন। পঞ্চম স্থানে ছিল বেনিন, উৎপাদন ছিল ১ লাখ ৭০ হাজার টন। ষষ্ঠ ফিলিপিন্স, উৎপাদন ১ লাখ ৩২ হাজার ৫৪১ টন। সপ্তম অবস্থানে ছিল গিনি, উৎপাদন ছিল ১ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন, অষ্টম অবস্থানে ছিল তানজানিয়া, উৎপাদন ছিল ১ লাখ ২২ হাজার ২৭৪ মেট্রিক টন, নবম অবস্থানে ছিল ইন্দোনেশিয়া, উৎপাদন ছিল ১ লাখ ১৭ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন। আর দশম অবস্থানে ছিল কাজু বাদামের জন্মভূমি ব্রাজিল, যাদের বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৮০ হাজার ৬৩০ মেট্রিক টন।

বর্তমানে দেশে সীমিত পরিসরে কাজু চাষ হলেও অপার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এতে। সরকারি সহযোগিতা পেলে এ কৃষিপণ্যটির রফতানির শীর্ষ তালিকায় বাংলাদেশের নাম শোভা পাওয়া মোটেও অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়। এসব বিবেচনায় নিয়েই ২০১৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রণয়ন করা রফতানি নীতিমালায় কাজু বাদামকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

কাজু বাদামের খাদ্যগুণ

পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে এটি সারা বিশ্বেই খুব জনপ্রিয়। এতে রয়েছে বিভিন্ন ভিটামিন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফরফরাস, পটাসিয়াম, দস্তা ও খনিজ উপাদান। প্রতি ১০০ গ্রাম কাজু বাদামে রয়েছে ৩০.১৯ গ্রাম শর্করা, ১৮.২২ গ্রাম আমিষ এবং ৪৩.৮৫ গ্রাম চর্বি। হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে, কোলেস্টরল কমাতে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়াতে, ওজন কমাতে এবং হাড় শক্ত করতে এটি অনন্য ভূমিকা রেখে থাকে। এসব কারণে বিশ্ববাজারে কাজু বাদামের চাহিদা দিনদিনই বাড়ছে।

রামুর সফল কাজু বাদাম চাষি

মে মং চৌধুরী

বিপুল সম্ভাবনাময় মাঝারি উদ্যোক্তাদের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি দেশের নানা প্রান্তে। দেশের অর্থনীতির চাকাকে আরো দ্রুত ছোটাতে আগ্রহী যে উদ্যোক্তারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন লাভজনক ব্যবসায়ী-উদ্যোগ তাদের জন্য সোনার ডিম-পাড়া হাঁসের সন্ধান দিতেই মূলত আমাদের এই প্রয়াস। সে উদ্দেশ্যে ৬ ডিসেম্বর রাতে উঁচু উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে বান্দরবানের রুমায় এসে পৌঁছেছি। এখানে আমরা কাজু বাদাম ও কফি চাষের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখব বলে এসেছি। পাহাড়ের কোল বেয়ে বয়ে চলেছে সাঙ্গু নদী। নদীতে চারপাশে ছড়ানো ছিটানো থোক থোক সবুজ-সুন্দরের মাখামাখিতে দৃষ্টিসুখের আবেশ ছড়িয়ে যায় স্নায়ুর পরতে পরতে। এমনই মন ভালো করে দেয়া ৭ ডিসেম্বর সকালে আমরা মে মং চৌধুরীর কাজু বাদাম বাগান দেখতে বের হলাম হাতিমাথাপাড়ার উদ্দেশ্যে। রুমা বাজার থেকে মে মং চৌধুরী আমাদের হাতিমাথাপাড়ায় তাদের ৩ বিঘা জমির ওপর বাড়ি এবং কাজু বাদাম ও অন্যান্য ফলের বাগান দেখাতে নিয়ে চললেন। পাহাড়ের বেশ উঁচুতে উঠতে হবে বলে লুৎফর ভাই আর গেলেন না, গাড়িতেই বসে থাকলেন। পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে মে মং চৌধুরী তার কাজু বাদামের গাছগুলো দেখাচ্ছিলেন। সবে ফুল আসতে শুরু করেছে কাজুগাছে। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া যাবে। আফসোস হচ্ছিল কাজু বাদাম গাছে ধরা অবস্থায় দেখতে পেলাম না বলে। বেশ কিছুটা ওঠার পর তার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। এখানে দুটি ঘর তার। একটি বাঁশের মাচানের ওপর বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের ঘর, উঠতে হয় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। অন্যটি সেমি-পাকা টিনের ঘর। বাঁশের বেড়ার ঘর থেকে স্কুলড্রেস পরা দুই বালক বেরিয়ে এলো, মে মং পরিচয় করিয়ে দিলেন তার নাতি বলে। এরপর আমি তার কাজু বাদাম দেখতে চাইলে নেটের একটি ব্যাগে কেজিখানেক বাদাম এনে দেখিয়ে বললেন, 'সব বিক্রি করে দিয়েছি। ঘরে এ কয়টাই আছে।' আমি শক্ত খোসাসহ সেটুকু কাজু বাদামেরই ছবি তুলে নিলাম।

বান্দরবান জেলার রামু উপজেলার হাতিমাথাপাড়া গ্রামের এই পরিশ্রমী কাজুবাদাম চাষির নাম মে মং চৌধুরী, বয়স ৭৭ বছর। তার ৩ ছেলে, ২ মেয়ে। স্ত্রীর নাম মুই চিং। অন্যান্য ফলের চাষ করলেও মূলত তিনি কাজু বাদাম চাষ ও বাজারজাতকরণ করেই বেশি লাভবান। এর চাষ করছেন তিনি ১৯৯০ সাল থেকে। প্রাথমিক পুঁজি ছিল মাত্র ৩ হাজার টাকা। পুরোটাই ছিল নিজস্ব পুঁজি। কারো কাছ থেকে কোনো ঋণ নেননি।

তার এই উদ্যোগটি প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল কিনা, না থাকলে কতদিন পর থেকে লাভের মুখ দেখছেন জানতে চাইলে জানালেন, 'প্রথম থেকেই আমার এই কাজু বাদাম চাষ লাভজনক। কাজু বাদামের চারা লাগিয়েছিলাম ১৯৯০ সালে। তিন বছর পর, অর্থাৎ ১৯৯৩ সাল থেকে

বাগানের কাজু বিক্রি করতে পারছি। এখন আমার বাগানে প্রায় ৬০০ কাজু বাদাম গাছ রয়েছে। প্রথম প্রথম ১০/১২ মণ করে কাজু ফলাতে পারতাম বছরে। বছর বছর গাছ লাগানোয় এখন আমার উৎপাদন অনেক বেড়েছে। বর্তমানে বছরে ২৫ থেকে ৩০ মণ কাজু বাদাম বিক্রি করতে পারি। প্রথম দিকে ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা মণ দরে বিক্রি করতাম। দিনদিন এর দাম বাড়ছেই। গত বছর ৭০০০ টাকা মণ দরে বিক্রি করেছি।'

তার কাছে জানতে চাইলাম– এখন পর্যন্ত কাজুবাদাম থেকে যে পরিমাণ আয় করতে পারছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট কিনা। বেশ গর্বের সঙ্গে জানালেন– তিনি এই আয়ে সন্তুষ্ট। কাজুবাদাম থেকে বর্তমানে তার আয় অনেক বেড়েছে। ভবিষ্যতে এই আয় আরো বাড়বে বলে আশা করছেন।

আপনি এ উদ্যোগে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন তা কি নিজস্ব, নাকি কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ গুণ অর্জন করেছেন? আমার এ প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'নিজস্ব। তবে কাজু বাদাম চাষের এই সুলুক সন্ধান পেয়েছিলাম এক কৃষি কর্মকর্তার কাছ থেকে। রুমা উপজেলার সাবেক কৃষি কর্মকর্তা মরহুম ছন্দক সারথি চাকমা আমাকে প্রথম কাজু বাদাম খাইয়েছিলেন। খেয়ে খুব মজা পেয়েছিলাম। এরপর সেই ছন্দক সারথি চাকমার কাছ থেকে কাজু বাদামের চাষ পদ্ধতি জেনে নিয়ে কিছু বীজ সংগ্রহ করে নিজের বাগানে চাষ শুরু করি। বাগানের সার্বিক পরিকল্পনা আমার নিজের। প্রথম প্রথম মণপ্রতি ২০০/৩০০ টাকা লাভ থাকত। এই লাভের অঙ্ক এখন আরো বেড়েছে।'

প্রশ্ন করলাম, কোন ভরসায় আপনি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন? জবাবে বললেন, 'প্রথম থেকেই দেখে আসছি কাজু বাদামের চাহিদা দিনদিন বাড়ছেই। এই উদ্যোগে লেগে থাকার এটাই আমার ভরসা।'

প্রথম অবস্থায় কীভাবে বাজারজাত করতেন জিজ্ঞেস করলে বললেন, বাগান থেকে কাজু বাদাম সংগ্রহ করে বাজারের এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করতেন। সেই ব্যবসায়ী তা ঢাকায় পাঠাতেন। এখনো আগের মতোই বাজারের ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেন। তবে এখন মোবাইল ফোনে এখানে-সেখানে ফোন করে বাজার যাচাই করে নেন।

বাজার সম্প্রসারণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাইলে বললেন, তেমন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। তাদের এখানে কাজু বাদাম প্রক্রিয়াজাতকরণ করার উপায় নেই। দা-ছুরি দিয়ে খোসা থেকে কাজু বাদাম ছাড়ালে তা আর অক্ষত রাখা যায় না বলে বিক্রিও করা যায় না।

যে কোনো পণ্য, তা সে কৃষিপণ্যই হোক আর শিল্পপণ্যই হোক, চাহিদা না থাকলে তা উৎপাদন মানেই লোকসানের পথে পা বাড়ানো। সে কথা উল্লেখ করে জানতে চাইলাম তার পণ্যের চাহিদা কেমন। তিনি নির্দ্বিধায় এক কথায় জানিয়ে দিলেন– বেশ ভালো। স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'না, পারছি না। কারণ সেই একই– অর্থাৎ প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে পারছি না বলে বাজার-চাহিদামতো সরবরাহ করতে পারছি না'।

জানতে চাইলাম– আপনি তো অন্য অনেককিছু করতে

আমি যেহেতু প্রথম দিককার একজন কাজুবাদাম চাষি, তাই এর চাষ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি অনেক কিছুই ছিল অজানা। পিপঁড়ে একটি বড় সমস্যা। লাল পিঁপড়ে অনেক ফল খেয়ে ফেলে। তা ছাড়া প্রক্রিয়াজাত করতে পারি না বলে অনেক কম দামে বিক্রি করে যেতে হচ্ছে।

পারতেন, তা না করে এ ধরনের উদ্যোগ কেন গ্রহণ করলেন? কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন– পারিবারিক আয় বাড়াতে। এ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বললেন, আমাদের দেশে কাজু বাদাম চাষের ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল। কারণ আজ কোনো প্রসেসিংয়ের ব্যবস্থা দেশে নেই ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতে কেউ না কেউ ঠিকই এ কাজটি করবে, আর তখন এর কদর অনেক গুণে বেড়ে যাবে।

পুরো রুমা উপজেলায় তিনি অন্যতম সফল কাজুবাদাম চাষি। তাই জিজ্ঞেস করলাম– এ পর্যন্ত উঠে আসতে আপনাকে কী কী করতে হয়েছে? দূরে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে বলতে থালেন, 'এ পর্যন্ত উঠে আসতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, অনেক লড়াই করতে হয়েছে। মায়ের গর্ভে আমার বয়স যখন সবে তিন মাস তখনই ঘোর অন্ধকার নেমে আসে পরিবারে। আমার মাকে ছেড়ে চলে যান বাবা। মা তখন লেমুঝিরি পাড়ায় নানার কাছে চলে যান। সেখানেই জন্ম হয় আমার। শিশু বয়সে মা আর নানিই আমাকে লালন-পালন করেছেন। তারা আমাকে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন লেমুঝিরিতেই। সেখানে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছিলাম। এরপর বান্দরবানে নানির আরেকটি বাসায় চলে যাই এবং সেখানে ক্লাস এইট পযন্ত পড়াশোনা করি। অর্থাভাবে এরপর আর পড়তে পারিনি। নানির সংসারের আয় বাড়াতে তখন পাহাড়ে জুম চাষ শুরু করি। এরপর অনেক চেষ্টা করে কৃষি বিভাগে উদ্ভিদ সংরক্ষক (PPM--- Plant Protection Mokodon) হিসেবে চাকরি পাই। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল– এই দীর্ঘ সময় ধরে ওই চাকরি করি। আর ১৯৯০ সালে চাকরি ছেড়ে কাজু বাদাম, আম, আমড়া, কমলা, ইত্যাদির বাগান এবং পাহাড়ে জুম চাষ শুরু করি।'

এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা কী কী জানতে চাইলে বললেন, 'আমি যেহেতু প্রথম দিককার একজন কাজুবাদাম চাষি, তাই এর এর চাষ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি অনেক কিছুই ছিল অজানা। পিপঁড়ে একটি বড় সমস্যা। লাল পিঁপড়ে অনেক ফল খেয়ে ফেলে। তা ছাড়া প্রক্রিয়াজাত করতে পারি না বলে অনেক কম দামে বিক্রি করে যেতে হচ্ছে।'

আপনি কীভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে পেরেছেন জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'বাস্তব বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে মোটামুটিভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে কিছুটা সক্ষম হয়েছি।'

নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে জানতে চাইলে বললেন, লেগে থাকতে হবে। হতাশ হয়ে অনেকেই এই চাষ ছেড়ে দিয়েছে। তেমনটি হলে চলবে না।

তিনি প্রচলিত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন জানিয়ে বললেন, 'আমার কৃষি যন্ত্রপাতি দেশীয়। আমাকে কেউ প্রশিক্ষণ দেয়নি। তাই নিজে যেটুকু বুঝি সে অনুযায়ী স্থানীয় পদ্ধতিতেই চাষ এবং সংরক্ষণ করতে হচ্ছে।

তার এই উদ্যোগে মোট ৫ জন কাজ করে। সবাই দক্ষ।

হিসেব পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন, খাতায় নিজেই হিসেব লিখে রাখেন।

এরপর আমাদের পাহাড়ের আরো উঁচুতে নিয়ে গিয়ে কাজুবাদাম বাগান ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বললেন– এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা প্রবল। আরো অনেকে যদি এ চাষে এগিয়ে আসে তা হলে বিদেশ থেকে আরো অনেক কোম্পানি আসবে এখানকার কাজুবাদাম কিনতে। ■

কফি

৫ বছর পর বিপুল পরিমাণ কফি উৎপন্ন হবে পাহাড়ে

বর্তমান বিশ্বে পানীয় হিসেবে অন্যতম জনপ্রিয় হচ্ছে কফি। সারাবিশ্বের মানুষ বছরে ৪০ হাজার কোটি কাপেরও বেশি কফি পান করে। দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ৭০টির বেশি দেশ কফি উৎপাদন করে। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে কফি উৎপাদনকারী সব দেশেরই অবস্থান ভূমধ্যসাগরের আশপাশে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে রফতানিকৃত সবচেয়ে মূল্যবান পণ্যের তালিকায় জ্বালানি তেলের পরেই রয়েছে কফি। দিনদিনই বাড়ছে কফিপায়ীর সংখ্যা। এমনকি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকাতেও এখন অনেক দোকানে কফি মেশিনে কফি বিক্রি করতে দেখা যায়।

দুই ধরনের কফি চাষ হয়ে থাকে বিশ্বে– অ্যারাবিকা ও রোবাস্টা। ১৫০ বছর ধরে ব্রাজিলই বিশ্বের শীর্ষ কফি উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের শীর্ষ ১০ কফি উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে– ১. ব্রাজিল (বার্ষিক উৎপাদন ২২ লাখ ৪৯ হাজার ১০ মেট্রিক টন, অ্যারাবিকা ৭৪%, রোবাস্টা ২৬%); ২. ভিয়েতনাম (বার্ষিক উৎপাদন ১৩ লাখ মেট্রিক টন, রোবাস্টা ৯৬%, অ্যারাবিকা ৪ %); ৩. কলাম্বিয়া (৫ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন); ৪. ইন্দোনেশিয়া (৫ লাখ ৫৯ হাজার মেট্রিক টন); ৫. ভারত (৩ লাখ ৬ হাজার মেট্রিক টন); ৬. ইথিওপিয়া (২ লাখ ৬৪ হাজার মেট্রিক টন); ৭. ম্যাক্সিকো (২ লাখ ৫২ হাজার মেট্রিক টন, প্রায় সবই অ্যারাবিকা); ৮. পেরু (২ লাখ ৪১ হাজার মেট্রিক টন); ৯. হন্ডুরাস (২ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন); ১০. গুয়েতেমালা (২ লাখ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন)।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে কফি উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার পরিবেশ, মাটির গুণ সবই কফি চাষের অত্যন্ত উপযোগী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ ফুট উঁচুতে কফি চাষ সম্ভব হলেও ভালো ফলনের জন্য সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৯০০ থেকে ১৮০০ ফুট উঁচুতে কফি চাষ করা হয়। কফি চাষের জন্য ঢালু জমির প্রয়োজন। এই সবকিছু বিবেচনায় দেশের পাহাড়ি এলাকায় ব্যাপকভাবে কফি চাষ সম্ভব। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এরই ভেতর আশাজাগানিয়া বেশকিছু উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সে লক্ষ্যে ৯ বছর মেয়াদী কফি চাষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এরই ভেতর খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়, পানছড়ি; রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ও বরকল এবং বান্দরবান জেলার রুমায় ৫০০-এরও বেশি কফি বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। আমি নিজে বান্দরবান জেলার রুমায় গিয়ে একটি কফি বাগান দেখে এসেছি। তাদের সঙ্গে আলাপ করে আমি বেশ আশাবাদী বাংলাদেশে ব্যাপক কফিচাষের সম্ভাবনার ব্যাপারে। তবে বাংলাদেশে কফি

কফির কথকতা

কফি পান, চাষ ও বিপণন নিয়ে অনেক উপকথা ও কিংবদন্তি প্রচলিত। এক কিংবদন্তি অনুসারে বিশ্বাস করা হয়– ইথিওপিয়ার ওরোমো এলাকার মানুষের পূর্বপুরুষরা সর্বপ্রথম কফির কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির গুণটি শনাক্ত করে। এই কাহিনি অনুসারে নবম শতকে ইথিওপিয়ার কালদি নামের এক ছাগলপালক একদিন লক্ষ করল এক ধরনের গাছ থেকে (কফিগাছ) ছোট ছোট গোটা গোটা লাল ফল খাওয়ার পর তার ছাগলগুলো খুব চনমনে হয়ে উঠেছে। আর এভাবেই সে আবিষ্কার করে কফি। সেই থেকে ইথিওপিয়ার পার্বত্যাঞ্চলের মানুষ কফিবীজ পানিতে সেদ্ধ করে কড়া স্বাদের কফি পান করত। এতে তাদের কর্মশক্তি বেড়ে যেত।

আরেক কিংবদন্তি অনুসারে কফি আবিষ্কার করেছিলেন ইয়েমেনের শেখ ওমর। প্রার্থনা করে অসুস্থ মানুষের অসুখ সারাতে পারতেন বলে তার খুব সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তো একবার কী এক কারণে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ায় তাকে ইয়েমেনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বন্দর-শহর মকার অদূরে আওসাবের কাছে মরুভূমির এক গুহায় (বর্তমানে ওউসব, জাবিদ থেকে ৯০ কিলোমিটার পূর্বে) নির্বাসনে পাঠানো হয়। প্রথম কয়েকদিন প্রায় না খেয়েই থাকতে হয় তাকে। শেষমেশ অনাহারের জ্বালা সইতে না পেরে ওমর কাছের ঝোপের এক গাছ থেকে ছোট গোল গোল লাল রঙের কিছু ফল পেড়ে খেলেন। কিন্তু ভীষণ তেতো লাগছিল তা। আশপাশে খাবার উপযোগী আর কিছু না পেয়ে তিনি এই ফল আরো কিছু পেড়ে এনে এগুলোর বীজ বের করে খাওয়ার উপযোগী করতে আগুন জ্বেলে ভেজে নিলেন। কিন্তু ভাজার কারণে এগুলো বরং খুব শক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি এই ভাজা বীজগুলোকে নরম করার জন্য পানিতে সিদ্ধ করলেন। এর ফলে তা খুব ঘ্রাণ ছড়ানো বাদামি তরলে পরিণত হলো। এরপর এভাবে তিনি বীজ সিদ্ধ করে সেই তরল খেতে থাকলেন। খুবই আশ্চর্য হয়ে তিনি খেয়াল করলেন এতে তিনি হারানো শক্তি ফিরে পেতে শুরু করেছেন। দিনের পর দিন তিনি এভাবেই বেঁচে ছিলেন। এমনকি আগের চেয়ে স্বাস্থ্যও ভালো হয়ে গিয়েছিল । ক্রমে এই জাদুকরি পানীয়ের খবর লোকমুখে মকার ধর্মীয় নেতাদের কানে পৌঁছতেই তাকে মকায় ফিরে যেতে বলা হলো এবং তাকে সবাই পীর হিসেবে মেনে নিলো। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই জাদুকরি পানীয়টি ছিল কফি। এরপর ইয়েমেন থেকে মিসর হয়ে আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে কফি।

তবে কফি পানের বা কফি গাছ সম্পর্কে ধারণার সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় ১৫ শতকের ইয়েমেনের আহমেদ আল-গাফ্ফারের বর্ণনায়। আরবের এখানেই সর্বপ্রথম কফিবীজ রোস্ট এবং গরম গরম কফি খাওয়ার প্রচলন হয়। এখন যেভাবে কফি রোস্ট এবং পানীয় হিসেবে কফি তৈরি করা হয় অনেকটা তেমনই ছিল প্রথমাবস্থার কফি তৈরির প্রক্রিয়া। সুফি সাধকেরা জেগে থেকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য কফি পান করতেন। এরপর সেখান থেকে পারস্য, তুরস্ক এবং উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে কফি। এরপর কফির বীজ বপন করা হয় মাইসরে। সেখান থেকে কফি ছড়িয়ে পড়ে ইতালি এবং বাদবাকি ইউরোপে এবং আমেরিকায়। সর্বপ্রথম কফি আমদানি করে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পরবর্তীতে এই ডাচরাই জাভা ও সিলনে কফি চাষ শুরু করে। ইন্দোনেশিয়ার জাভা থেকে ১৭১১ সালে নেদারল্যান্ডসে প্রথম কফি রফতানি করা হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে এই কফি ইংল্যান্ডে জনপ্রিয় করে তোলে। ফরাসিরা প্রথম কফি পান করে ১৬৫৭ সালে। ১৬৮৩ সালে ভিয়েনা যুদ্ধের পর কফি পান শুরু করে অস্ট্রিয়া ও পোল্যান্ডের মানুষ। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কফি উৎপাদন করে ব্রাজিল। ব্রাজিলে কফি চাষ শুরু করেছিল পর্তুগিজরা। ইউরোপীয়দের ভেতর পর্তুগিজরাই প্রথম এসেছিল ব্রাজিলে। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলে উপনিবেশ স্থাপন করেই সেখানে কফি চাষ করার উদ্যোগ নেয় তারা। বেছে নেয় ব্রাজিলের উঁচু পার্বত্যভূমি। এখানে বাণিজ্যিকভাবে কফি চাষ শুরু হলে তা ইউরোপে রফতানি হয়। ইউরোপীয়রা ব্রাজিলের কফির ঘ্রাণে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় বণিকেরা ভিড় জমাতে থাকে ব্রাজিলে। যন্ত্রপাতি এবং মূলধনও এলো ইউরোপ থেকে। ব্রাজিলের কফি-ব্যবসা দিনদিনই বাড়তে থাকল।

প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা এখনো গড়ে না ওঠায় তারা তেমন দাম পাচ্ছেন না। সম্প্রতি কয়েকটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান কফির খোসা ছাড়ানোর বেশকিছু মেশিন সরবরাহ করেছে পার্বত্য এলাকায়। কফিচাষ থেকে শুধু কফি নয়, কফিফুলে ব্যাপক মধুচাষ এবং কফি থেকে শ্যাম্পু উৎপাদন সম্ভব।

রুমার বেথেলপাড়ার কফিচাষিদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তাদের এলাকায় সীমিত পরিসরে কফিচাষ শুরু হয়েছে ৫০ বছর আগে। মিয়ানমার ও ভারতের মিজোরাম থেকে কেউ কেউ তখন শখের বশে কফির চারা এনে লাগিয়েছিলেন। চা-বাগানের জন্য বিখ্যাত শ্রীমঙ্গলে কফিচাষ শুরু হয়েছিল সত্তরের দশকের শেষের দিকে। বিখ্যাত চা-কোম্পানি জেমস ফিনলে তাদের চা বাগানের পাশাপাশি কফিচাষ শুরু করে এবং ৫শ ৬০ একর জমিতে বিশাল এক কফি বাগান গড়ে তোলে। সেখানে তারা অ্যারাবিকা ও রোবাস্টা দুই ধরনের কফিই চাষ করত। আন্তর্জাতিক মানের বেশ কয়েকটি হোটেল-রেস্তোরাঁ ছিল তাদের কফির গ্রাহক। তা ছাড়া বড় বড় শহরের সচ্ছল পরিবারের মানুষও ফিনলে কোম্পানির কফি পান করত। কিন্তু প্রতি হেক্টরে মাত্র ১ হাজার কেজি কফি উৎপাদিত হওয়ার কারণে তাদের উৎপাদন-ব্যয় খুব বেশি পড়ত। শেষমেশ লোকসানের কারণে এক সময় তারা কফির ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে। ফিনলে কোম্পানি তাদের কফি বাগান গুটিয়ে ফেললেও এতে প্রমাণিত যে সিলেট অঞ্চলের চা-বাগান এলাকায় কফি চাষ সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

বম নেতা লাললুং থাং বম

উদ্বুদ্ধ করছেন কাজু বাদাম ও কফি চাষিদের

বেথেলপাড়ার খোয়া হাওতু, (বমদের গ্রামপ্রধান) লাললুং থাং বম। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় তিনি তার এলাকার কফি ও কাজুবাদাম চাষিদের ভেতর সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কী করে এই চাষিরা আরো লাভবান হতে পারেন। শুধু কাজু বাদাম ও কফিই নয়, বর্তমান এবং ভবিষ্যত বাজার-চাহিদার একটি মূল্যায়ন দাঁড় করিয়ে সেই নিরিখে তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকদের চাষাবাদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং তার সাধ্যমতো সার্বিক সহায়তা করে থাকেন। কফি চাষের ব্যাপারে তিনি তার অধীনস্থ এলাকায় নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে নিয়েছেন। ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করে তিনি আমাদের বললেন, 'যেমন ধরুন আমাদের লোকেরা এখানে আম চাষও করে থাকে। সে ক্ষেত্রে একজন বম অধিবাসী আম চাষ করে লাভবান হবেন, নাকি কফি চাষে বেশি লাভবান হবেন তা যাচাই করতে তিনি একটি আমগাছ যতটা জায়গা দখল করে, সেটুকু জায়গায় কতটা কফি গাছ লাগানো সম্ভব সেই হিসেবটা বের করেন। একটি আম গাছ থেকে কাঁচা আম, পাকা আম মিলে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা আয় করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে একটি আমগাছের জায়গায় ৫/৬টি কফিগাছ লাগানো সম্ভব। একটি কফিগাছে যদি মাত্র ২ কেজি কফিও পাওয়া যায় তা হলেও ঐ জায়গাটুকুতে ১০ থেকে থেকে ১২ কেজি কফি পাওয়া যাবে। বর্তমানে এখানে প্রতিকেজি কফি বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকা করে। তার মানে ঐ জায়গাটুকুতে কফি চাষ করলে আয় হবে ৩ হাজার টাকা থেকে ৩ হাজার ৬০০ টাকা। তিনি তাই তার সম্প্রদায়ের লোকদের কফি চাষে উদ্বুদ্ধ করছেন। এ ব্যাপারে আরো কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হয়েছিল তার গত বছর। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি নেপালে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন রুমার তুলনায় অনেক পাথুরে শক্ত মাটি হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার কফিচাষিরা কীভাবে লাভবান হচ্ছেন। নেপাল থেকে ফিরে এসে তিনি আরো বেশি করে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন সবাইকে কফিচাষে। তাদের প্রয়াসের ফলে রুমায় এখন ব্যাপকভাবে কফি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে। গর্বের সঙ্গে বললেন, আগামী ৫ বছর পর এ এলাকায় কফির বামপার ফলন হবে। কফিচাষের ওপর প্রশিক্ষণও দিয়েছেন ২০জন বম অধিবাসীকে। যাদের বাড়িতে কফি বাগান আছে তারা সবাই বীজতলায় ব্যাপকভাবে কফির চারা করছেন এবং তা বিক্রিও হচ্ছে খুব। কিছুটা গর্বের সঙ্গেই জানালেন তার ভাতিজি-জামাই এ বছর ৬০ হাজার টাকার চারা বিক্রি করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে জানিয়ে রাখলেন, কফির ভালো ফলন পাওয়ার জন্য দেড় থেকে দুই বছর বয়সের চারা লাগাতে হয়।

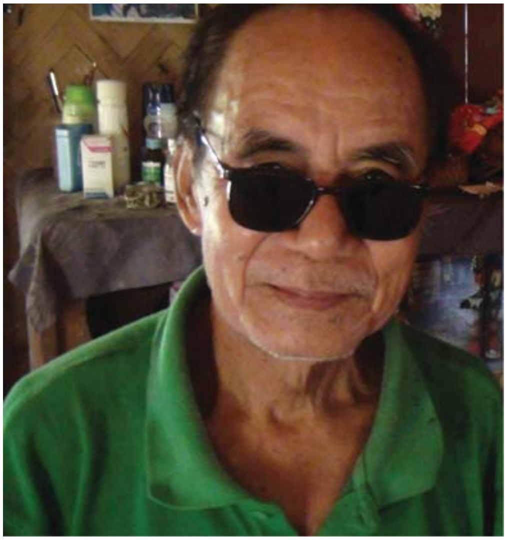

কফিচাষি রেভারেন্ড কাপখুপ বম

২০১৬ সালের ৭ ডিসেম্বর আমরা গিয়েছিলাম বান্দরবানের রুমা উপজেলার বেথেলপাড়ার কফি বাগান দেখতে। এখানে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বমদের বাস। বম অধ্যুষিত এ বেথেলপাড়ার রেভারেন্ড কাপখুপ বম দীর্ঘদিন ধরে তার বাড়ির আশপাশে পাহাড়ি ঢালু জমিতে কফি চাষ করে আসছেন। জাতিতে বম হলেও এখানকার সবাই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। কিছুদিন আগে ৮০তম জন্মদিন পালন করেছেন। কফি চাষের কথা উঠতেই জানালেন ৫০ বছর আগে থেকেই এ এলাকায় কফি চাষ হচ্ছে। তারা জানতেন না। পরে জেনে নিজের ভিটেতে কফি চাষ শুরু করেন। বছরে তিনি ২ থেকে ৩ মণ কফি উৎপাদন করতে পারেন। অন্যের মুখে শুনে এবং এলাকায় যারা দীর্ঘদিন ধরে চাষ করছে তাদের অভিজ্ঞতা জেনে কফি বাগান গড়ে তুললেও প্রথমে তিনি জানতেন না কী করে কফি ফল থেকে কফি পাওয়া যায়। পাড়ার অন্যদের দেখাদেখি তিনিও কফি ফল ঢেকিতে কুটে তা থেকে কফি-বিন বের করে ভেজে গুঁড়ো করে কফি বানাতেন এবং চায়ের মতো গরম পানিতে গুলে খেতেন।

আমি নিজে এবার ১ মণ কফি ফলিয়েছি। বছর দুয়েক ধরে নেসলে কোম্পানি ৩০০ টাকা মণ ধরে খোসাসহ কফি কিনছে। কিন্তু বিশ্ববাজারে কফির দামের চেয়ে তা খুবই কম। কোনো উপায় না থাকায় এখানকার কফি চাষিরা অনেক কম দামেই কফি বিক্রি করছেন

কফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে বীজাবরণের ভেতর থেকে কফি-বিন বের করা এবং তা সঠিক নিয়মে রোস্টিং। এই রোস্টিংয়ের ওপরই মূলত কফির স্বাদ নির্ভর করে। রেভারেন্ড কাপখুপ বম ২০০০ সালে মাত্র ২০ টাকার কফিবীজ কিনে কফিচাষ শুরু করেছিলেন। অজ্ঞতার কারণে প্রথম প্রথম তারা ২০/২৫ টাকা কেজি দরেও বিক্রি করেছেন বীজাবরণসহ কফি। বর্তমানে বিক্রি করছেন ৩০০ টাকা কেজি দরে। অথচ এখন বিশ্ববাজারে কফি বিক্রি হয় ৩ হাজার থেকে সাড়ে আট হাজার টাকা কেজি দরে। হাতে বা গ্রাইন্ডার ব্লেন্ডার মেশিনে বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রণের হার এবং প্রস্তুত করার কৌশলের ওপর কফির ধরন ও মূল্যমান নির্ভর করে। যেমন– মোকা, কাপুচিনো, এসপ্রেসো, ফ্র্যাপে বা কোল্ড এসপ্রেসো, কফি ল্যাটে, কফি অ ল্যে, অ্যামেরিকানো, ব্ল্যাক কফি ইত্যাদি। কফিগাছ দেখতে অনেকটা

জুঁইফুল গাছের মতো। একটি গাছ থেকে প্রতিমওসুমে ৫ কেজি পর্যন্ত কফি পাওয়া সম্ভব। একটি কফিগাছ থেকে ৩০/৩৫ বছর ফল আহরণ করা যায়। রুমার বাগানগুলো থেকে প্রতি বছর ৩ থেকে ৫ কেজি কফি পাওয়া যায়। এক কেজি কফি ফল প্রক্রিয়াজাত করে আধা কেজি কফি পাওয়া যায়। কফি গাছ থেকে শুধু পানীয় কফিই নয়, কফি গাছের অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে মধু ও শ্যাম্পু পাওয়াও সম্ভব।

এবার আমি তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলতেই জানালেন, বর্তমানে তিনি অবসর জীবন কাটাচ্ছেন এবং বম ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করছেন। খুব আগ্রহের সঙ্গে তিনি বাইবেল এবং এ পর্যন্ত করা এর বম অনুবাদ এনে দেখালেন। এরপর বলে গেলেন তার পারিবারিক তথ্য। তার বাবার নাম মরহুম খুয়াল দাও বম। স্ত্রী নিয়ার সিম বম। ৮ মেয়ে ১ ছেলে তার। ৩ মেয়ের এখনো বিয়ে দেয়া বাকি। একমাত্র ছেলে এইচএসসি পাস করে কফি এবং অন্যান্য ফল-সবজি-শস্যের জুম চাষ করে। তিনি এসএসসি পাস করে মিশনারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে এবং পরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি করেন ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। এরপর ধর্মকর্মে মন দেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ব্যাপ্টিস্ট চার্চে মণ্ডলী হিসেবে কাজ করছেন। ২০০৭ সাল থেকে বম ভাষায় অনুবাদ করছেন বাইবেল।

বাস্তবতার নিরিখে তিনি কথা বলছিলেন। ভাবাবেগে ভেসে যাচ্ছিলেন না। বললেন– ‘৫০ বছর আগে থেকে এখানে কফি চাষ হলেও মনে করেন কফি চাষ সবে শুরু হয়েছে। আশপাশের সবাই যে হারে কফিগাছ লাগাচ্ছেন তাতে পাঁচ বছর পরে উৎপাদনের অবস্থা ভালো হলে বলতে পারবেন যে, হ্যাঁ এখানে কফি চাষ হচ্ছে। গত ১০ বছর ধরে বিদেশিরা এসে এসে আমাদের জ্বালিয়ে মারছে। কাজের কাজ তো কিছুই করে না তারা। জাপান থেকে লোকজন এসেছে, আমেরিকা থেকে লোকজন এসেছে– এসে সবকিছু জেনে নিয়ে সেই যে গেছে আর কোনো খবর নেই। দেশেরও নানা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা থেকে আসছে, যেমন আজ আবার এলেন আপনারা। রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে আরকি! কয়েকটি বিদেশি কোম্পানি শক্ত বীজাবরণ থেকে কফি-বিন বের করার মেশিন বসিয়েছে কয়েকটি গ্রামে।

কিন্তু কফি রোস্টিংয়ের কোনো ব্যবস্থা এখনো নেই আমাদের দেশে। মোট কথা কফি প্রক্রিয়াজাতের কোনো উদ্যোগ এখনো কেউ নেয়নি এ দেশে। কাজু বাদামেরও সেই একই দশা। আমি নিজে এবার ১ মণ কফি ফলিয়েছি। বছর দুয়েক ধরে নেসলে কোম্পানি ৩০০ টাকা মণ ধরে খোসাসহ কফি কিনছে। কিন্তু বিশ্ববাজারে কফির দামের চেয়ে তা খুবই কম। কোনো উপায় না থাকায় এখানকার কফি চাষিরা অনেক কম দামেই কফি বিক্রি করছেন। একই ব্যাপার ঘটছে কাজু বাদামের ক্ষেত্রেও। কী বলব! এই রুমাতেই খুব শখ করে অনেকে কাজু বাদাম বাগান করে আশানুযায়ী লাভ করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। একজন তো গতবছর তার কাজু বাদাম বাগানের ১০০০ গাছ কেটে লাকড়ি বানিয়েছে! আমরা চেষ্টা করছি কারো মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেরাই কাজুবাদাম ও কফি প্রক্রিয়াজাতকরণের। এটায় যদি সফলকাম হই তা হলে গোটা রুমা এলাকায় যে যত কাজু বাদাম এবং কফি উৎপাদন করবে সব এক জায়গায় জমা করে প্রক্রিয়াজাত করে দেশের বাজারে এবং বিশ্ববাজারে বাজারজাত করা হবে। এই সামাজিক উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়া সফল হলে একজন চাষি অনেক বেশি লাভবান হতে পারবে। এতে দেশের অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।’

তার এই ধারণাটা খুব ভালো লেগে গেল। এই উদ্যোগের সফলতা কামনা করে আমরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। খুব আশা নিয়েই বিদায় নিলাম। ভিয়েতনাম মাত্র ১২ বছর আগে কাজু বাদাম চাষ শুরু করে যদি বিশ্বের ১ নম্বর উৎপাদনকারী দেশ হতে পারে, তা হলে আমরা কি তার কাছাকাছিও যেতে পারব না? অবশ্যই পারব। শুধু চাই উদ্যোক্তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। ■

সি-উইড

সমুদ্রজঞ্জাল নয়

সাগরতলের গুপ্তধন

সাগরতলে ভবিষ্যত খাদ্যভাণ্ডার

বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন মানবজাতির ভবিষ্যত খাদ্য মজুদ রয়েছে সাগরতলে। পুষ্টিগুণের বিচারে সাগরশৈবাল খুবই সমৃদ্ধ খাবার। উপকূলীয় এলাকার মানুষ সাগরশৈবালকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে আসছে বহুকাল ধরে, বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার জাপান, চীন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, দক্ষিণ এশিয়ার ব্রুনেই, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স,দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলিজ (সাবেক ব্রিটিশ হন্ডুরাস), পেরু, চিলি, কানাডার উপকূলীয় অঞ্চল, স্ক্যান্ডানেভিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য, ফ্রান্স ও স্কটল্যান্ডের অধিবাসীরা। এক গবেষণায় জানা গেছে ১৪,০০০ বছর আগেও চিলির দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা সাগরশৈবাল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত।

সি-উইড বা সাগরশৈবালের ব্যবহার বহুবিধ এবং দিনদিনই এর ব্যাপ্তি বাড়ছে। খাদ্য, ওষুধ, প্রসাধন এবং বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় এটির চাষও বাড়ছে সারা পৃথিবীতে। মানুষ তার চাহিদা থেকেই সি-উইডকে খাদ্যে পরিণত করেছে। পরবর্তী গবেষণায় এর পুষ্টিমানও অনেক সমৃদ্ধ বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। জাপান এবং চীনে এর চাষ প্রথম শুরু হয়। জাপানের টোকিও উপসাগরে সি-উইডের চাষ শুরু হয়েছিল ১৬৭০ সালে। সেই থেকে বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় এর চাষ বহুগুণে বেড়েছে।

গত ৫০ বছরে এ চাষ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনগুণ বেড়েছে। ১৯৯৭ সালে বিশ্বে সি-উইড উৎপাদন হয়েছিল যেখানে ৭০ লাখ মেট্রিক টন সেখানে ২০১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৪০ লাখ মেট্রিক টনে। এ থেকেই বোঝা যায় মানবজাতির ভবিষ্যত নিরাপদ খাদ্যসংস্থানে কী বিরাট ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে সি-উইড। বলার অপেক্ষা রাখে না বর্তমানে নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের ভেতর এই চাষ সীমাবদ্ধ থাকলেও ভবিষ্যতে সাগর-মহাসাগর উপকূলবর্তী প্রায় সব দেশেই এই চাষ ছড়িয়ে পড়বে। বাংলাদেশেও এর চাষ শুরু হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার এরই ভেতর সাগরশৈবালজাত খাদ্য, ওষুধ ও প্রসাধন সামগ্রী রফতানি শুরু করেছে। বাংলাদেশের উৎসাহী উদ্যোক্তারা এগিয়ে এলে আমরাও যে এ খাত থেকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহিদুল ইসলাম

পরীক্ষাগারের আগল ভেঙে সি-উইডকে ভোক্তার দুয়ারে নিতে চান

সি-উইডের আক্ষরিক মানে দাঁড় করাতে গেলে সামুদ্রিক আগাছা বা সমুদ্রজঞ্জালই বলবেন বেশিরভাগ মানুষ। কিন্তু এটি আদৌ কোনো আগাছা বা জঞ্জাল নয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় সামুদ্রিক শৈবাল। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সার্বিক বিবেচনায় সাগরতলের গুপ্তধন বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না।

সি-উইড, বিশেষ করে বাংলাদেশের সি-উইড সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ সকাল ১০টায় আমরা গিয়ে হাজির হলাম কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রে। এদিন ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার। রিশাদ আগে থেকেই যোগাযোগ করে রেখেছিলেন। সেখানে গিয়ে গাড়ি থেকে নামার পর রিশাদ মোবাইলে কথা বলে জানালেন, সি-উইড সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেবেন এই কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মহিদুল ইসলাম। তিনি একটু বাইরে আছেন, কয়েক মিনিটের ভেতরেই এসে যাবেন। ছুটির দিন বলে অফিস, ল্যাবরেটরি– সবই ছিল জনশূন্য। অগত্যা লুৎফর ভাই এবং আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। লম্বা, বিশাল পুকুরটির চারপাশজুড়ে নারকেল, লিচু, মেহগিনিসহ নানা গাছের সমাহার। বেশ ছায়াঘেরা পরিবেশ। পুকুরটাকে কয়েকভাগে ভাগ করে বিভিন্ন রকমের মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি চাষ করা হচ্ছে। পুকুরের বেশ খানিকটা দূরে দেখলাম শুঁটকি শুকানোর ভাঙাচোরা একটা ড্রায়ার। আমাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে রিশাদ জানালেন, 'আমাদের মতো ড্রায়ার তৈরির চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওরা পারেনি।' মিনিট পাঁচেক পরেই একটি মোটরবাইকে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মহিদুল ইসলাম এসে হাজির হলেন। তালা খুলে ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে ঢুকতে বলে নিলেন– ভেতরের সব জায়গার ছবি তোলা যাবে না। আমাদের গবেষণার অনেক কিছুরই ছবি তোলা নিষেধ।

অফিসের দেয়ালে ঝোলানো সি-উইডের ছবি দেখতে দেখতে একটি কক্ষে ঢুকে নানা ধরনের সি-ইউডের নমুনা দেখছিলাম। সেগুলো সম্পর্কে বলতে বলতে মহিদুল জানালেন, বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশের সামুদ্রিক শৈবাল বিশ্বের এক নম্বর গ্রেডের।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কক্সবাজার জেলার টেকনাফসহ সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং বাঁকখালী মোহনার আশপাশের পাথুরে ও প্যারাবন এলাকায় জোয়ার-ভাটার অন্তর্বর্তী স্থানে ১০ প্রকারের সি-উইড দেখতে পাওয়া যায়। সি-উইড জন্মানোর জন্য কিছু অবলম্বন বা ভিত্তির দরকার হয়। সাধারণত বড় বড় পাথর, প্রবাল, শামুক-ঝিনুক-পলিকিটের খোসা, প্যারাবনের গাছ ও শেকড়, শক্ত মাটি কিংবা অন্য যে কোনো শক্ত বস্তুর ওপর সি-উইড জন্মে। কক্সবাজার ও পার্বত্য অঞ্চলের রাখাইন এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সালাদ ও চাটনি হিসেবে সি-উইড খেয়ে থাকে। স্থানীয় ভাষায় সি-উইড 'হেজালা' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বিশাল উপকূলীয় জলসীমা অত্যন্ত উর্বর। তাই এশিয়ার অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে দেশের উপকূলে সি-উইড চাষে সফলতার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল। এ লক্ষ্যে বেছে নিতে হবে নিরাপদ আশ্রয়যুক্ত স্থান, যেখানে শক্তিশালী ঢেউ ও স্রোত আঘাত হানে না; দূষণমুক্ত স্থান; নিশ্চিত করতে হবে সি-উইডের পর্যাপ্ত বীজ বা টিস্যুর প্রাপ্যতা।

মহিদুল আমাদের জানালেন, '২০০৭ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সি-উইড নিয়ে গবেষণা এবং এর চাষ পদ্ধতির প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. জাফর। আমাদের প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে কাজ করে আসছে ২০১২ সাল থেকে।

'এরই মধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজারের সামুদ্রিক শৈবাল গবেষক দল সেন্টমার্টিন, বাঁকখালী ও ইনানী এলাকার জোয়ার-ভাটার অন্তর্বর্তী স্থানে সি-উইডের বহুল প্রাপ্য বাণিজ্যিক প্রজাতি হিপনিয়া-এর চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি দল কক্সবাজার সফর করে বাংলাদেশের সি-উইডের মানের ভূয়সী প্রশংসা করে বাংলাদেশে এর উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা জানিয়ে গেছেন। আমরা কক্সবাজার সদর উপজেলার বাঁকখালী-মহেশখালী চ্যানেলের মোহনায় নুনিয়াছড়া থেকে নাজিরারটেক পর্যন্ত সৈকতসংলগ্ন জোয়ার-ভাটা এলাকা এবং মহেশখালী দ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সি-উইডের প্রাকৃতিক-উৎপাদনক্ষেত্র শনাক্ত করেছি। আমরা এ

> কক্সবাজার সদর উপজেলার বাঁকখালী-মহেশখালী চ্যানেলের মোহনায় নুনিয়াছড়া থেকে নাজিরারটেক পর্যন্ত সৈকতসংলগ্ন জোয়ার-ভাটা এলাকা এবং মহেশখালী দ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সি-উইডের প্রাকৃতিক-উৎপাদনক্ষেত্র শনাক্ত করেছি। আমরা এ পর্যন্ত সেন্টমার্টিন দ্বীপ, বাঁকখালী মোহনা এবং টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ ও শাপলাপুর থেকে ৫০ প্রজাতির সি-উইডের নমুনা সংগ্রহ করেছি। এর ১০টি প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ

পর্যন্ত সেন্টমার্টিন দ্বীপ, বাঁকখালী মোহনা এবং টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ ও শাপলাপুর থেকে ৫০ প্রজাতির সি-উইডের নমুনা সংগ্রহ করেছি। এর ১০টি প্রজাতিকে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি। এর ভেতরে এটারোমরফা (সাগরপাতা), কোলাপেরাসমেসা (সাগর আঙুর), হিপনিয়া সিপ. (সাগর সেমাই), সারগাসাম ওলিগোসিসটাম (সাগর ঘাস), প্যাডিনা টেট্রাস্ট্রমাটিকা (সাগর ঝুমকা), হাইড্রক্লাথ্রাস ক্লাথ্রাটাস (জিলাপি শ্যাওলা), ক্যাটেনেলা সিপ. (শৈবালমূললতা) এবং পরফিরা সিপ. (লাল পাতা) অন্যতম। পরীক্ষামূলকভাবে আমরা আরো ৫টি প্রজাতি চাষ করছি সেন্টমার্টিনে। চাষকৃত স্থানে সি-উইড জন্মানোর জন্য জালের ভিত্তি বিছিয়ে রাখার ১ মাস পর থেকে প্রতিমাসে একবার করে আংশিক সি-উইড সংগ্রহ করলে বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়। **আমাদের জলবায়ুতে স্থানভেদে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সি-উইড চাষ করা যেতে পারে।** আমাদের পাশাপাশি কোস্ট ট্রাস্ট

সি-উইডের পুষ্টিমান

প্রাথমিকভাবে কক্সবাজার উপকূলে উৎপাদিত সি-উইডের ৬টি প্রজাতির সাধারণ পুষ্টিমান নির্ণয় করেছেন কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ। এখানে সে তথ্য তুলে ধরা হলো–

	হিপনিয়া সিপ.	হিপনিয়ামুসিফরমিস	প্যাডিনা টেট্রাস্ট্রমাটিকা	কলেপ্রার্যাসেমোসা	সারগাসাম অলিগোসিসটাম	জেনিয়া রুবেন
আর্দ্রতা	১৭.৪৫	২৪.৩১	১৫.৬৮	১৬.৩৬	২১.০৯	৮.৫৮
খনিজদ্রব্য	৩.৯৬	৯.৭৬	২৭.৯৫	৯.৯০	১২.৯৪	১৬.২৭
আমিষ	২২.৩১	১৩.৭৩	১২.২৯	২২.২৫	৮.১৯	৫.৭০
তেল	০.৭৮	০.৩৪	০.৯৮	২.৬৫	০.৮৩	০.৪১
আঁশ	৪.১০	৫.৬০	৬.৮০	৪.৮০	৫.২০	৫.৯০
শর্করা	৫১.৪০	৪৬.২৬	৩৬.৩০	৪৪.০৪	৫১.৭৫	৬৩.১৪

উপরের সারণি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচিত সামুদ্রিক শৈবালের প্রত্যেকটিই প্রচুর পরিমাণে অনুপুষ্টিসম্পন্ন। নির্বাচিত সব সামুদ্রিক শৈবালেই প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও লৌহ রয়েছে। বিভিন্ন মাছে যে পরিমাণ বিভিন্ন অনুপুষ্টি পাওয়া যায় (৫০-১,৪০০ পিপিএম) সি-উইডে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি অনুপুষ্টি রয়েছে, যা আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

সি-উইডে তৈরি খাদ্য

সি-উইডের যে তিনটি প্রজাতি দিয়ে খাদ্য তৈরি করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে– হিপনিয়া, সি. র‌্যাসেমোসা ও আই. এস. ক্রাসিফোলিয়াম। সি. র‌্যাসেমোসাকে সামুদ্রিক আঙুরও বলা হয়। এগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে তাজা অবস্থায় সালাদ হিসেবে খাওয়া যায়। আমাদের খাদ্যকে সামুদ্রিক শৈবালসমৃদ্ধ করার জন্য হিপনিয়া প্রজাতিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। যে কোনো খাদ্যে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে অল্প পরিমাণে হিপনিয়ার পাউডার বা সিদ্ধ করা তরল সামুদ্রিক শৈবালের সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করে খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করার ওপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান। প্রাাথমিকভাবে সামুদ্রিক শৈবালসমৃদ্ধ খাবারগুলো হলো– সালাদ, স্যুপ, আচার, পিঠা, চানাচুর, জেলি, সস ইত্যাদি। সি-উইড কেবল খাদ্য বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল নয়, ডেকরেশন আইটেম হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

নামে বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে সি-উইড চাষে সফলতা অর্জন করেছে।'

এরই ভেতর মহিদুল আমাদের নিয়ে প্রদর্শনীকক্ষে ঢুকেছিলেন। সেমাইয়ের মতো দেখতে এক ধরনের সি-উইডের দিকে দেখিয়ে সেটির নাম জানতে চাইলাম। মহিদুল জানালেন, 'এটির নাম হিপনিয়া। জিজ্ঞেস করলাম এটি কি আমাদের জলসীমায় জন্মে? জন্মালে কোথায়? বললেন– হ্যাঁ, জলসীমায় এগুলো প্রচুর পরিমাণে জন্মে সেন্টমার্টিন এবং ইনানী এলাকায়। এটির উপকারিতা এবং কোন কাজে লাগে? জবাব দিলেন– এটি দারুণ উপকারী এবং প্রচুর পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ সাগরশৈবাল। এটি যে কোনো খাবারের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় এবং এতে সেই খাবারের পুষ্টিগুণ অনেক বেড়ে যায়। এতে আছে নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, আয়রন, র (raw) ম্যাগনেসিয়াম, (প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রাপ্ত, কাঁচা), আইওডিন (লবণে যে আয়োডিন ব্যবহার করা হয় সে আয়োডিন নয়)। এতে যে আয়োডিন আছে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়।' এভাবে তিনি বেশ কয়েক প্রজাতির সি-উইড দেখালেন এবং সেগুলোর খাদ্য-উপাদান আর বাংলাদেশের কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা বলে চললেন। কোলাপেরাসমেসা সি-উইড দেখিয়ে বললেন– 'এগুলোকে সাগর আঙুর বলা হয়। দেখতে আঙুরের মতোই এবং এগুলো কাঁচাই খাওয়া যায়। পুষ্টিগুণে তো এটি খুব সমৃদ্ধ বটেই, তা ছাড়া এর ঔষধিগুণও অনেক উঁচু মানের। এটি ক্যান্সার প্রতিরোধী এবং বার্ধক্যও রোধ করে। বার্ধক্যজনিত রোগবালাই দূরে ঠেলে রাখে। খেয়াল করে দেখবেন আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে যেসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস, যেমন– চাকমা, মার্মা, বম ইত্যাদি তারা ৮০/৯০ বছর বয়সেও অনেক সুস্থ থাকেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা নিয়মিত সি-উইড খেয়ে থাকেন। এরপর তিনি ল্যাবরেটরিতে তাদের কালচার করে প্যাকেট করে রাখা সি-উইডগুলো আমাদের দেখালেন। প্যাডিনা, মানে যেটিকে আমরা আদর করে সাগর ঝুমকা বলি, সেই সি-উইড দিয়ে খুব চমৎকার স্যুপ হয়। এ ছাড়া কেক, কুকিজ ইত্যাদি খাবারের সঙ্গেও আমরা সি-উইড ব্যবহার করে এসবের পুষ্টিমান অনেক বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের এখানে মন্ত্রী মহোদয়, সচিব মহোদয় পরিদর্শনে এলে তাদের সি-উইডসমৃদ্ধ কেক ও কুকিজ পরিবেশন করেছি এবং তারা এসব খাবারের খুব প্রশংসা করেছেন। খাদ্য ছাড়া ডেকোরেশনেও আমরা সি-উইড ব্যবহার করে দেখেছি সৌন্দর্য বর্ধনে সি-ইউডের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব। এরপর আমি জানতে চাইলাম, আপনারা তো ডেকোরেশন এবং স্যুপ, কুকিজ, কেক ইত্যাদি খাবারের সঙ্গে সি-উইড ব্যবহার করেছেন, অন্য খাবারের একটি উপাদান নয়– শুধু সি-উইড দিয়ে কি কোনো খাদ্য তৈরি সম্ভব, যেমন ধরুন এক সময় স্পিরুলিনা নামে এক সাগরশৈবাল বাজারে পাওয়া যেত, তেমন কিছু? জবাবে বললেন– অবশ্যই সম্ভব। সারাদেশে না হলেও শুধু পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে সি-উইড খেয়ে আসছেন। ১০০/১২০ টাকা কেজি দরে সি-উইড কিনে সেগুলো পার্বত্যাঞ্চলের মানুষের কাছে ১৫০/২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। আমাদের দেশে যেসব সি-উইড পাওয়া যায় তার ভেতরে ১০টিকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে পার্বত্য এলাকার অধিবাসীরা ৩টি প্রজাতির সি-উইড খেয়ে থাকেন। বললাম– তা হলে পার্বত্য অধিবাসীরাই এখন দেশে সি-উইডের একমাত্র খাদক! জানালেন– জাহানারা ইসলাম নামে একজন নারী উদ্যোক্তা আছেন– তিনি সি-উইড দিয়ে পুষ্টিকর সুস্বাদু খাবার তৈরি করে র‍্যাডিসন ইত্যাদি ফাইভস্টার হোটেলে, অর্থাৎ বিদেশিরা যেসব জায়গায় থাকে সেখানে সরবরাহ করছেন এবং তার এসব খাদ্যসামগ্রীর ভালো চাহিদা রয়েছে। এ পর্যায়ে জানতে চাইলাম– আপনি কি মনে করেন, দেশের সব মানুষের মধ্যে যদি সি-উইডকে খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলা যায় তা হলে দেশের খাদ্য-চাহিদা অনেকটাই মেটানো সম্ভব হবে? অবশ্যই। সঠিকভাবে কালচার করে সি-উইডকে খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয় করা গেলে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি সমস্য অনেকটাই ঘোচানো সম্ভব।

সবকিছু ঘুরে দেখা হয়ে গেলে তিনি আমাদের কিছু বুকলেট দিয়ে বললেন– এখানে আমার গবেষণালব্ধ তথ্য পাওয়া যাবে। আরেকটি বুকলেটে আমার এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছিল, কিন্তু সেটি শেষ হয়ে গেছে বলে দিতে পারলাম না।

তার এই বিনয়ে মুগ্ধ হয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

জাহানারা ইসলাম

দেশে একমাত্র সি-উইড উদ্যোক্তা

জাহানারা ইসলাম– সি-উইডের সফল বাণিজ্যিক প্রয়োগে বাংলাদেশের একমাত্র উদাহরণ। দৃঢ় প্রত্যয়ী এই নারী উদ্যোক্তা আভিজাত্যের পাথুরে ঘেরাটোপ ভেদ করে একাকী হেঁটেছেন, রোদের পথে। সাগরতলে অজানার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা গুপ্তধনকে উন্মোচন করেছেন প্রকাশ্য দিবালোকে। খুলে দিয়েছেন দেশের হিরণ্ময় সম্ভাবনার দুয়ার। কেউ যখন ফিরেও তাকায়নি, শ্যাওলা-জঞ্জাল বলে দূরে ঠেলে দিয়েছে তিনি তখন এর দিকে তাকিয়েছেন অনুসন্ধানের আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে। অন্ধকারের অতলে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন রত্নভাণ্ডার। এখন দরকার এর যথাযথ ব্যবহার, তা হলেই কেবল জাতীয় কোষাগারে জমা হতে পারে মণিকাঞ্চন।

রিশাদ আমাদের আগেই জানিয়েছিলেন সি-উইডকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা একমাত্র বাংলাদেশি উদ্যোক্তা জাহানারা ইসলামের কথা। ৯ ডিসেম্বর সকালে কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মহিদুল ইসলামের মুখে আবারও শুনে এসেছি তার গুণপনার ফিরিস্তি।

৯ ডিসেম্বর বিকেলে রিশাদ আমাদের নিয়ে গেলেন জাহানারা ইসলামের বাড়িতে। প্রাচীরঘেরা বিশাল বাড়ি। চেনা-অচেনা বৃক্ষ-লতা-গুল্মে সাজানো, যেন প্রাচীনকালের কোনো অভিজাতের বাগানবাড়ি। ছায়ানিবিড় শান্ত-মৌন-স্নিগ্ধ নিবাস।

কলিংবেল বাজানোর পর জাহানারা ইসলাম নিজেই এসে গ্রিলের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন। আমাদেও যে ঘরটিতে বসালেন সেটি পেইন্ট করা বাঁশের বেড়ার এবং চাল টিনের। পরে আলাপে জেনেছিলাম তার শ্বশুর ছিলেন জমিদার– হতে পারে এই সুদৃশ্য সেমিপাকা টিনের ঘর তার কোনো খেয়ালী শখেরই ফলশ্রুতি। পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর আমি যখন তাকে আমাদের এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলাম তখন বাড়ির ভেতর থেকে বড় দুটি ট্রে ভর্তি বিভিন্ন রকমের মুখরোচক খাবার

নিয়ে এলো একজন পরিচারক। তিনি নিজ হাতে আমাদেও তা পরিবেশন করতে করতে জানালেন– এই সব খাবারই তৈরি করা হয়েছে সি-উইড দিয়ে। সি-উইডের পাকোড়াসহ ৫/৭ রকমের খাবার দেখে যেমন চমৎকৃত হলাম, খেয়ে তেমন মুগ্ধ হলাম।

বাংলাদেশে সি-উইডের একমাত্র উদ্যোক্তা এই লড়াকু নারী নামজাহানারা ইসলাম।

বয়স ৬২ বছর। স্বামী মরহুম আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী মারা গেছেন ১২ বছর আগে। ১ ছেলে, ২ মেয়ে। ছেলে মো. মাজহারুল আনোয়ার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রুরাল ডেভেলপমেন্টের ওপর পড়াশোনা করছেন। ২ মেয়ের বড় মেয়ে মাহমুদা ইসলাম তানজানিয়ায় লাফার্জ সুরমা সিমেন্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর। ছোট মেয়ে ফাহমিদা ইসলাম ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে ঢাকায় ব্যবসারত।

তার এই উদ্যোগের নাম জাহানারা হাবস।

এই উদ্যোগ থেকে তিনি সি-উইডকে খাদ্য, প্রসাধনী, ওষুধ, পশুখাদ্য, জৈব সার ও জ্বালানি এবং জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা ভেষজ উদ্ভিদের ওষুধ তৈরি করে বাজারজাত করেন। শুরু করেছেন ১৯৯০ সাল থেকে। প্রাথমিক অবস্থায় তার পুঁজি ছিল ২০০০ টাকা। পুরোটাই নিজস্ব পুঁজি। বর্তমানে তার পুঁজির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৫০ লাখ টাকায়।

সি-উইডের নানা ধরনের পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে তাকে ঋণ নিতে হয়েছে। ২০১২ সালে মার্কেন্টাইল ব্যাংক থেকে ৩০ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন।

জানতে চাইলাম উদ্যোগটি প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল কিনা, না থাকলে কতদিন পর থেকে লাভের মুখ দেখছেন। তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জানালেন প্রথম থেকেই তার এই উদ্যোগ লাভজনক ছিল। ১ বছরেই ২,০০০ টাকা বেড়ে পুঁজির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮,০০০ টাকায়। এখন পর্যন্ত যে হারে লাভ করতে পারছেন তাতে তিনি মোটামুটি সন্তুষ্ট।

জানতে চাইলাম– আপনি এ উদ্যোগে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন তা কি নিজস্ব, নাকি কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ গুণ অর্জন করেছেন? দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন এই উদ্যোগের সমস্ত ব্যবস্থাপনা একেবারেই নিজস্ব।

জানতে চাইলাম, প্রথম অবস্থায় কীভাবে তিনি এগুলো বাজারজাত করতেন? বললেন, **'একেবারে প্রথম অবস্থায় ফেসওয়াশ এবং স্কিন ক্লিনজার হিসেবে বাজারজাত করতাম।** পার্লারে রূপচর্চা বিশেষজ্ঞ এক চীনা মহিলার কাছ থেকে একবার কিছু টিপস নিয়েছিলাম। তো দেখলাম, সেখানে তারা একটা ফেসওয়াশ ব্যবহার করত যার অন্যতম উপাদান এই সি-উইড, যদিও ওরা তা স্বীকার করত না! কিন্তু আমি তো এগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম বলে জানতাম যে এগুলো সি-উইড! আমি নিজেই নিজের একটি ফর্মুলা থেকে সি-উইডের একটি সলিউশন তৈরি করে ফেসওয়াশ হিসেবে বাজারজাত করতে শুরু করলাম। শুধু ফেসওয়াশ নয়, একটি স্কিন ক্লিনজারও তৈরি করলাম এবং ফেসওয়াশের সঙ্গে বাজারজাত করতে থাকলাম।' এ পর্যায়ে জানতে চাইলাম– বাংলাদেশে আপনিই তো সর্বপ্রথম সি-উইড নিয়ে কাজ শুরু করেন, নাকি? গর্বের সঙ্গে জবাব দিলেন– 'আমার তো মনে হয় না এ দেশে আগে কেউ সি-উইড নিয়ে কাজ করেছে।' এরপর শো-কেসে সাজিয়ে রাখা একটি ছবি দেখিয়ে বললেন– এটি ১৯৮৩ সালের একটি ছবি। জাপানের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি এসেছিলেন। কক্সবাজারে এসে তিনি বাংলাদেশের সি-উইডের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন, তখন তার সাথে তোলা এই ছবিটি। এরপর প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললেন, একেবারে প্রথমে এই কক্সবাজারেই বাজারজাত করতাম। এক মেয়ে আমার সঙ্গে সি-উইড নিয়ে কাজ করত, সে আবার ঢাকার বেশ কয়েকটি পার্লারে বিউটি কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করত। কিছুদিন পর তার মাধ্যমে ঢাকার পার্লারগুলোতে বাজারজাত করতে শুরু করি।'

এখন কীভাবে বাজারজাত করছেন জানতে চাইলে বললেন, 'এখন আমরা খাদ্য, প্রসাধনী, ডেকোভরেশন, ওষুধ, পশুখাদ্য, জৈব সার (কৃষিতে ব্যবহার্য) ও জ্বালানি হিসেবে সি-উইড বাজারজাত করছি। **খাদ্যের ভেতরে আমাদের উদ্ভাবিত ডায়াবেটিস ডায়েটটি খুব প্রশংসিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে।** অনেকটা কুড়কুড়ি-মুড়মুড়ি বা চানাচুরের মতো। অনেক

স্মৃতিময় প্রেম

জাহানারা যেভাবে জড়িয়ে গেলেন সি-উইডে

শ্বশুরবাড়ি কক্সবাজারের মূল সৈকতের খুব কাছাকাছি হওয়ায় বিয়ের পর থেকে প্রায় রোজই সমুদ্রের পাড় ধরে হেঁটে বেড়াতেন। নস্টালজিয়ার রস আস্বাদন করতে করতে বলে যেতে থাকলেন তিনি: ১৯৮০ সালের কথা। তখন এই কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এখনকার মতো এতো নোংরা ছিল না পরিবেশ। লাল, সবুজ, সোনালি– নানা রঙের সি-উইড পাওয়া যেত এখানে। সমুদ্রের পাড়ে যখন বেড়াতে যেতেন তখন বেশির ভাগ সময়ই স্বামী সঙ্গে থাকতেন। বেলাভূমিতে ঝিনুক, প্রবাল কুড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে নানা ধরনের সি-উইডও কুড়িয়ে পেতেন এবং এগুলো দেখে মুগ্ধ হতেন। সেই মুগ্ধতা থেকে এক সময় এই সি-উইড সংগ্রহ করা তার এক নেশা হয়ে উঠল। ছোট্ট মেয়েদের ফুল কুড়ানোর মতোই দারুণ আনন্দ পেতেন তিনি সি-উইড সংগ্রহ করে। নিজের শিশুসন্তানদের নিয়ে সাগরতটে মেতে না থেকে এগুলো কুড়াতে দেখে তার স্বামী অনেক সময় কিছুটা বিরক্ত হতেন। একদিন তো বলেই ফেললেন– কী তুমি বাচ্চাদের রেখে অত নোংরা-ময়লা জিনিস হাতাচ্ছ! তিনি তখন সুদূরে দৃষ্টি মেলে বিজ্ঞের মতো বললেন– আমার কি মনে হয় জানো? কেন যেন আমার মনে হয় এই জলজ জিনিসগুলোই (তিনি তখন সি-উইড কী তা জানতেন না) একদিন বাংলাদেশকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবে। তার স্বামী ঠাট্টা করে বললেন, আচ্ছা! তাই নাকি? কীভাবে একটু বুঝিয়ে বলো তো! তিনি জবাবে বললেন– এই যেমন ধরো রেডিয়ামের মতো মহামূল্যবান কোনোকিছুও তো হয়ে উঠতে পারে এগুলো! তখন বাংলাদেশ অনেক ধনী হয়ে যাবে, দেখো। অনেকটা ঠাট্টার সঙ্গেই তার স্বামী বললেন– ওরে বাপস! তুমি তো তখন বিখ্যাত হয়ে যাবে! এসো এসো, তোমার একটি ছবি তুলে দিই। তেমনটা যদি হয়ই তা হলে এই যে তোমার একটা ছবি তুলে দিলাম এর জন্য হলেও আমার একটা পরিচয় থাকবে। এটুকু বলে জাহানারা শো কেস থেকে বাঁধানো সেই ছবিটি বের করে শাড়ির আঁচল দিয়ে খুব যত্ন করে মুছে আমাদের দেখালেন। আমি আড়চোখে দেখতে পেলাম তার চোখের দুই কোনা ঝাপসা হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারলাম এক যুগ আগে প্রয়াত স্বামীর স্মৃতি তাকে তখন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে নস্টালজিয়ার পথ ধরে। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তো স্বামীর এই ঠাট্টার কারণেই আমার ভেতরে এক তেজী জেদ জেগে উঠেছিল। এই সি-উইডের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উঠেপড়ে লাগলাম। এগুলোর ওপর পড়াশোনা করতে শুরু করলাম। বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে জানতে পারলাম এগুলোকে সি-উইড বলা হয়। আরো জানতে পারি দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এই সাগরশৈবালের। তখন থেকেই আমার ভেতরে ধীরে ধীরে আস্থা তৈরি হয় যে, স্বামীর এই ঠাট্টার জবাব ভালোভাবেই দিতে পারব। নিজের ভেতর গড়ে ওঠা এই আস্থার ওপর ভরসা রেখেই আমি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

স্বামীর তোলা জাহানারার সেই ছবি

ঢাকার পাঁচতারকা হোটেল র‍্যাডিসন, কক্সবাজারের অভিজাত হোটেল ব্লু মেরিন, হোটেল প্রিন্স ও মেরিডিয়ান হোটেলে সরবরাহ করেছি এবং এখনো কয়েকটিতে করছি। সি-উইড থেকে ১১টি প্রসাধনসামগ্রী বাজারজাত করছি। সি-উইড নিয়ে আমি বরাবরই আশাবাদী। সমুদ্রবিজয়ের পর আমার এই প্রত্যাশা আরো অনেক বেড়ে গেছে।

বাড়িতেই ডায়বেটিস রোগীদের জন্য রুটি বানানোকে ঝামেলার কাজ মনে করা হয়; তাদের কথা মাথায় রেখেই আমরা এটি বাজারজাত করছি। খাদ্যের ভেতরে এটি ছাড়াও পিৎজা, সমুসা, পাকোড়া, স্যুপ, সালাদ, ডেজার্ট, কেক, বান, শিঙ্গাড়া, শাক ইত্যাদিতে সি-উইড ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া মসলার মতোও এটি বাজারজাত করছি। অনেকটা হলুদ, মরিচ, ধনিয়ার গুঁড়ো যেমন সব রান্নাঘরেই রাখা হয়, তেমনই হচ্ছে ব্যাপারটা। যেমন কচু শাক রান্না করছেন, এর ভেতরে এক চিমটি সি-উইড ছেড়ে দিন, দেখবেন স্বাদ কত বেড়ে গেছে, আর পুষ্টিগুণ যে বাড়বে অনেক তা তো বলাই বাহুল্য! রান্নার সময় মুলা শাকে একটু সি-উইড দিলে রান্নার পর মুলো শাক যে একটু শক্ত হয়ে যায়, তেমনটি আর হবে না। এতে মুলো শাক যেমন নরম হবে, তেমনি স্বাদ ও পুষ্টিগুণও অনেক বেড়ে যাবে। প্রথম প্রথম যখন সি-উইড নিয়ে কাজ করতাম তখন আমেরিকা থেকে অনেক ক্যান্সার আক্রান্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব দেশে এসে আমাদের কাছ থেকে সি-উইড নিতো। আমেরিকার ডাক্তররা তাদের সি-উইড খাওয়ার পরামর্শ দিতেন এবং তারা খোঁজ-খবর নিয়ে যখন জানতে পারতেন বাংলাদেশের সি-উইড মানের দিক দিয়ে এক নম্বর তখন তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। ডেকোরেশনের উপাদান হিসেবেও এটি বাজারজাত করছি। সারগাছাম (পাতার মতো দেখতে) নামের এক ধরনের সি-উইড বাজারজাত করছি আমরা, ঘরের পুরো দেয়াল এটি দিয়ে ডেকোরেট করলে সৌন্দর্য বেড়ে যায় বহুগুণে। ঢাকার পাঁচতারকা হোটেল র‍্যাডিসন, কক্সবাজারের অভিজাত হোটেল ব্লু মেরিন, হোটেল প্রিন্স, ও

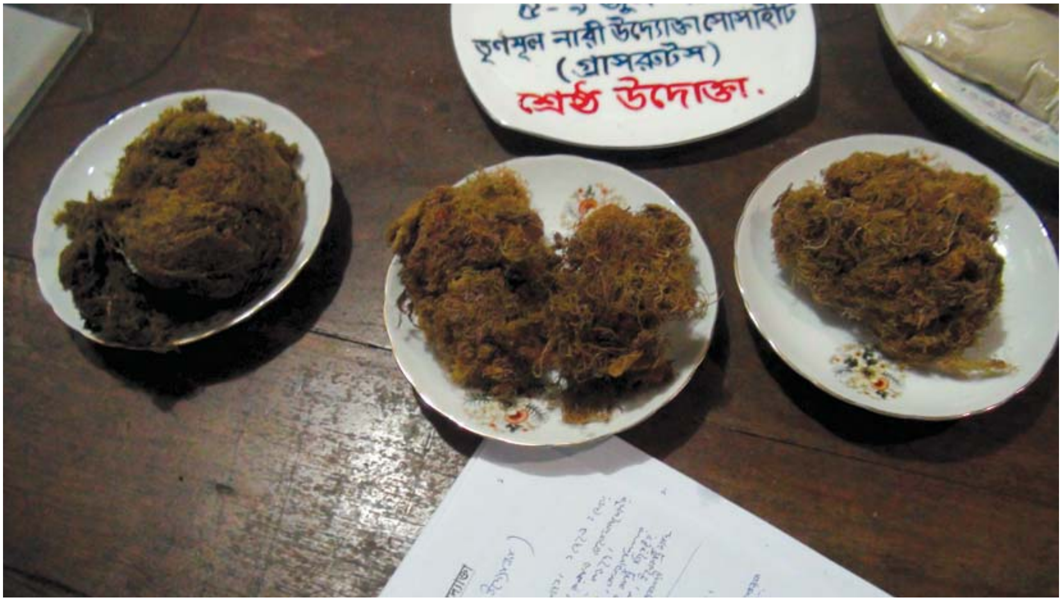

সি-উইড নিয়ে জাহানারার যত নিষ্ঠা, যত শ্রম

'সি-উইডের প্রেক্ষিতে বলতে গেলে বলতে হয়, এ পর্যন্ত উঠে আসতে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আমি একজন কমার্স গ্রাজুয়েট। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি ডিপ্লোমা করেছি। আগেই বলেছি সেই ১৯৮০ সাল থেকেই শখের বশে নানা রঙের নানা ধরনের সি-উইড সংগ্রহ করতে থাকি। এরপর এ ব্যাপারে ব্যাপক পড়াশোনা করার পর পেয়ে যাই সাগরতলে গুপ্তধনের সন্ধান! সেই রোমাঞ্চ থেকেই এটি নিয়ে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করতে থাকি প্রচণ্ডভাবে। স্বামী আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন জমিদার বংশের সন্তান। তিনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। জমিদারি এস্টেট দেখাশোনা করতেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও ছিলেন পাঁচ মেয়াদে। ছোটবেলা থেকেই নিজে কিছু একটা করার, নিজের একটা আলাদা জগৎ তৈরির বাসনা লালন করে এসেছি মনের ভেতর। জমিদার বাড়ির বউ হওয়ার কারণে অন্য সবার চেয়ে আমাকে বেশি সংগ্রাম করতে হয়েছে। নিজের ইচ্ছে পূরণ করতে হয়েছে লুকিয়ে লুকিয়ে। স্বামী হয়তো মনে করতে পারেন যে, তার আয়ে আমি সন্তুষ্ট নই বলে এসব করছি, তাই তাকে এসব জানতে দিতাম না। সবার অজান্তে এমনকি আমি চাও বিক্রি করেছি! অ্যালান বোম্বার্ডেও মতন আরকি– যিনি আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার জন্য কত কি-ই না করেছিলেন! মুরগির খামারও করেছি।

স্কলারশিপ পেয়ে হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোল্ট্রি প্রোসেসিংয়ের ওপর ডিপ্লোমা করতে গিয়েছিলাম। ডেইরির ওপরেও ডিপ্লোমা করার সুযোগ পেয়েছিলাম নিউজিল্যান্ডে, কিন্তু যেতে পারিনি। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমি দেশি-বিদেশি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর ডিপ্লোমা করার সুযোগ পেলেও আমার সবচেয়ে আগ্রহের বিষয় সি-উইডের ওপর কোনো ডিপ্লোমা করার সুযোগ পাইনি। যাই হোক, শুরুতে মুরগির খামার করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সুবিধা করতে পারিনি। আমার অজ্ঞতার কারণে মুরগির খামারে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া ব্যবহার করায় খালি পায়ে খামারের ভেতরে গিয়ে গিয়ে পায়ে ঘা হয়ে গিয়েছিল। স্বামী যাতে বুঝতে না পারেন সেজন্য রাতে পায়ে মোজা পরে শুতাম। তিনি যে বাধা দিতেন তা কিন্তু নয়, বরং অনেক ব্যাপারেই তার কাছে থেকে খুব অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তো মুরগির খামার করতে গিয়ে কিন্তু আমাকে লোকসান দিতে হয়েছে! যদিও এ ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদক পেয়েছি। এরপর আমার ভালো-লাগার বিষয়– অর্থাৎ সি-উইড নিয়ে কাজ করতে শুরু করি পুরো মাত্রায়।

মেরিডিয়ান হোটেলে সরবরাহ করেছি এবং এখনো কয়েকটিতে করছি। সি-উইড থেকে ১১টি প্রসাধনসামগ্রী বাজারজাত করছি। সি-উইড নিয়ে আমি বরাবরই আশাবাদী। সমুদ্রবিজয়ের পর আমার এই প্রত্যাশা আরো অনেক বেড়ে গেছে।'

বাজার সম্প্রসারণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'সি-উইডের ওপর একটি সেমিনার করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশের সব রান্নাঘরে সি-উইডের অবাধ বিচরণের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি। এটাকে যদি যে কোনো রান্নার টেস্ট মেকার হিসেবে ব্যবহার করা যায় (আসলেই এটি সব রান্নায় পুষ্টিগত ও স্বাদগতভাবে নতুন মাত্রা যোগ করে) তা হলে এর গ্রহণযোগ্যতা যেমন অনেক বেড়ে যাবে,

তেমনি এর ভোক্তার সংখ্যাও খুব বেড়ে যাবে। আমাদের দেশের রন্ধন বিশেষজ্ঞরা যেভাবে ক্যাপসিকাম, বেলপেপার, পাপরিকা, পার্সলে ইত্যাদি বিদেশি রন্ধন উপকরণের নাম উচ্চারণ করে গৃহিণীদের পয়সা খসাচ্ছেন, দেশের পুষ্টিবিদরা কিন্তু সি-উইডের পুষ্টিমান অনেক উঁচু হওয়া সত্ত্বেও এর মাহাত্ম্য মানুষের সামনে সেভাবে তুলে ধরছেন না। সামুদ্রিক খাবারের প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের নাক সিটকানির একটা প্রবণতা আছে, এটি দূর করতে হবে। প্রচার নেই বলে দেশের কেউ জানেই না কী সম্পদ তারা হাতছাড়া করছে নেহাতই অজ্ঞতার কারণে। সুতরাং সি-উইডের যথাযথ প্রচার খুবই জরুরি। আর চেষ্টা করছি সি-উইড কালচার করার ক্ষেত্রে আরো দক্ষতা অর্জনের। সি-উইড কালচারে যদি যুগোপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে পারি, অর্থাৎ সময়ের চাহিদা মেটাবার কৃৎ-কৌশল আয়ত্ত করতে পারি তা হলে তা আমাদের বাজার সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করি আমি।

জিজ্ঞেস করলাম– আপনার পণ্যের চাহিদা কেমন? জানালেন, 'আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ তো জানেই না এখনো সি-উইড সম্পর্কে! খুবই সীমিত আমাদের বাজার। তবুও যেসব ভোক্তার কাছে এই পণ্য নিয়ে পৌঁছতে পেরেছি সেসব ভোক্তার কাছে চাহিদা বেশ ভালো। খুব উৎসাহ জাগানো।'

স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা জানতে চাইলে বললেন, 'এখনো সেভাবে পারছি না। তবে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি। পারব বলে আমি দারুণভাবে আশাবাদী।'

জানতে চাইলাম– এ ধরনের উদ্যোগ আপনি কেন গ্রহণ করলেন? বললেন, 'প্রথমে ছিল সি-উইড সংগ্রহের শখ; তারপর স্বামী তা নিয়ে ঠাট্টা করলে চেপে গেল জেদ। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম এর গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করে ছারব। সেই থেকে পড়াশোনা; তারপর এর বিপুল সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে এ উদ্যোগ নিয়েছি।'

প্রথম প্রথম শুধু ডেকোরেশনে সি-উইড ব্যবহার করতাম। এ ব্যাপারে আমি কোনো প্রশিক্ষণের সুযোগ না পেলেও তা পুষিয়ে নিয়েছি বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করে। সে বিদ্যে থেকেই ২০০৩ সাল থেকে সি-উইড কালচার শুরু করি। পুঁথিগত বিদ্যের সঙ্গে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা মিশে মিশে দিনদিন আমি এ ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠি। কালচারের ব্যাপারটায় আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিমত আছে। উন্নত মানের এক কেজি সি-উইড পরিষ্কার করতে এখানে ৩৭০০ থেকে ৪০০০ টাকা খরচ পড়ে। অনেকে জাল ফেলে সি-উইড চাষের মাধ্যমে এ খরচ কমাতে চাইছেন। কিন্তু জালেও তো অনেক খরচ পড়ে যাবে! থাইল্যান্ডে বক্স বসিয়ে সি-উইড চাষ করা হয়। আমরা কিন্তু আরো সহজে এটি করতে পারি। আমাদের সমুদ্র সীমার অনেক নৌকা, টাগবাট, কার্গোবোট নাগাড়ে

আগে আমাদের দেশের মানুষ সি-উইডকে জঞ্জাল মনে করত। চোরাকারবারিরা সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তা মিয়ানমারে পাচার করত। মিয়ানমার কিন্তু অনেক আগে থেকেই এটির সফল ব্যবসা করে আসছে। এখন তারা সি-উইডের অনেক পণ্য রফতানিও করছে। অথচ আমাদের সি-উইড মানের দিক দিয়ে বিশ্বসেরা হওয়া সত্ত্বেও আমরা এর ফায়দা নিতে পারছি না।

১৫-২০ দিন করে চলে। আমরা যদি এগুলোতে একটা করে বাঁশ বেঁধে দিই তা হলে সেখানে যে সি-উইড জন্মাবে তা হবে অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এটাকে জলবাদামের সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। ছোটবেলায় নৌকায় করে নানিবাড়ি যাওয়ার সময় যখন স্রোতের অনুকূলে যেতাম তখন দড়ি বেঁধে একটি বাঁশ ফেলে দেয়া হতো পানিতে, এতে নৌকার গতি যেত বেড়ে। পানিতে ফেলা এই বাঁশটিকে বলা হতো জলবাদাম। তো এভাবে নৌকায় বাঁশ বেঁধে রেখে সি-উইড সংগ্রহ করা গেলে তাতে কালচারে খরচ পড়বে অনেক কম। কেজিতে যেখানে ৪০০০ টাকা খরচ হয় সেখানে তা ৮০০/৯০০ টাকায় কমিয়ে আনা যাবে। আগে আমাদের দেশের মানুষ সি-উইডকে জঞ্জাল মনে করত। চোরাকারবারিরা সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তা মিয়ানমারে পাচার করত। মিয়ানমার কিন্তু অনেক আগে থেকেই এটির সফল ব্যবসা করে আসছে। এখন তারা সি-উইডের অনেক পণ্য রফতানিও করছে। অথচ আমাদের সি-উইড মানের দিক দিয়ে বিশ্বসেরা হওয়া সত্ত্বেও আমরা এর ফায়দা নিতে পারছি না।'

জিজ্ঞেস করলাম, এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা কী কী? একটু ভেবে বললেন, "অজ্ঞতা, আইনি জটিলতা এবং প্রশাসনের অসহযোগিতাই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। একবার তো কোস্টগার্ড আমার সি-উইড বোঝাই একটি নৌকা আটক করে পরিবেশ রক্ষার ধুয়া তুলে থানায় মামলা করে আমাকে থানায় যেতে বলে বসল! পরিবেশ অধিদফতরেও মামলা করার হুমকি দিল। ভাগ্যিস পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র ছিল এবং আমার এক ভাই তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিল। ওরা আগে থেকেই আমার সি-উইডের ব্যাপারটা জানত। এসবকে ঠাট্টা করে বলত, 'আপা, ম্যাচবাতি দিয়ে গাড়ি চালাবেন কবে?' তো সেই ভাইয়ের কল্যাণে আমি সে যাত্রা উদ্ধার পাই। কিন্তু অনেক সময়ের অপচয় হয় এতে। জীবনে আমি অনেক পয়সা নষ্ট করেছি, কিন্তু সময় নষ্ট করিনি। তবে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা মানুষের অজ্ঞতা।"

এরপর আপনি কীভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে পেরেছেন জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'আমি দৃঢ় মনোবলে লেগে থেকে এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে পেরেছি। **আমি যতোটা এগিয়ে যেতে পেরেছি, জাপানের মতো উন্নত দেশও সি-উইড নিয়ে ততটা এগিয়ে যেতে পারেনি।'**

নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার জন্য তার পরামর্শ কী হবে জানতে চাইলে বললেন, 'নতুনদের প্রতি আমার বিশেষ পরামর্শ থাকবে আমাকে অনুসরণ করার। তার মানে আমি বোঝাতে চাইছি, নানাদিক সামলে আমি যে পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছি তারা যদি সেখান থেকে শুরু করেন তবে সফল হতে পারবেন।'

তার এই উদ্যোগে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ম্যানুয়াল। তবে সি-উইড গুঁড়ো করার জন্য গ্রাইন্ডিং ও টোস্টিং মেশিন ব্যবহার করছেন। গুণগত মান রক্ষার স্বার্থে এখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের সুযোগ কম।

জনবল সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন, 'আমার মোট জনবল ১৫০ জন। **১০০ জন বিধবাকে আমি আমার এখানে কাজ দিয়েছি। এদের ভেতর ১০ জন দক্ষ।'**

তার হিসেব পদ্ধতি সেকেলে। নিজেই খাতায় লিখে হিসেব সংরক্ষণ করেন।

এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা কতটুকু জানতে চাইলে বললেন, বাংলাদেশে এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সরকারকে অবশ্যই সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

পাট দিয়ে সাইকেল তৈরি করেছেন আবু নোমান সৈকত

পাটের সাইকেল!! রিশাদ বলতেই ওর মুখের দিকে তাকালাম। তাকিয়েই থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ। ঠিক ঐ মুহূর্তে আয়নায় তাকালে নিজের দুটি ভুরুতেই স্পষ্ট জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেখতে পেতাম।

এর আগে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বাংলাদেশের এক গুণী বিজ্ঞানী ড. মুবারক আহমাদ খানের কিছু আবিষ্কার নিজের চোখে দেখার। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার সময়ই খুব আগ্রহের সঙ্গে ভাবছিলেন পাট দিয়ে এমন কী তৈরি করা যায়, যাতে পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তিনি অবিরাম ভেবে যাচ্ছিলেন পাট দিয়ে এমন কিছু তৈরি করা যায় কিনা, যা বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষ ব্যবহার করে। বেশ কয়েকটা জিনিস তার মাথায় ঘুরেফিরে বারবার আসছিল। তেমনি কয়েকটি জিনিস থেকে সবদিক বিবেচনা করে বেছে নিলেন ঢেউটিনকে। অর্থাৎ মনে মনে তিনি ঠিক করে ফেললেন পাট দিয়ে ঢেউটিন তৈরি করবেন। তো এই ভাবনা থেকেই এক সময় তিনি একটি ফর্মুলা আবিষ্কার করে ফেললেন। আবিষ্কারের সে কী আনন্দ সেদিন তার! পরদিনই তিনি যে অধ্যাপকের অধীনে পিএইচডি করছিলেন তাকে জানালেন। তিনি তাকে খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'করে ফেলো। আমি চেষ্টা করব তোমার আবিষ্কৃত এই জিনিস নাসার মহাকাশযানে ব্যবহার করানো যায় কিনা।' খুব লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু মুবারক সতর্ক হয়ে গেলেন। শোনা কথা এবং নিজের কিছু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন এভাবে অধ্যাপকগণ তাদের শিক্ষার্থীদের আবিষ্কার নিজের নামে প্যাটেন্ট করে নিয়েছেন– এমন অনেক উদাহরণ আছে। তাই পড়াশোনার পাট শেষ করার আগ পর্যন্ত ওই দেশে তিনি যতদিন ছিলেন এ ব্যাপারে আর টুঁ শব্দটিও করেননি।

এরপর দেশে ফিরে আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়ার পর এ ব্যাপারে তিনি নিবিড় গবেষণা শুরু করেন এবং এক সময় পাট দিয়ে ঢেউটিন তৈরি করতে সক্ষম হন। তারপর পাট দিয়ে তিনি চেয়ার, টয়লেট স্লাব, কমোড, হেলমেট ইত্যাদিও তৈরি করে ফেলেন। তার এই আবিষ্কার দেখে আমি মুগ্ধ তো বটেই, বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু পাট দিয়ে সাইকেল? কস্মিনকালে তো শুনিইনি, ভাবনাতেও আসেনি এমন উদ্ভট ব্যাপার। তাই রিশাতের মুখে যখন শুনলাম ঢাকা মহানগরীর মোহাম্মদপুরে আবু নোমান সৈকত নামে এক তরুণ পাট দিয়ে সাইকেল তৈরি করেছেন– গিয়ে দেখে আসার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকলাম। অবশেষে

পাটের সাইকেলের পাশাপাশি একটি সাইকেল তৈরি করেছেন বাঁশ ও বেত দিয়ে। দূরপাল্লার ভ্রমণের জন্য লম্বা একটি সাইকেল তৈরি করেছেন, যেটিতে দুইটি সিট দুজন চালকের বসার জন্য– দুজনেই প্যাডাল ঘুরিয়ে সাইকেলের গতি বাড়াতে পারবেন এবং এতে প্রতিজনের প্যাডাল ঘোরানোর শ্রম অনেক কমে আসবে। জানালেন– তার সব সাইকেলই বাংলাদেশের পরিবেশ-উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে

সুযোগটা এলো ১৭ জানুয়ারি (২০১৭)। এদিন সকাল সাড়ে ৯টায় আমরা গেলাম মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডে। এখানে একটি বহুতল ভবনের নিচতলায় নোমানের সাইকেলের সার্ভিস সেন্টার ও শো-রুম। গিয়েছিলাম পাটের সাইকেলের কথা শুনে। গিয়ে আরো যা যা দেখলাম তাতে এই তুখোড় উদ্ভাবক তরুণ উদ্যোক্তার গুণপনায় রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পাট দিয়ে তৈরি সাইকেল অবশ্য এখানে ছিল না, ছিল তিনি যে জায়গাটিকে ওয়ার্কশপ হিসেবে কাজে লাগান সেখানে। পরে সেখানে গিয়ে সেটি দেখে এসেছিলাম। কিন্তু তার এই শো-রুমটিতে যা দেখলাম তাতেই আমার চক্ষু-চরকগাছ হওয়ার জোগাড়! একটি সাইকেল তৈরি করেছেন বাঁশ ও বেত দিয়ে। দূরপাল্লার ভ্রমণের জন্য লম্বা একটি সাইকেল তৈরি করেছেন, যেটিতে দুইটি সিট দুজন চালকের বসার জন্য– দুজনেই প্যাডাল ঘুরিয়ে সাইকেলের গতি বাড়াতে পারবেন এবং এতে প্রতিজনের প্যাডাল ঘোরানোর শ্রম অনেক কমে আসবে। জানালেন– তার সব সাইকেলই বাংলাদেশের পরিবেশ-উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ অনেক আগে থেকেই সাইকেল চালাতো। ৫০/৬০ বছর আগে বিয়ের বরেরা শ্বশুরবাড়িতে সাইকেলের জন্য বায়না ধরতো। যন্ত্রচালিত যানবাহনের সহজলভ্যতার কারণে পরবর্তীকালে সাইকেল ব্যবহারে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। যন্ত্রচালিত যানবাহনের ধোঁয়া পরিবেশ দূষণ করে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে দুর্বিষহ করে তুলছে বলে বিশ্বজুড়েই পরিবেশবান্ধব যান প্রচলনের তাগিদ বাড়তে থাকে। ইউরোপ-আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতেও এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে পরিবেশ-সচেতন তরুণ প্রজন্মের মাঝে। সেই ঢেউ এসে লাগে বাংলাদেশেও। দেশের তরুণদের মাঝেও ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকল বাইসাইকেল। ঢাকাসহ শহরাঞ্চলে অনেক সাইকেলক্লাব, রাইডিংক্লাব গড়ে উঠল। এরই এক দারুণ গর্বের পরিণাম হিসেবে ২০১৬ সালের বিজয় দিবসে দেশের দামাল সাইক্লিস্ট তরুণেরা ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ সাইকেল র‍্যালি করে গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে বাংলাদেশকে বসিয়েছে মহামর্যাদার আসনে।

এ তো গেল ব্যবহারকারীদের কথা, নতুন এই সাইকেল জোয়ারে প্রস্তুতকারীরাও এগিয়ে এলেন– দেশেই প্রস্তুত হতে থাকল বাইসাইকেল। ইউরোপ-আমেরিকায় রফতানিও হতে থাকল। বাংলাদেশ থেকে সাইকেল রফতানি দিনদিনই বাড়ছে। বর্তমানে মাসে ৮০ থেকে ৮৫ কোটি টাকার সাইকেল রফতানি হচ্ছে। কিন্তু তারপরও দেশের মোট বিক্রীত সাইকেলের ৬০ শতাংশই আমদানি করতে হয়। এর অন্যতম কারণ, বাংলাদেশের সাইকেল প্রস্তুতকারীরা মূলত ইউরোপে রফতানির উদ্দেশ্যে সাইকেল প্রস্তুত করে বলে এসব সাইকেলের দাম পড়ে বেশি। অন্যদিকে চীন, ভারত, থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করা সাইকেল অনেক কম দামে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, বাংলাদেশে সাইকেল কারখানা গড়ে তোলা এখন বেশ লাভজনক এবং এর বাজার চাহিদা ক্রমবর্ধমান। তাই উৎসাহী উদ্যোক্তারা এমন উদ্যোগ নিতেই পারেন। এতে দেশের অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিও আরো পোক্ত হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশে সাইকেল প্রস্তুত হয়, আবার বিদেশ থেকেও সাইকেল আমদানি হয়। বাংলাদেশে যেসব সাইকেল প্রস্তুত হয় সেগুলো ইউরোপের অধিবাসীদের উপযোগী করে তৈরি করা হয় কিন্তু যেসব সাইকেল আমদানি করা হয় সেগুলো বাংলাদেশের মানুষের উপযোগী করে তৈরি করা নয়। একজন সাইকেল চালক হিসেবে ব্যাপারটা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন এবং সেই অনুপ্রেরণা জাগানিয়া নিজস্ব চমৎকার পর্যবেক্ষণ থেকেই আবু নোমান সৈকত সাইকেল তৈরি শুরু করেছেন। তবে তা এখনো বড় পরিসরে নয়। আপাতত তিনি উৎসাহী ক্রেতাদের অর্ডারমাফিক সাইকেল তৈরি করে থাকেন। এ ছাড়া তিনি নিজের পছন্দমতো সাইকেলও তৈরি করেন। অনলাইনে সেগুলোর ছবি পোস্ট করে মূল্য আর বিক্রির অন্যান্য শর্ত জানিয়ে দেন এবং ক্রেতারা তা দেখে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে সাইকেল কিনে থাকে।

আমাদের দেখে চা-শিঙ্গাড়া আনিয়েছিলেন নোমান। কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে চা-শিঙ্গাড়া খেতে খেতে তার সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করলাম।

তার পুরো নাম আবু নোমান সৈকত। বয়স ৩৩ বছর। বাবা– মো. মাহবুবুল আলম (অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা); মা– মাহীয়ারা হাসনীন, ২ ভাই, ১ বোন তিনি বড়, তার ছোট ভাই– তানভির অয়ন, স্থাপত্যবিদ্যায় শেষবর্ষে পড়ছেন; বোন সঞ্জিদা সারমিন– এবার এসএসসি দিচ্ছে); নোমান বিবাহিত; তার স্ত্রী শারমিন আক্তার অর্থনীতিতে স্নাতোকোত্তর।

তার এই উদ্যোগের নাম 'সাইকেল জংশন'। সাইকেল মেরামত, তৈরি ও বিক্রি করেন। শুরু করেছেন ২০১৪ সালে। যখন শুরু করেন তখন তার প্রাথমিক পুঁজি ছিল ৬ লাখ টাকা। এর ভেতর নিজস্ব পুঁজি ছিল ৩ লাখ টাকা। বাকিটা ঋণ নিয়েছিলেন আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে। তার বর্তমান পুঁজি ২৫ লাখ টাকারও বেশি। উদ্যোগটি প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল কিনা, না থাকলে কতদিন পর থেকে লাভের মুখ দেখছেন– আমার এই জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বেশ গর্বের সঙ্গে জবাব দিলেন– প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল। প্রথম অবস্থায় বার্ষিক লাভের হার ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ। জানতে চাইলাম এখন পর্যন্ত লাভের ক্ষেত্রে যতটুকু প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট কিনা। সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন– 'হ্যাঁ, সন্তুষ্ট; তবে আমি মনে করি লাভের এ মাত্রা আরো বাড়ানো সম্ভব ছিল।'

জিজ্ঞেস করলাম, তিনি এ উদ্যোগে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন তা কি নিজস্ব, নাকি কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ গুণ অর্জন করেছেন? উত্তরে বললেন– এ উদ্যোগের সার্বিক ব্যবস্থাপনা একেবারেই তার নিজস্ব।

তার আস্থার জায়গাটা বড় জানতে ইচ্ছে করল। তাই জিজ্ঞেস করলাম কোন ভরসায় তিনি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। বললেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম এই সাইকেল তৈরির মাধ্যমে দেশকে পরিবেশবান্ধব যান উপহার দিতে সক্ষম হবো। লাভ-লোকসানের বিশ্লেষণ করেও তা ইতিবাচক দেখতে পেলাম। এতে আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল। আর সেই আত্মবিশ্বাসের ভরসাতেই আমি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম।'

জানতে চাইলাম প্রথম অবস্থায় কীভাবে বাজারজাত করতেন। জবাবে বললেন, 'অনেকটা জেদের বশেই সাইকেল মেরামত ও সেবাকেন্দ্র খুলেছিলাম। সাইকেলের প্রতি ভালবাসা থেকে এক সময় নিজেই তৈরি করে ফেলি কয়েকটি সাইকেল। অনেকেই সাইকেল মেরামত করতে এসে আমার হাতে তৈরি সেসব সাইকেল দেখে মুগ্ধ হন এবং তাদের কেউ কেউ আরেকটু আগ বাড়িয়ে কিনেও নিতেন আমার সেসব সাইকেল। প্রথম অবস্থায় এভাবেই আমি সাইকেল বাজারজাত করতাম।'

এখন কীভাবে বাজারজাত করছেন জানতে চাইলে বললেন, 'এখন আমি আমার তৈরি করা সাইকেলের ছবি, কী দিয়ে তৈরি করেছি, এর বিশেষ বিশেষ তথ্য ইত্যাদি উপস্থাপন করে অনলাইনে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পছন্দ হলে তারা এসে কিনে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় বিদেশ থেকেও অনেকে আমার সাইকেল কেনে। এরই ভেতর শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, স্পেন থেকে ক্রেতারা আমার সাইকেল কিনে নিয়েছেন।'

জানতে চাইলাম, বাজার সম্প্রসারণের জন্য তিনি কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন। জানালেন, 'আসলে বাজার সম্প্রসারণের জন্য আমি এখনো কোনো উদ্যোগ নিচ্ছি না, কারণ আমি কারখানায় সাইকেল তৈরি করি না, হাতে তৈরি করি। তবে পর্যটকদের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কক্সবাজারে একটি আউটলেট খোলার চেষ্টা করছি।'

বাজারে তার পণ্যের চাহিদা কেমন জানতে চাইলে বললেন, 'সারাবিশ্বেই রাইডার্স, অর্থাৎ সাইকেল চালিয়েদের মাঝে হ্যান্ডমেড সাইকেলের খুব কদর। আর সে কারণেই আমার সাইকেলের চাহিদা বেশ ভালো। পাটের সাইকেল যদি ঠিকমতো বাজারজাত করতে পারি তা হলে আমার সাইকেলের চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা জানতে চাইলে বললেন, 'কিছুটা বোধ হয় পারছি। নিয়মিত নেট ঘাঁটাঘাঁটি করি বলে সাইকেল রাইডারদের হালের খবরাখবরও মোটামুটি জানা হয়ে যায়। তাই বর্তমান সাইকেল-বিশ্বের চাহিদা পূরণ করেই সাইকেল তৈরির চেষ্টা করে থাকি। নেটে সেসব সাইকেলের ছবি দেখে শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, স্পেনের নাগরিকও আমার সাইকেল কিনেছে।'

একজন প্রকৌশলী হিসেবে তার চাকরিতে উন্নতি করার সুযোগ ছিল, তা সত্ত্বেও এ ধরনের উদ্যোগ তিনি কেন

গ্রহণ করলেন জানতে চাইলে বললেন, 'ঢাকা পলেটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করার পর বছরখানেক চাকরিও করেছিলাম। তখন দেখেছি উপরের নির্দেশেই দুই নম্বরি করতে হয়। বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলাম চাকরিতে। তা ছাড়া ছোটবেলা থেকেই মনের গহিনে একটি সাধ লালন করে এসেছি যে প্রথাগত কোনো পেশায় যাব না। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে পরিবেশবান্ধব কোনো উদ্যোগ ছিল অবশ্যই আমার পছন্দের তালিকায় পয়লা নম্বরে। তাই নিজের ইচ্ছেপূরণের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং লাভজনক কিছু করার সুযোগটা তৈরি করে নেয়ার দৃঢ় ইচ্ছে থেকেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

চট করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ধরনের উদ্যোগের ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল মনে করেন তিনি? জবাবে বললেন, 'যতই দিন যাচ্ছে বিশ্বের সব দেশের মানুষ ততই পরিবেশ-সচেতন হয়ে উঠছে। বর্তমানে মানব-আচরণে সে লক্ষণ বেশ স্পষ্ট; ভবিষ্যতে এ প্রবণতা যে আরো বাড়বে তা অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর সে বিবেচনায় এ উদ্যোগের ভবিষ্যত বেশ উজ্জ্বল।'

এ পর্যন্ত উঠে আসতে তাকে কী কী করতে হয়েছে জানতে চাইলে বললেন, "ছোটবেলা থেকেই সাইকেল চালাতাম। বাবার চাকরিসূত্রে দিনাজপুর থেকে ঢাকা আসার পর ২০০২ সাল থেকে ঢাকা মহানগরীতেও সাইকেল দাবড়ে বেড়াতাম। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে এসএসসি পাস করার পর ঢাকায় এসে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করি। এরপর আমার বাবা আমাকে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি করে দেন। সেখান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করি। আমার মোটেও ইচ্ছে ছিল না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার, পরিবারের চাপেই পড়তে হয়েছিল। আমার আর্কিটেকচার বা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে ছিল। তো ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে পাস করার পর বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ার কথা উঠলে বাবাকে বললাম আমি আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব না। বাবা বললেন– তা কী করে হয়? এখন অন্য বিষয়ে গেলে খুব অসুবিধায় পড়ে যাবে। অগত্যা মেনে নিলাম বাবার প্রস্তাব এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হলাম। তারপর অনিচ্ছায় পড়লে যা হয়– কিছুতেই মন বসাতে পারলাম না পড়াশোনায়। ছোটবেলার বাসনাটা চাগিয়ে উঠল মনে– অপ্রচলিত কিছু একটা করতে হবে। ২০১১ সালে আমি যখন এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একজন ছাত্র, তখন আমাদের বাসার নিচ থেকে আমার সাইকেলটা হারিয়ে যায়। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। স্কুল থেকেই চালাতাম সাইকেলটা, দিনাজপুর থেকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলাম। এরপর আরেকটি সাইকেল কিনি। এখন ছেলেরা যে ধরনের সাইকেল চালায়, তেমনি আধুনিক গড়নের সাইকেল। তো সেই সাইকেলটা আমি একটি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাই। খুব নাম-করা সার্ভিস সেন্টার। দেশের ১ নম্বর সাইকেল সার্ভিস সেন্টার হিসেবে গণ্য করা হয় এটিকে। এটির নাম বলতে চাচ্ছি না আমি। কিন্তু সেখানে আমার সঙ্গে এবং আমার বাইসাকেলের সঙ্গে খুব একটা ভালো আচরণ করা হয়নি। নাক সিটকে বলা হয়েছে– 'কী একটা সাইকেল নিয়ে এসেছে!' এই ধরনের আরো অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিল তারা সেদিন। মনে খুব আঘাত পেয়েছিলাম। এই ধরনের পরিবেশবান্ধব একটি বাহনকে নিয়ে এমন ঠাট্টা-মশকরা ভেতরে ভেতরে আমাকে ভীষণ রাগিয়ে দিচ্ছিল; কিন্তু মুখে কিছুই বললাম না। মনে মনে ভাবলাম– এত পরিবেশবান্ধব একটি বাহন– ঢাকাবাসী চালাচ্ছে– অথচ তারা সেভাবে এগুলোর সার্ভিসিং সুবিধা পাচ্ছে না। সার্ভিসিং সেন্টারগুলো নিরুপায় সাইকেলচালকদের কাছ থেকে দেদার টাকা নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে-অনুযায়ী সেবা দিচ্ছে না। বাহনটি পরিবেশের জন্য ভালো, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, সুতরাং যারা সাইকেল চালায় তারা আরো ভালো সেবা পাওয়ার দাবি রাখেন। তো সে ভাবনা থেকেই মনে মনে ঠিক করে ফেলি সাইকেলের একটি সার্ভিসিং সেন্টার খুলব। ২০১৩ সালে যন্ত্রপাতি কিনে নিজের সাইকেল নিজেই খুলে-লাগিয়ে হাত পাকাতে থাকি। পাশাপাশি নেট ঘেঁটে ঘেঁটে শিখতে থাকি সাইকেল মেরামত ও তৈরির নানা কলাকৌশল। দেশের বাইরে থেকে এ সংক্রান্ত বেশকিছু বইপত্র আনিয়েও পড়তে থাকি। তো সেই পড়াশোনা থেকে বুঝতে পারি সাইকেল হওয়া উচিত কারো শরীরের মাপমতো। তাই সাইকেলের সার্ভিস সেন্টার খোলার প্রস্তুতির পাশাপাশি নিজে সাইকেল

তৈরি করারও প্রস্তুতি নিতে থাকি তখন থেকেই। এরপর ২০১৪ সালে মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডে আমাদের নিজেদের বাসার পাশেই একটি পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় চালু করি আমার বাইসাইকেল সার্ভিসিং সেন্টার। নাম দিই সাইকেল জংশন। অন্যদের সাইকেল মেরামত করার পাশাপাশি নিজে সাইকেল তৈরির কথাও ভাবছিলাম। সে ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার আগে সম্ভাব্যতা ও প্রতিবন্ধকতার দিকগুলো খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে উপলব্ধি করলাম– যারা সাইকেল তৈরি করে তারা কেউ-ই আসলে বাংলাদেশের জন্য সাইকেল প্রস্তুত করে না। এমনকি বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান সাইকেল প্রস্তুত করে তারাও না। তারা সাইকেল প্রস্তুত করে মূলত রফতানি করার উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ সাইকেলই রফতানি হয় ইউরোপের বাজারে। আবার বাংলাদেশে বিদেশ থেকে যেসব সাইকেল আমদানি করা হয় সেগুলোও বাংলাদেশের অধিবাসী ও আবহাওয়ার উপযোগী করে তৈরি করা হয় না। তাই তিনি ঠিক করলেন বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং দেশের মানুষের

সারাবিশ্বেই রাইডার্স, অর্থাৎ সাইকেল চালিয়েদের মাঝে হ্যান্ডমেড সাইকেলের খুব কদর। আর সে কারণেই আমার সাইকেলের চাহিদা বেশ ভালো। পাটের সাইকেল যদি ঠিকমতো বাজারজাত করতে পারি তা হলে আমার সাইকেলের চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

উপযোগী করে সাইকেল প্রস্তুত করবেন। দেশে তৈরিই হোক বা বিদেশে তৈরিই হোক, বাংলাদেশের বাজারে যেসব সাইকেল বিক্রি হয় সেগুলো এ দেশের মানুষের শারীরিক কাঠামো অনুযায়ী তো নয়ই, ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ীও তৈরি নয়। এগুলোও যে পরিবেশবান্ধব তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু দীর্ঘদিন এসব সাইকেল চালিয়ে দেশের অনেকেই মেরুদণ্ডের কঠিন সমস্যায় ভোগেন, হাঁটুর সমস্যা দেখা দেয়, ঘাড়ে সমস্যা হয়, কবজিতে সমস্যা হয় এবং অবধারিতভাবেই এজন্য তাকে ডাক্তারের পেছনে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্য কারখানায় আলাদা কাঠামোর সাইকেল তৈরিও সম্ভব নয়। কারণ আমরা হচ্ছি মিশ্রজাতি– রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছেন– 'হেথা আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন/ এক দেহে সব লীন হয়ে আছে।' আমাদের দেশে একেকজনের দেহকাঠামো একেক রকমের। এমন পর্যবেক্ষণ থেকে উপলব্ধি করতে পারলাম স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত ও ভৌগোলিক বিবেচনায় এ দেশের মানুষের জন্য হ্যান্ডমেড সাইকেলই সবচেয়ে উপযোগী হবে। বইপত্র এবং ইন্টারনেট ঘেঁটেও ততদিনে জেনে গেছি যে, সব

আদমজি পাটকল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ভাবছিলাম পাটকে কী করে স্বগৌরবে ফিরিয়ে আনা যায়। মূলত ছোটবেলার সেই সদিচ্ছারই প্রতিফলন আমার এই পাটের সাইকেল। যথেষ্ট পুঁজি পেলে সারাবিশ্বে পাটের সাইকেল বাজারজাত করে পাটের সেই হারানো দিন ফিরিয়ে আনতে পারব বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

দেশেরই সচেতন সাইকেল-রাইডাররা হাতে তৈরি সাইকেলের ওপরই বেশি ভরসা করেন। ব্যাপারটা অনেকটা এ রকমের– বাজারে রেডিমেড গার্মেন্টস পাওয়া যায়, আপনি সেখান থেকে আপনার জামাটি কিনে নিতে পারেন। তবে তাতে হয়তো হাতা বড় বা ছোট হয়ে যেতে পারে, ঝুলে কম বা বেশি হয়ে যেতে পারে, আর গায়ে বেশি টাইট বা ঢিলা হয়ে যেতে পারে। আবার আপনি দর্জির দোকান থেকে আপনার শরীরের মাপমতো তা সেলাই করিয়ে নিতে পারেন। হাতে বানানো সাইকেলের সুবিধা হচ্ছে দরজির দোকানের মতোই গজ-ফিতায় মাপ নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট দেহের মাপে সাইকেল তৈরি করা হয়। সুতরাং আমি সেভাবেই সাইকেল তৈরির প্রস্তুতি নিলাম। তবে ২০১৪ সালের শেষের দিকে প্রথম দুটি সাইকেল বেমাপেই তৈরি করেছিলাম। অর্থাৎ গড়পড়তা বাঙালি মাপে তৈরি করেছিলাম। প্রথম সাইকেল তৈরি করতে পারার পর সে যে কী আনন্দ পেয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এ ক্ষেত্রে আমার আনন্দের মাত্রাটা ছিল অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ, যারা হাতে সাইকেল তৈরি করেন তারা বলে থাকেন যে প্রথম বিশটি সাইকেল হয় 'বুলশিট', অর্থাৎ একদম বাজে, তা কোনো কাজেই লাগে না। কিন্তু আমার প্রথম দুটি সাইকেলই ছিল পাতে নেয়ার মতো এবং আমি নিজে সেগুলো চালিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম।" এটুকু শোনার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রথম সাইকেল দুটি কি কোনো ওয়ার্কশপে গিয়ে তৈরি করেছিলেন? জবাবে বললেন– "না, এ ধরনের কোনো ওয়ার্কশপ নেই। সাইকেলের কারখানাগুলোর নিজস্ব ওয়ার্কশপ আছে অবশ্যই, যেমন মেঘনা গ্রুপ। আমি আমার সব সাইকেলই, অর্থাৎ সব সাইকেলের ফ্রেমই নিজে তৈরি করেছি। তবে বাইরের বিভিন্ন রকমের ওয়ার্কশপ ঘুরে আমার দেয়া মাপমতো এই ফ্রেমগুলো তৈরি করেছি। ওই ওয়ার্কশপগুলোর কারিগরেরা বেশির ভাগই ননটেকনিক্যাল, নয়তো টেকনিক্যালি ততটা সাউন্ড নয়। তাদের বোঝাতে হয়েছে, কোথায় এক মিলিমিটার ছোট-বড় হলে তেমন ক্ষতি হবে না এবং কোথায় এক মিলিমিটার কম-বেশি হলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে, সাইকেল হয় ডানে চলে যাবে, নয় বামে– মোট কথা দুর্ঘটনা ঘটার সমূহ আশঙ্কা থাকবে। তো প্রথম দুটি ফ্রেম তৈরি করতে আমার মাসখানেক সময় লেগেছিল। পৃথিবীর কোনো সাইকেল কারখানাই পুরো সাইকেল তৈরি করে না। শুধু ফ্রেম তৈরি করে। কোনো কোনো কোম্পানি বড় জোর হ্যান্ডেল ও ফ্রগ তৈরি করে। আমিও তাই করি, অর্থাৎ শুধু ফ্রেম তৈরি করে বাকি সব পার্টস বাইরে থেকে কিনে এনে লাগিয়ে নিই। আমি সৌভাগ্যবান যে, বিশ্বে যারা হাতে সাইকেল তৈরি করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের প্রথম দশটি সাইকেল ব্যবহার-উপযোগী থাকে না; তবে আমার তৈরি করা প্রথম দুটি সাইকেলই ব্যবহার উপযোগী ছিল। এরপর চেষ্টা করলাম দেশীয় উপাদান দিয়ে সাইকেল তৈরি করা যায় কিনা। এক সময় তৈরিও করে ফেললাম বাঁশ দিয়ে সাইকেলের একটি ফ্রেম। সাইকেল নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতেই থাকল। ভাবলাম দীর্ঘযাত্রায় সাইকেল চালানোর পরিশ্রম কী করে কমানো যায়। ভাবতে ভাবতে এবং নানা রকমের নির্মাণ-কৌশল প্রয়োগ করে অবশেষে লম্বা ফ্রেমের ডবল প্যাডাল, ডবল সিটের একটি সাইকেল তৈরি করে ফেললাম। অর্থাৎ দুজনে চালানো যাবে এটি। দুজনে চালিয়ে দেখলাম পরিশ্রম অনেক কম হচ্ছে এবং একটি স্বাভাবিক সাইকেলের মতোই অনায়াসে ঘুরে বেড়ানো যাচ্ছে। লং রুটে চালানোর উপযোগী করে তৈরি করেছি এটি। ধরেন, আপনি ঢাকা থেকে দিনাজপুর যাবেন, একজন সঙ্গীও আছে সাথে, তখন দুজনে প্যাডাল করে অনেক কম পরিশ্রমে স্বাভাবিক

সাইকেলের চেয়ে বেশি গতিতে কম সময়ে পৌঁছা যাবে গন্তব্যে। আমার প্রথম ক্রেতা যিনি ছিলেন তিনি আমার সার্ভিস সেন্টারে তার সাইকেল মেরামত করতে এসেছিলেন। আমি তখন আমার তৈরি করা প্রথম দুটি সাইকেলের ফ্রেম রঙ করছিলাম। এগুলো আমি বিক্রির জন্য তৈরি করিনি। নিজে এ দুটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে চালিয়ে দেখব এর সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলো– ইচ্ছেটা এমনই ছিল। কিন্তু আমার সেই প্রথম ক্রেতার একটি ফ্রেম এতোই ভালো লেগে গেল যে তিনি রীতিমতো গোঁ ধরে বসলেন একটি ফ্রেম দিয়ে সাইকেল তৈরি করিয়ে নিতে। দক্ষ ও সচেতন রাইডার বলে তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন– এই স্পেসাল টাইপের সাইকেল বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। তার পছন্দ করা ফ্রেমটি তিনি ১৫ হাজার টাকায় কিনে নিয়ে পুরো সাইকেল তৈরি করে দেয়ার বায়না করলেন। পুরো সাইকেলে তার খরচ পড়েছিল ৫৫ হাজার টাকা। এর পর থেকে আমি ১৫০ টিরও বেশি সাইকেল তৈরি করেছি। আমি বেশির ভাগ সাইকেলই ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করি, সুতরাং এগুলোর দামেরও তারতম্য হয় ক্রেতাভেদে। কেউ হয়তো চার লাখ টাকা দিয়ে স্পেসাল লাক্সারিয়াস সাইকেল তৈরি করিয়ে নিল, আবার কারো সাইকেলে হয়তো খরচ পড়ল মাত্র ১২ হাজার টাকা। এর কমেও সাইকেল তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু আমি এ ধরনের সাইকেল তৈরি করি না, কারণ নির্ঘাত তা মাসখানেক পর মেরামতের জন্য আমার কাছেই ফিরে আসবে। এরপর আমি প্রথমে বাঁশ দিয়ে এবং তারপর পাট দিয়ে সাইকেলের ফ্রেম তৈরি করেছি। একটি ভবন তৈরি করতে যেমন রড লাগে আবার ইট-বালু খোয়াও লাগে তেমনি আমি সাইকেলের ফ্রেম তৈরিতে পাটের চটকে রড এবং এক ধরনের বিশেষ আঠাকে (ইপোক্সি রেজিং) সিমেন্ট-ইট-বালু হিসেবে ব্যবহার করেছি। প্রক্রিয়াটা একটু খুলে বলি : প্রথমে একটি ছাঁচ তৈরি করে ছাঁচের ওপরে চট পেঁচিয়ে তার ওপরে ইপোক্সি রেজিং পেস্ট করে তার ওপরে আবার চট এবং আবার ইপোক্সি রেজিং– এভাবে বেশ কয়েক পরত হয়ে গেলে শুকিয়ে নিয়ে ভেতর থেকে ছাঁচটি বের করে নিই। এরপর এটিকে দিয়ে সাইকেলের ফ্রেম তৈরি করি আগেকার নিয়মেই। এই ফ্রেমে চাপটা নেবে আঠা তথা রেজিং এবং টানটা নেবে পাট। আদমজি পাটকল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ভাবছিলাম পাটকে কী করে স্বগৌরবে ফিরিয়ে আনা যায়। মূলত ছোটবেলার সেই সদিচ্ছারই প্রতিফলন আমার এই পাটের সাইকেল। যথেষ্ট পুঁজি পেলে সারাবিশ্বে পাটের সাইকেল বাজারজাত করে পাটের সেই হারানো দিন ফিরিয়ে আনতে পারব বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।"

এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা কী কী জানতে চাইলে বললেন, প্রধান প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব। এ ছাড়া ল্যাব ফ্যাসিলিটিও অন্যতম বাধা। যথাযথ প্রচার না পাওয়াও এ উদ্যোগ বিকাশে এক অন্তরায়। সাইকেল তৈরির ম্যাটেরিয়াল জোগাড় করাও খুব কষ্টসাধ্য।

আপনি কীভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে পেরেছেন– আমার এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'পুঁজির অভাব খানিকটা মিটিয়েছি আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধার-দেনা করে। ল্যাব ফ্যাসিলিটি পেতে ছুটে গেছি এক ওয়ার্কশপ থেকে আরেক ওয়ার্কশপে। আর মেটেরিয়াল সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে খুঁজতে বেছে নিয়েছি বাঁশ ও পাটকে।'

জানতে চাইলাম, কেউ যদি এ ধরনের উদ্যোগ নিতে চায় তবে তার জন্য তার পরামর্শ কী হবে? বললেন, 'সব ব্যাপারেই পুরোপুরি সৎ থাকতে হবে। আর পেশা হিসেবে এ ধরনের উদ্যোগ বেছে নেয়ার আগে যথেষ্ট পড়াশোনা করে জেনে নিতে হবে এর অন্ধিসন্ধি।'

প্রযুক্তির ব্যাপারে জানালেন, 'আমি এখনো ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেই সবকিছু করছি।' জনবল প্রসঙ্গে জানালেন, তার কর্মী পাঁচজন। সবাই দক্ষ। হিসেব পদ্ধতির ব্যাপারে বললেন, 'হিসেবের খাতায় হিসেব তো লিখে রাখিই, কম্পিউটারেও হিসেব সংরক্ষণ করে রাখি।' এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা জানতে চাইলে বললেন, যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারলে এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অপরিসীম। এরপর তার স্বপ্নপূরণের শুভকামনা জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। ■

সুপারি পাতার খোলে
ওয়ানটাইম
প্লেট

৮ ডিসেম্বর (২০১৬) তিন তরুণের বিষমুক্ত শুঁটকি প্রকল্প দেখার পর থেকেই মনটা বেশ ফুরফুরে ছিল। কোনো ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার না করে এবং শুঁটকি করার পুরো প্রক্রিয়ায় একটিও মাছি বসতে না দিয়ে খুব যত্নে করা তাদের শুঁটকিগুলো এরই মধ্যে বহির্বিশ্বের ভোক্তাদের নজর কেড়েছে। শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য বলে জাতিসঙ্ঘের সংস্থা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি শরণার্থীদের খাদ্য হিসেবে তাদের শুঁটকি কিনে নিচ্ছে নিয়মিতভাবে। দেশেও তাদের ভোক্তার সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। দেশের অর্থনীতিতে ফেলছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। সুতরাং এমন একটি প্রকল্প দেখার পর থেকেই মনের ভেতর আত্মশ্লাঘার বর্ণিল পাখিটা ডানা মেলে দিয়েছিল তখন থেকেই।

তাই এদিন সেখান থেকে বেরুনোর পর গাড়িটি কক্সবাজারের প্রধান সড়কে ওঠার পর রিশাদ যখন ড্রাইভারকে উখিয়ার দিকের রাস্তা ধরতে বলল তখন কিছুটা কৌতূহলের সঙ্গেই জানতে চাইলাম কোথায় যাচ্ছি। লুৎফর ভাইয়ের চোখে-মুখেও একই প্রশ্নের ছায়া দেখতে পেলাম। রিশাদ জানালেন, সেখানে একটি বিশাল অর্গানিক ফলের বাগান আছে, সঙ্গে কুমিরের খামার। কুমিরের খামারটি অবশ্য মাত্র কয়েকদিন আগে শুরু করা হয়েছে, বাজারজাতকরণের পর্যায়ে যেতে এখনো কয়েক বছর লাগবে। লুৎফর ভাইয়ের গোটা অভিব্যক্তিতে এক ধরনের অনীহা লক্ষ করলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধে ছিল তার সক্রিয় অংশগ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধ করেছেন ২ নম্বর সেক্টরে; তারপর দেশ গড়ার লক্ষ্যে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার অধীনে অনেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অবদান রেখেছেন এবং এখনো রেখে চলেছেন। দেশের অগ্রগতির অগ্রযাত্রায় যে উদ্যোক্তারা বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছেন, জাতির সামনে তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার আমাদের এই প্রয়াসে তাই শরিক হয়েছেন সোৎসাহে। সুতরাং চেহারায় অনীহার ছায়া দেখতে পেয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম– ফলের বাগানের বেশ ভালো একটি প্রকল্প এরই ভেতর পরিদর্শন করে এসেছি এবং কুমিরের লাভজনক হলেও এর ব্যাপক বিস্তৃতি ততটা সম্ভব নয় বলে এ দুটি প্রকল্প তাকে মোটেও টানছে না। তাই আমিও মনে মনে গুটিয়ে থাকলাম। রিশাদ খুব সহজেই আমাদের মনের ভাব বুঝতে পারলেন এবং নিমেষেই আমাদের মনের অন্ধকার ঝেঁটিয়ে দূর করলেন। বললেন সেখানে সুপারিপাতার খোল দিয়ে দেশে প্রথমবারের ওয়ানটাইম প্লেট তৈরি করছেন এক উদ্যোক্তা। শুনেই আমার মনের ভেতর আশার আলো ঝলমলিয়ে উঠল। খুশির ঝিলিক দেখতে

প্লাস্টিকজাতীয় উপাদানে তৈরি ওয়ানটাইম প্লেট মাটিতে পচে না, জীবাণুতে আক্রান্ত হয় না বলে জঞ্জালের স্তূপ জমতে থাকে, যা মাটি ও পরিবেশকে অসহনীয় মাত্রায় দূষিত করে তোলে। কিন্তু সুপারিপাতার খোলে তৈরি থালা মাটিতে ফেলার পরই নানা রকমের জীবাণু তাতে বাসাবেঁধে পচিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। এতে মাটির কোনো ক্ষতি তো করেই না বরং একে উর্বর করে তোলে

পেলাম লুৎফর ভাইয়ের চেহারায়ও। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর নারকেল ও সুপারি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেসবের সব সম্ভাবনাকে আমরা এখনো কাজে ---লাগাতে পারছি না। নারকেলের ছোবড়া দিয়ে অল্পকিছু পণ্য উৎপাদন হলেও সুপারির কেবল ফল ছাড়া অন্যকিছুতে কোনো শিল্পপণ্য তৈরি করতে পারছি না আমরা। তাই সুপারিপাতার খোল দিয়ে এক উদ্যোক্তা ওয়ানটাইম প্লেট তৈরি করছেন– কথাটা কানে যেতেই উৎসাহের খই ফুটতে থাকল মনের ভেতর। কিন্তু সেখানে গিয়ে এই উদ্যোক্তাকে পাওয়া গেল না। উৎপাদনও আপাতত বন্ধ। রিশাদ আশা দিয়ে বললেন, মালিক ঢাকাতেই থাকেন। একদিন অফিসে ডেকে এনে তার সাক্ষাৎকার নেয়া যাবে। অগত্যা তার যন্ত্রপাতি এবং আগে তৈরি করা কিছু ওয়ানটাইম প্লেটের ছবি তুলে ফিরে এলাম। তবে ওয়ানটাইম প্লেটগুলো দেখে মনটা আবারও ভালো হয়ে গেল।

ওয়ানটাইম প্লেট। শুনেই বুঝে নেয়া যায় একবার ব্যবহার করেই এসব থালা ফেলে দিতে হয়। অনেকে ফেলনা জিনিস বলে ভুরু কোঁচকাতে পারেন, কিন্তু এই ফেলনা জিনিসেরই এখন রমরমা ব্যবসা বিশ্বজুড়ে। আমাদের দেশেও বিয়েবাড়ি, পিকনিক, সামাজিক এবং ধর্মীয়– সব ধরনের ভোজ-অনুষ্ঠানেই এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ওয়ানটাইম প্লেট। বাংলাদেশে এর ব্যবহার দিনদিন বেড়েই চলেছে। বাইরের দুনিয়ায় এ ধরনের ওয়ানটাইম বাসন, বাটি, কাপ, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি পাত্রের ব্যবহার অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। কবে থেকে একবার ব্যবহার উপযোগী এসব পাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তার সঠিক কোনো তথ্য অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উদ্ধার করতে পারিনি। সম্ভবত বিমানযাত্রীদের হালকা পাত্রে খাদ্য পরিবেশনের লক্ষ্যে এ ধরনের পাত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তবে বাংলাদেশে এর ঢেউ এসে লেগেছে উন্নত বিশ্বে ব্যবহার শুরু হওয়ার অনেক পরে।

আগে কোনো ভোজ অনুষ্ঠানে এক ব্যাচের খাওয়া শেষ হলে ব্যবহৃত থালা আবার ধুয়ে নতুন ব্যাচের মেহমানদের খেতে দিতে হতো। এতে যেমন সময় বেশি লাগত, তেমনি মেহমানরাও বিরক্ত হতেন আর বিব্রতকর অস্বস্তিতে থাকতেন আয়োজকরা। একবার ব্যবহার উপযোগী থালা-বাসন যে এ ক্ষেত্রে সময় ও খরচ অনেক কমিয়ে দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলার অপেক্ষা রাখে না এর ব্যবসাও এখন সব দেশের বিনিয়োগকারীদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। কিন্তু এতসব উপকারি দিক থাকলেও এর সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে– বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব পাত্র যেসব উপাদানে তৈরি তা পরিবেশের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। সাধারণত প্লাস্টিক বা এই জাতীয় উপাদানে তৈরি কাগজ দিয়ে এসব পাত্র তৈরি করা হয়। মাটিতে মিশে যায় না এগুলো। তাই পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি মাটির সাংঘাতিক ক্ষতি করে; উর্বরাশক্তিও আশঙ্কাজনকভাবে কমিয়ে দেয়। তবে আশার কথা হচ্ছে– বাংলাদেশে প্রাকৃতিক উপাদানে ওয়ানটাইম প্লেট তৈরি করে পরিবেশসংক্রান্ত সব আশঙ্কাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন মঈন উদ্দিন (৬০) নামে এক কৃতী উদ্যোক্তা। পথ দেখিয়েছেন এক স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব লাভজনক উদ্যোগের। অর্থনৈতিক উন্নতির সিঁড়ি দ্রুত টপকাতে থাকা বাংলাদেশে এখন যারা বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্য নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাদের জন্য এটি একটি লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হওয়ারই দাবি রাখে।

সুপারি পাতার খোল দিয়ে বাংলাদেশে তিনিই প্রথম ওয়ানটাইম প্লেট তৈরি করেছেন।

সুপারি পাতার খোলের থালা শতভাগ প্রাকৃতিক তো বটেই দেখতেও ভারি সুন্দর! সুপারি পাতার খোল– অর্থাৎ পাতার গোড়ার যে অংশটুকু গাছের কাণ্ডের সঙ্গে সেঁটে থাকে। মঈন উদ্দিন এই সুপারির পাতার খোলের ওয়ানটাইম প্লেট প্রথম দেখেছিলেন ভারতে। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর কোয়েত বাটারের এক প্রত্যন্ত গ্রামে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন বিয়ে খেতে। বিয়েবাড়িতে যখন খাবার টেবিলে ডাক পড়ল তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখতে থাকলেন সারি সারি টেবিলে সাজিয়ে রাখা প্লেটগুলো। প্লেটের লোভনীয় খাবারগুলোর চেয়ে কাঁচা কাঠের রঙের প্লেটগুলোই তাকে বেশি টানছিল। কাঁসা, পিতল, চীনামাটি, পোর্সেলিন ইত্যাদি অনেক দামি থালা থেকে শুরু করে দু/পাঁচ টাকার সস্তা ওয়ানটাইম প্লেট কত্ত ধরনের প্লেটই না দেখেছেন জীবনে! কিন্তু এমন অদ্ভুত থালা দেখেননি। আশপাশে জিজ্ঞেস করে জানলেন এগুলো সুপারি পাতার খোল দিয়ে তৈরি ওয়ানটাইম প্লেট। শুনে তার কৌতূহলটা আরো বেড়ে গেল। বিয়েবাড়ির খাবারের পর্ব শেষ হলে আরো ভালোমতো খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন স্থানীয়ভাবেই তৈরি হয়

এগুলো। কৌতূহলটা এবার রূপ নিল প্রবল আগ্রহে। ওয়ানটাইম প্লেট বাংলাদেশেও তৈরি হয়, কিন্তু তার সবই হয় প্লাস্টিকের নয়তো প্লাস্টিক ঘরানারই অপচনশীল কোনো কাগজের, যা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। তার আগ্রহের আরেকটা কারণ– বাংলাদেশের গোটা উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর সুপারি গাছ জন্মে। এ গাছের ফল বাজারজাত করা হলেও এর পাতা বা ফলের খোলস বা ছোবড়া রান্নার চুলোর জ্বালানি ছাড়া অন্য কোনো কাজেই আসে না। তাই এ পণ্য তৈরি করার জন্য দেশে কাঁচামালের অভাব হবে না। তা ছাড়া এই পণ্যটি যদি বাংলাদেশে তৈরি করা যায় তা হলে এর প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি যেমন লাভবান হতে পারবেন, তেমনি দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশ– দুয়ের জন্যই তা খুব ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে।

এসব ভাবতে ভাবতে আগ্রহটা তার আরো বেড়ে গেল। লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে এক সময় তাই পৌঁছে গেলেন সুপারির পাতার খোল দিয়ে ওয়ানটাইম থালা তৈরির একটি ঘরোয়া কারখানায়। দেখতে পান, আমাদের দেশের হস্তশিল্প কারখানার মতোই একটি ঘরে কয়েকজন কারিগর মেশিনে এসব প্লেট তৈরি করছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন তিনি সুপারি পাতার খোল দিয়ে থালা তৈরির পুরো প্রক্রিয়া। কিন্তু একটু অসুবিধায় পড়ে গেলেন তিনি। বাড়িঅলা বা কারখানার মালিক তার কথা বুঝতে পারছিল না, কারণ তিনি বলছিলেন ইংরেজিতে, কিন্তু কারখানার মালিক তামিল ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানেন না। তবে সবকিছু বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হলো না তার, কারণ চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিলেন পুরো কার্যক্রম। যন্ত্রটাও আহামরি জটিল কিছু নয়। অনেকটা লেদ মেশিনের মতো। বিদ্যুতে চলে। ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকানো সুপারি পাতার খোল যন্ত্রের প্ল্যাটফর্মে রেখে ওপর থেকে ধাতব ছাঁচে চাপ দিয়ে নিমেষেই তৈরি হচ্ছে একেকটি প্লেট। ওপরের ছাঁচটি যান্ত্রিকভাবেই ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে উত্তপ্ত হয়ে সুপারি পাতার ওপর চেপে বসে এসব প্লেট তৈরি হচ্ছিল বলে একই সঙ্গে তা থালাগুলোকে জীবাণুমুক্তও করছিল। ভালোমতো দেখে মঈন উদ্দিন বুঝতে পারলেন ঠিকমতো বুঝিয়ে বলতে পারলে বাংলাদেশের যে কোনো ওয়ার্কশপের কারিগর এ যন্ত্র তৈরি করতে পারবে সহজেই। ২০১৩ সালে দেশে ফিরে ঠিকই তিনি তৈরি করে ফেললেন এই যন্ত্র। কিন্তু সুবিধামতো জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলেন না এই যন্ত্র বসানোর। অবশেষে কক্সবাজারের উখিয়ায় এক পরিচিতজনের কৃষিখামারে তিনি এই যন্ত্র স্থাপনের জায়গা পেয়ে গেলেন। কাজে লেগে গেলেন সমস্ত মনোযোগ ঢেলে।

সুপারি পাতার খোল যেমন শতভাগ প্রাকৃতিক, তেমনি এটি দিয়ে তৈরি ওয়ানটাইম প্লেট তৈরির পুরো প্রক্রিয়ায়

এর প্রাকৃতিক উপাদান অক্ষুণ্ন রাখা হয়। এমনকি সুপারি গাছের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্য গাছ থেকে জবরদস্তি করে কোনো পাতা সংগ্রহ করা হয় না; গাছ থেকে ঝরে পড়া পাতার খোল দিয়েই কেবল এসব থালা-বাসন তৈরি করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। কোনো রকম রাসায়নিক ব্যবহার না করে এগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে উত্তপ্ত ছাঁচ দিয়ে চাপ দিয়ে বাসন-কোসন তৈরি করা হয়। এই গোটা প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম কিছুই ব্যবহার করা হয় না।

এই থালা-বাসন খুবই হালকা এবং ব্যবহারের জন্য খুব সজেই গুদামজাত করা যায়। সুপারিপাতার খোলের তন্তু বেশ তাপ-সহনীয় বলে এগুলো দিয়ে তৈরি থালা-বাটি-কাপ-গ্লাস মাইক্রোওভেন ও ওভেনে ব্যবহার করা যায়। এগুলো গন্ধহীন ও স্বাদহীন বলে এসব থালায় খাবার খেলে খাবারের ঘ্রাণ ও স্বাদ অক্ষুণ্ন থাকে। তা ছাড়া কিছুটা শক্ত বলে এ থালায় ধাতব কাঁটাচামচ ব্যবহারও সম্ভব।

সুপারিপাতা দিয়ে তৈরি পাত্র ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য মোড়কজাত করার জন্যও খুব নিরাপদ ও সুবিধাজনক। এতে রয়েছে ৭০ শতাংশ সেলুলুজ, যা উচ্চমাত্রার অক্সিজেন সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয় এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে এ উপাদানে সংরক্ষণ করা ফল ও সবজি দীর্ঘকাল তরতাজা থাকে। গরম, ভেজা ও ঠাণ্ডা– সব ধরনের খাবার পরিবেশনেই এসব থালা-বাসন ব্যবহার করা যায়।

প্লাস্টিকজাতীয় উপাদানে তৈরি ওয়ানটাইম প্লেট মাটিতে পচে না, জীবাণুতে আক্রান্ত হয় না বলে জঞ্জালের স্তূপ জমতে থাকে, যা মাটি ও পরিবেশকে অসহনীয় মাত্রায় দূষিত করে তোলে। কিন্তু সুপারিপাতার খোলে তৈরি থালা মাটিতে ফেলার পরই নানা রকমের জীবাণু তাতে বাসাবেঁধে পচিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। এতে মাটির কোনো ক্ষতি তো করেই না বরং একে উর্বর করে তোলে। আর এই সবকিছু বিবেচনায় নিয়েই মঈন উদ্দিন বাংলাদেশে সুপারিপাতার খোল দিয়ে এবার ব্যবহার-উপযোগী থালা তৈরি শুরু করেছিলেন। এ উদ্যোগে তাকে মোট ২০ লাখ টাকা খরচ করতে হয়েছিল। এজন্য কারো কাছ থেকে কোনো ঋণ নেননি তিনি। পরবর্তীতে অন্য এক উদ্যোগের জন্য ২০১৫ সালে মাইডাস থেকে অবশ্য ২০ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন, তবে লোকসানের কারণে সুপারি পাতার খোলের থালা তৈরি তিনি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন ততদিনে। ২০১৪ সালে লাগাতার অবরোধের কারণে বাজারজাত করতে না পারায় ভীষণ লোকসানের মুখে পড়েন। কিন্তু আশা ছাড়েননি তিনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস, পরিবেশবান্ধব এই ওয়ানটাইম প্লেট তিনি বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তুলতে পারবেন এবং এ খাত থেকে অনেক লাভবান হতে পারবেন। বর্তমানে তিনি কৃষিপণ্যের ব্যবসা করছেন। সুধিাজনক জায়গায় তার আগের যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে পারলেই পুরোদমে আবার শুরু করে দেবেন এই সৃজনশীল-পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, দেশে এ পণ্যটির ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব এবং একইভাবে ব্যাপকভাবে বাজারজাতও সম্ভব, কিন্তু পুঁজির অভাবে তিনি তা পারছেন না। আরো জানালেন, নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত পিকনিক, বিয়ে এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যায়; সে সময় ওয়ানটাইম প্লেটের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। সে সময়ের ব্যবসাটা ধরতে পারলে লাভের অঙ্কও বহুগুণে বেড়ে যাবে– সেই ভরসাতেই তিনি এ উদ্যোগ শুরু করেছিলেন। সেই আশাটা এখনো তিনি মনের ভেতর জিইয়ে রেখেছেন।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মঈন উদ্দিন জানালেন, বিএএফ শাহিন স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে তিনি মোহাম্মদপুর বয়েজ কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছিলেন। এরপর ভর্তি হন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই ১৯৭৮-৭৯ সালে পোল্ট্রিফার্ম শুরু করেন। দেশে প্রথম যে ৭ জন পোল্ট্রি খামার শুরু করেছিলেন তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। সে সময়ে শুধু বাংলাদেশ বিমানেরই ব্রয়লার মুরগির খামার ছিল। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেন ১৯৮৩ সালে। মাস্টার্স করার পর এমইএসের ঠিকাদারি করেছিলেন ১৯৯২ সাল পর্যন্ত। এরপর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে ফার্নিচারের ব্যবসা শুরু করেন। এই পুরো উদ্যোগটিই ছিল রফতানিমুখী। কারখানা ছিল রিংরোডে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত করেছিলেন সে ব্যবসা। এরপর আরো নানা ধরনের ব্যবসা করার পর ২০১৩ সালে সুপারিপাতার খোল দিয়ে ওয়ানটাইম প্লেট তৈরির কারখানা খুলেছিলেন।

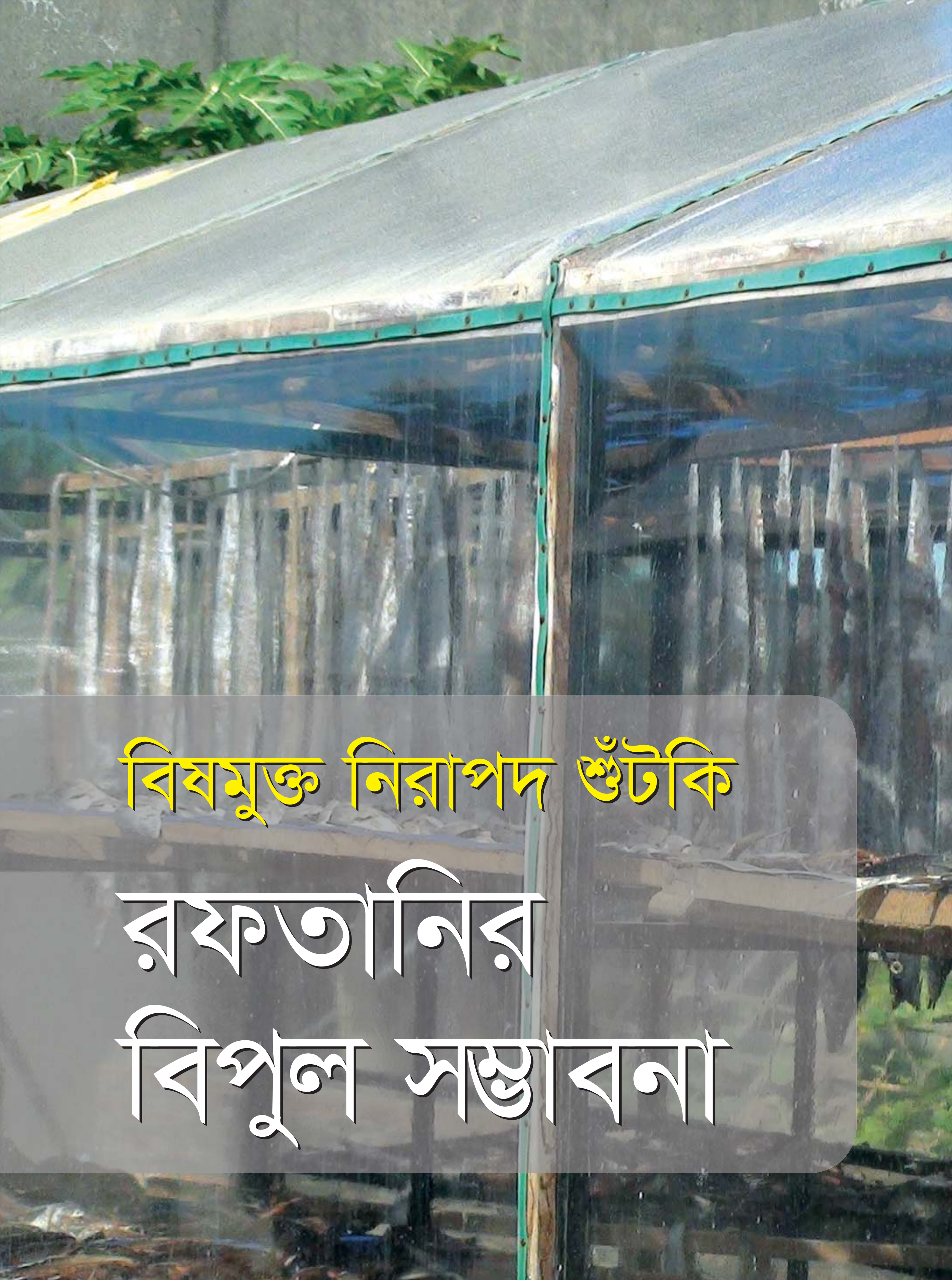

বিষমুক্ত নিরাপদ শুঁটকি

রফতানির বিপুল সম্ভাবনা

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের শুঁটকি, বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছের শুঁটকির চাহিদা বাড়ছে। আগ্রহী উদ্যোক্তারা এ খাতে বিনিয়োগ করে বেশ লাভবান হতে পারেন। সম্প্রতি কক্সবাজারে তিন তরুণ উদ্যোক্তার শুঁটকি তৈরি ও বিপণন দেখে এসে সে বিশ্বাস আমাদের আরো দৃঢ় হয়েছে। ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ আমরা এই তিন তরুণ উদ্যোক্তার শুঁটকি প্রকল্প দেখতে গিয়েছিলাম। তাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণের পর এ খাতের ওপর আমরা ভবিষ্যত-সম্ভাবনার এক দ্যুতি দেখতে পেয়েছি। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শুঁটকি খুব ভালো অবদান রাখতে পারবে বলে প্রত্যাশা করাই যায়।

আমরা কক্সবাজারের টাকপাড়া, মাঝের ঘাটের এই শুঁটকি প্রকল্পে গিয়েছিলাম সকাল সাড়ে নয়টার দিকে। আমরা পৌঁছার আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম) একটি প্রতিনিধি দল। সে কারণে তারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টাখানেক বাইরেই কাটাতে হলো। তারপর ঢুকলাম শুঁটকি প্রকল্পে। আমাদের সঙ্গী এবং পথপ্রদর্শক বদরুল আলম রিশাদ নিজেও একজন অংশীদার এই শুঁটকি প্রকল্পের। ২০১২ সাল থেকে তারা এই শুঁটকি প্রকল্প শুরু করেছেন। প্রথমেই তিনি আমাদের ওয়াশিংরুমে নিয়ে গেলেন। এই ঘরটাতে শুঁটকি করার জন্য সংগৃহীত মাছ ধুয়ে পরিষ্কার করা হয় এবং যেহেতু প্রায় সবই সামুদ্রিক মাছ, তাই মাছ ড্রেসিং করে পেটের নাড়িভুঁড়ি ফেলে মিঠাপানিতে খুব ভালোমতো ধুয়ে মাছের লবণাক্ততা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। এরপর আমরা দোতলায় তাদের অফিসঘরের ভেতরে না ঢুকে বাইরে থেকে দেখেই চলে গেলাম ছাদে। মূল কাজটা হয় এই ছাদেই। খোলামেলা বিশাল ছাদ। মাছ শুকিয়ে শুঁটকি করা ছাড়াও ছাদে তারা বেশ কয়েক জাতের সবজি চাষ করছেন টবে। তাদের শুঁটকির গুণগত মান এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য মনে করিয়ে দিতেই যেন রিশাদ বলে উঠলেন– 'আমাদের সব সবজিও অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষ করে থাকি।' একটি টব থেকে কয়েকটি পাকা টমেটো ছিঁড়ে ধুয়ে এনে খেতে দিয়ে বললেন, 'খেয়ে দেখেন, বাজারের রাসায়নিক সার ও কীটনাশকে ফলানো সবজির চেয়ে কত সুস্বাদু!'

ছাদে তাদের মোট পাঁচটি ড্রায়ার। এই ড্রায়ারগুলোতেই তাদের বিশেষ মানসম্পন্ন শুঁটকি তৈরি হয়, যেগুলো তারা বিদেশি ক্রেতা, দেশের সচেতন ক্রেতা এবং নিজস্ব আউটলেটে বিক্রি করেন। ড্রায়ারগুলোর বাইরেও সারা ছাদে চট বিছিয়ে বিভিন্ন ধরনের মাছ শুকিয়ে শুঁটকি করা হচ্ছে। বেশকিছু ছবি তুলে আমি এই তিন তরুণের সঙ্গে আলাপ করে জেনে নিতে থাকলাম তাদের আদ্যোপান্ত।

প্রথমেই আলাপ করলাম তিন তরুণের সর্বকনিষ্ঠ মো. ইসমাইলের সঙ্গে। রসায়ন শাস্ত্রে মাস্টার্স করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ করছেন বেশ বড় পরিসরে। দেশের নাম-করা চেইন-শপগুলোতে সরবরাহ করেন। আর যৌথ মালিকানায় যুক্ত রয়েছেন এই শুঁটকি তৈরি ও বিক্রি ব্যবসায়। কালো প্যান্ট, কালো শার্টের সঙ্গে মাথায় পরেছেন খাকি জকিক্যাপ। মাঝারি গড়নের গৌর বর্ণের বলে মানিয়েছেও বেশ। প্রথমেই আমি জানতে চাইলাম কিছুক্ষণ আগে তাদের শুঁটকি পরিদর্শন করে যাওয়া জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) এই দলটির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে। কিছুটা গর্বের সঙ্গেই ইসমাইল জানালেন, ডব্লিউএফপি তাদের শুঁটকির ক্রেতা। খুব উৎসাহ নিয়ে জানতে চাইলাম কবে থেকে এই বিশ্বসংস্থা তাদের শুঁটকি কিনছে। জানালেন– ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে এক ক্রয়চুক্তির মাধ্যমে তারা তাদের কাছ থেকে শুঁটকি কিনছে। এরপর এই ক্রয়চুক্তির শর্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে জানালেন– মাছের প্রকার এবং আকার ও ওজন নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে এই চুক্তিতে। ছুরিমাছের শুঁটকিই তাদের বেশি সরবরাহ করতে হয়। চুক্তির আরো শর্ত হচ্ছে– এই শুঁটকিতে কোনোভাবেই কোনো কীটনাশক বা অন্য কোনো রাসায়নিক ব্যবহার করা যাবে না। এখানে শুঁটকি করার সময় অনেক কীটনাশক ও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যাতে মাছি বসতে না পারে। তা ছাড়া এই শুঁটকিকে লবণমুক্তও হতে হবে। এ কথা শুনে কিছুটা বিভ্রমে পড়ে গেলাম। সঙ্গত কারণেই জানতে চাইলাম– লবণমুক্ত করে কীভাবে সরবরাহ করবেন? আপনারা যেসব মাছের শুঁটকি করছেন তার সবই তো সমুদ্রের মাছ! সমুদ্রের মাছ কি লবণমুক্ত করা সম্ভব? একটু মুচকি হাসলেন। তারপর বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন– অবশ্যই সম্ভব। আমাদের বঙ্গোপসাগরের মাছে লবণের যেটুকু অস্তিত্ব আছে তা মিঠাপানিতে ভালোমতো ধুলে চলে যায়। অর্থাৎ শুঁটকিতে যে পরিমাণ লবণের অস্তিত্ব থাকার চাহিদা তাদের সে পরিমাণে চলে আসে। জানতে চাইলাম লবণের মাত্রা ঠিক আছে কিনা সে ব্যাপারে তারা কি তাদের নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে? বললেন–

শুঁটকি- কবে, কোথা থেকে

উদ্বৃত্ত খাদ্যকে শুকিয়ে দুর্দিনের জন্য সংরক্ষণ করে আসছে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রাচীন তথ্যটি হচ্ছে– খ্রিস্টপূর্ব ১২,০০০ বছর আগে থেকেই খাদ্যকে শুকিয়ে পানিশূন্য করে সংরক্ষণ করে আসছে বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য ও এশীয় অঞ্চলের মানুষ। মাছকে শুকিয়ে পানিশূন্য করে শুঁটকি তৈরি তারই এক ধারাবাহিকতা। পানির কারণেই বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীব বেঁচে থাকে এবং তা মাছকে পচিয়ে দেয়। ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট ও মোল্ড বেড়ে ওঠে পানির কারণেই। তাই প্রাচীন আমল থেকেই খোলা জায়গায় বাতাস ও রোদ ব্যবহার করে মাছকে শুকিয়ে শুঁটকি করার রেওয়াজ প্রচলিত।

তবে শুঁটকি করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রামাণিক তথ্যটা ৫০০ বছরের পুরনো। ইউরোপীরা নিউ ওয়ার্ল্ড তথা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল আবিষ্কারের পর, বিশেষ করে নিউফাউন্ডল্যান্ডের অদূরে গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক আবিষ্কার করার পর অভিযাত্রী জ্যাকুইস কার্টিয়ার যখন সেন্ট লরেন্স নদীর মোহনা আবিষ্কার করেন তখন তিনি সেখানে হাজার হাজার বাস্ক নৌকাকে কড মাছ ধরতে দেখেন। এখনকার মতো রিফ্রেজারেশনের ব্যবহার না থাকায় সেখানকার অধিবাসীরা তখন কড মাছ লবণ মেখে রোদে-বাতাসে শুকিয়ে সংরক্ষণ করত। মূলত পর্তুগিজরাই শুঁটকি মাছের স্বাদ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। আগে থেকেই তারা তাদের জলসীমার নানা ধরনের মাছ লবণ দিয়ে শুকিয়ে শুঁটকি করত। কিন্তু ১৪৯৭ সালে নিউফাউন্ডল্যান্ড আবিষ্কারের পর সে এলাকার কড মাছের শুঁটকি বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় নিয়ে গিয়েছিল। সেই লবণে শুকানো কড মাছ তথা কড মাছের শুঁটকি সে সময় নিউ ওয়ার্ল্ড এবং ওল্ড ওয়ার্ল্ডের মাঝে এক বিশাল বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলজুড়ে এই কড-শুঁটকি দিনকে দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে এই শুঁটকি উত্তর ইউরোপ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, পশ্চিম আফ্রিকা, ক্যারিবীয় অঞ্চল এবং ব্রাজিলেও খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এভাবে সারা বিশ্বে অন্যান্য মাছের শুঁটকিও মানুষের প্রিয় খাদ্য হয়ে ওঠে। শুঁটকি মাছের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে এ মাছ সংরক্ষণ করে খাওয়া যায়। পর্তুগিজরা সে সময় উপকূলের পাথুরে জায়গায় লবণ মেখে মাছ শুকাতো। শুধু সংরক্ষণ-সুবিধার জন্যই নয়, পুষ্টিগুণেও শুঁটকি খুব সমৃদ্ধ। আর তাই সারাবিশ্বেই শুঁটকি এখন এক জনপ্রিয় পুষ্টি-সমৃদ্ধ খাবার বলে সমাদৃত।

১৮৮২ সালে শুঁটকি মাছের খামারের ওপর আঁকা ভ্যান গগের চিত্রকর্ম

'অবশ্যই। আমরা ওদের যে শুঁটকি সরবরাহ করব তার প্রতিটি কার্টন থেকে নমুনা সংগ্রহ করে সেই কার্টনগুলো সিলগালা করে রেখে ভারতে অবস্থিত ওদের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করিয়ে শুঁটকির পুষ্টিগুণসহ অ্যানালেটিক্যাল রিপোর্ট আনিয়ে তার ওপর ভিত্তি করে ওরা ডেলিভারি নেয়। এভাবে আমরা প্রতিমাসে তাদের কাছে দেড় টন করে শুঁটকি সরবরাহ করে আসছি। তারা এ শুঁটকি সাধারণত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভেতর সরবরাহ করে। ওরা আরো শুঁটকি নিতে চায়। আজ আপনারা আসার আগে সে উদ্দেশ্যেই এসেছিল তারা। আরো একটা শরণার্থী শিবিরে সরবরাহের জন্য ওরা প্রতিমাসে বাড়তি দেড় টন করে শুঁটকি নিতে চায়।

'চুক্তিপত্র অনুযায়ী তিনটি গ্রেডে আমরা তাদের শুঁটকি সরবরাহ করি। প্রথম গ্রেডের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১২ ইঞ্চি, যা প্রতিকেজি ২৯৫ টাকা দরে সরবরাহ করা হয়, দ্বিতীয় গ্রেডের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১৬ থেকে ১৮ ইঞ্চি, যা ৫২০ টাকা কেজি দরে সরবরাহ করা হয় এবং তৃতীয় গ্রেড হচ্ছে ১৮ থেকে ৩২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের শুঁটকি, যা সববরাহ করা হয়

১০৫০ টাকা কেজি দরে। এ সময় তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কোন কোন ড্রায়ারে কোন কোন গ্রেডের শুঁটকি শুকানো হচ্ছে। দুটি ড্রায়ারে ১২ ইঞ্চি গ্রেড, দুটিতে ১৮ ইঞ্চি গ্রেড এবং একটিতে ৩২ ইঞ্চি গ্রেডের ছুরি মাছের শুঁটকি শুকানো হচ্ছিল এ সময়ে। এই ফাঁকে তিনি জানিয়ে রাখলেন– ডব্লিউএফপি-কে তারা মানবস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ শুঁটকি সরবরাহ করে যেভাবে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন তাতে আরো ৩/৪ টন শুঁটকি সরবরাহ করতে পারবেন বলে আশাবাদী। এরপর জানতে চাইলাম ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম ছাড়া আর কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা আন্তর্জাতিক বাজারের অন্য কোথাও তারা এই শুঁটকি বাজারজাত করতে পারছেন কিনা। জবাবে জানালেন, না, আর কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এখনো সরবরাহ করছি না। তবে থাইল্যান্ডের এক ক্রেতা বেশ কয়েক দফা এসে আমাদের শুঁটকির নমুনা নিয়ে গেছে, এবং তারা সন্তুষ্ট। তারা শুধু চিংড়ির শুঁটকি নেবে। মাসখানেকের ভেতরে (অর্থাৎ ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে) তারা চিংড়ির শুঁটকি নিতে শুরু করবে বলে কথা অনেকটা পাকা হয়ে গেছে। এ ছাড়া স্পেন এবং ফ্রান্সের দুই দল ক্রেতার সঙ্গেও কথা চলছে। স্পেনের এক ক্রেতা ৯৮২০০ ডলারের ইনভয়েসও করে রেখেছে। তারাও আমাদের শুঁটকির নমুনা নিয়ে সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, আন্তর্জাতিক কোনো বায়ারের মাধ্যমে তারা শুঁটকি বিক্রি করেন না। নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার চালান এবং সে সূত্রে বৈদেশিক ক্রেতারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দেশের ভেতরের অনেক সাপ্লাইয়ার তাদের কাছ থেকে শুঁটকি কিনে নিয়ে সারাদেশে বাজারজাত করে। বিক্রয় ডট কমের মতো একটা অনলাইন শপিং কোম্পানি তাদের কাছ থেকে শুঁটকি নিয়ে বছরখানেক ধরে সারাদেশে বিক্রি করছে। তাদের মাধ্যমে আমাদের রূপচাঁদা, চিংড়ি, লাখ্যা, ছুরি ইত্যাদি ধরনের ৩ থেকে ৪ টন শুঁটকি বিক্রি হচ্ছে। সারা বছরের চাহিদা পূরণের জন্য আমরা সাগরে যখন মাছ খুব বেশি ধরা পড়ে তখন বেশি বেশি করে শুঁটকি করে কার্টনজাতের মাধ্যমে হিমাগারে গুদামজাত করে রাখি। সেখান থেকে সারাবছর শুঁটকি বাজারজাত করি। আমাদের শুঁটকি আমেরিকা এবং ইউরোপে বাজারজাতের জন্য স্থানীয় বায়ার কাজ করছে।

এরপর কথা বললাম তিন তরুণ উদ্যোক্তার আরেকজন মুকাদ্দেসুর রহমান মুকুলের সঙ্গে। প্রথমেই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে করা এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ২০০৩ সালে রসায়ন শাস্ত্রে মাস্টার্স করেই পেশার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ইউটার্ন নিয়ে একজন জুনিয়র অফিসার হিসেবে যোগ দেন সোনালী ব্যাংকে। ১ মাস টেইনিংসহ ৬ মাস চাকরি করেছিলেন সেখানে। এরপর কেমিস্ট হিসেবে যোগ দেন মেঘনা গ্রুপে। সোনালী ব্যাংকে যোগ দেয়ার পরই সেখানে সিভি দিয়ে রেখেছিলেন। জানতে চাইলাম মেঘনা গ্রুপের কোন কোন প্রোডাক্ট প্রমোটের ব্যাপারে তার অবদান আছে। বেশ গর্বের সঙ্গে জানালেন, ফ্রেশ মিনারেল ওয়াটার থেকে ফ্রেশ চিনি পর্যন্ত আমি সেখানে মুখ্য কেমিস্ট হিসেবে অবদান রেখে আসি। বাংলাদেশের কেমিস্টদের ভেতর আমিই ছিলাম প্রধান। কয়েকজন বিদেশি কেমিস্টও ছিল অবশ্য। অর্থাৎ আমরা এখন যে ফ্রেশ পানি এবং চিনি খাই তার মূল কেমিস্ট ছিলেন তিনিই। ২০০৭ সালে সেখান থেকে চাকরি ছেড়ে তিনি ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন হেল্‌থ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসে। চট করে প্রশ্ন করলাম– হঠাৎ কেমিস্টের চাকরি ছেড়ে একেবারে প্রশাসনিক পদে? এবার নিজের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ব্যাখ্যা করে বললেন– ছোটবেলা থেকেই আমার উকেশ্য ছিল একজন শিল্পপতি হবো। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে মেঘনা গ্রুপের চাকরিতে প্রোডাকশনের ওপর অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবার তাই মার্কেটিং-এ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ফার্মাসিউটিক্যালসের ম্যানেজারের চাকরি নিলাম। এই চাকরিতে সফলতা অর্জনের পর মনে করলাম এবার নিজের লক্ষ্যপথে হাঁটার সময় হয়েছে। তাই ২০০৯ সালে এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার নিজ জেলা কুমিল্লায় মিনারেল ওয়াটারের একটি কারখানা খুলি গোমতি মিনারেল ওয়াটার ইন্ডাস্ট্রি নামে। আমার এই প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড নাম হচ্ছে থান্ডার পিওর ড্রিংকিং ওয়াটার। এটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। এখনো আছে। সেখানে আমার প্রাথমিক বিনিয়োগ ছিল ৪৫ লাখ টাকা। এখনো এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমার মাসে ৪/৫ লাখ টাকা লাভ থাকে। প্রথম দুই বছরেই বিনিয়োগের ৪৫ লাখ টাকা উঠে গেছে।

এরপর আমি মেগা অর্গানিক বাংলাদেশ লিমিটেড নামে জৈবসারের একটি কারখানা খুলি ঢাকার কেরানীগঞ্জে। সঙ্গে সঙ্গে মিনারেল ওয়াটারের কারখানাও চলছে। জৈবসার কারখানার আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলাম। এখন একজন ডিরেক্টর। জানতে চাইলাম কী দিয়ে জৈব সার করেন। বললেন গোবর এবং ইয়েন (ইফেক্টিং

শুঁটকির তিন তরুণ উদ্যোক্তা (বা থেকে) মুকাদ্দেসুর রহমান মুকুল, মো: ইসমাইল ও বদরুল আলম রিশাদ

মাইক্রো অর্গানিজম) দিয়ে। জাপান থেকে ইয়েন আমদানি শুরু করি। জিজ্ঞেস করলাম– এটি কি কোনো ক্যামিক্যাল? বললেন– না, এটি তিন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সমন্বয়ে । এটি বাংলাদেশে কেবল আমিই আমদানি করে থাকি। থাইল্যান্ড থেকেও এটি আমদানি করা যায় এবং বর্তমানে আমি থাইল্যান্ড থেকেই বেশি আমদানি করছি। এটি ইনঅ্যাকটিভ অবস্থায় আমদানি করা হয় এবং ব্যবহারের আগে অ্যাকটিভ করে নিতে হয়। নিউক্লিক অ্যাগার, চিটাগুড় ও পানির মিশ্রণে নিয়ে ইয়েনকে অ্যাকটিভ করতে হয়। এই পানিতে আবার ক্লোরিন, লবণ ও আয়রন থাকতে পারবে না, থাকলে ব্যাকটেরিয়া মরে যাবে। এরপর এক টন গোবরের সঙ্গে এক লিটার ইয়েন মিশিয়ে এই জৈবসার তৈরি করা হয়। এক লিটার ইয়েন তৈরিতে খরচ পড়ে ১০ টাকা। এক টন মেগা অর্গানিক জৈব সার উৎপাদনে খরচ পড়ে এক লাখ টাকা আর তা বিক্রি করি দেড় লাখ টাকায়। এটি এখন আমাদের একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেখাশোনা করে। আমি বর্তমানে পাঁচটি কারখানার ডিরেক্টর। নতুন করে এখন এই শুঁটকি কারখানা গড়ে তুলছি। জানতে চাইলাম– আপনারা তো এরই মধ্যে ডব্লিউএফপি-কে শুঁটকি সরবরাহ করছেন; থাইল্যান্ডে চিংড়ির শুঁটকি রফতানি করছেন; স্পেন ও ফ্রান্সে রফতানির ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন; তো এমন এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে এই শুঁটকির ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনি কতটা আশাবাদী। জবাবে বললেন– আমি খুবই আশাবাদী। আমাদের শুঁটকি পুরোপুরি স্বাস্থ্যসম্মত। এতে কোনো রাসায়নিক মেশানো হয় না। আমাদের গোটা ব্যবস্থাপনা, শুঁটকি উৎপাদন এবং গুণগত মান যেভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাতে আমি খুব আশাবাদী খুব শিগগিরই আমরা ইউরোপের বাজারে প্রবেশ করতে পারব। ইউরোপ যেসব ক্যাটাগরি বিচার করে শুঁটকি আমদানি করে তাতে আমরা সহজেই উতরে যেতে পারব। ইউরোপ আমাদের দেশ থেকে শুঁটকি নিচ্ছে না মূলত শুঁটকিতে ইকোলা ও সালমোনিয়া নামের দুটি ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতির কারণে। এই দুটি ব্যাকটেরিয়ার কারণে টাইফয়েড হয়। আমাদের দেশের অন্য শুঁটকি

... ইসমাইল জানালেন, জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের শুঁটকির ক্রেতা। খুব উৎসাহ নিয়ে জানতে চাইলাম কবে থেকে এই বিশ্বসংস্থা তাদের শুঁটকি কিনছে। জানালেন– ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে এক ক্রয়চুক্তির মাধ্যমে তারা তাদের কাছ থেকে শুঁটকি কিনছে।...

থাইল্যান্ডের এক ক্রেতা বেশ কয়েক দফা এসে আমাদের শুঁটকির নমুনা নিয়ে গেছে, এবং তারা সন্তুষ্ট।...

এ ছাড়া স্পেন এবং ফ্রান্সের দুই দল ক্রেতার সঙ্গেও কথা চলছে। স্পেনের এক ক্রেতা ৯৮২০০ ডলারের ইনভয়েসও করে রেখেছে।

উৎপাদনকারীরা যে পরিমাণে লবণ ও রাসায়নিক ব্যবহার করে তাতে এই দুটি ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্মে। কিন্তু আমরা শুঁটকি তৈরিতে কোনো রকমের রাসায়নিক এবং লবণ ব্যবহার করি না। এজন্য আমাদের শুঁটকিতে কোনো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না। ইলিশের একটি শুঁটকি তুলে রোদের দিকে ধরে দেখিয়ে বললেন– দেখুন কত স্বচ্ছ! অথচ বাজারের শুঁটকি দেখবেন এমন ঘোলা যে ভেতরে কালো-অন্ধকার দেখা যায়। বাইরে থেকে এক কেজি লইট্যা শুঁটকি কিনলে আপনি যে পরিমাণে শুঁটকি পাবেন আমাদের এখান থেকে ৪০০ গ্রাম লইট্যা শুঁটকি কিনলে সে পরিমাণে শুঁটকি পাবেন। মূল ব্যাপার হচ্ছে বাজার বা সাগর থেকে মাছ ধরে আসা জেলেদের কাছ থেকে মাছ সংগ্রহ করে ওয়াশরুমে সেগুলো খুব ভালো করে পরিষ্কার করে প্রসেসিং করতে হবে এবং এই ড্রায়ার (ড্রায়ারগুলোর দিকে দেখিয়ে) পর্যন্ত আসতে যেন একটিও মাছি বসতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। একটি মাছি বসতে পারলেই সর্বনাশ! একটি মাছি সাড়ে সতেরো হাজার ডিম দেয়। এক টন মাছে একটি মাছি বসলেই যথেষ্ট। আমাদের এই ড্রায়ারগুলোতে একটি মাছিও বসতে পারে না। এবার ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম ড্রায়ারগুলো। ফাইবার গ্লাসপেপারে ছাওয়া ছোট ছোট দোচালা ঘরের মতো দেখতে। প্রতিটি ড্রায়ারে একটি করে বড় একজস্ট ফ্যান। এরপর মুকুল সারা ছাদে খোলা হাওয়ায় শুকাতে থাকা বিভিন্ন মাছের শুঁটকিগুলোর দিকে দেখিয়ে বললেন, এগুলো সব বাতিল করা মাছ। এগুলো আমরা স্থানীয় বাজারগুলোতে বিক্রি করি। চট করে জিজ্ঞেস করলাম– তার মানে আপনারা বিদেশিদের জন্য মানসম্মত শুঁটকি তৈরি করে দেশের মানুষকে মাছি-বসা জীবাণুযুক্ত শুঁটকি খাওয়াচ্ছেন? তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন– মোটেও না। এগুলো মানুষের খাবারের জন্য নয়। এগুলো ব্যবহার করা হয় পোল্ট্রি ও ফিশফিড তৈরিতে। পোল্ট্রি ও ফিশফিডের আমিষের জোগান দেয় এসব শুঁটকি। বললাম– তা হলে এগুলোকে তো বাই-প্রোডাক্ট বলতে পারি, নাকি? জবাবে বললেন– অবশ্যই। এগুলো থেকে মূলত আমরা বাড়তি আয় করে থাকি। আমরা এ পর্যন্ত যত বিনিয়োগ করেছি সে নিরিখে এখনো লাভে আসতে পারিনি। যন্ত্রপাতি, ড্রায়ার, মাছ কেনা, কর্মচারীর বেতন, এবং এ মাস থেকে কক্সবাজারের লাবনী পয়েন্টে একটি আউটলেট খুলেছি– সব মিলে প্রায় ৫০/৬০লাখ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়েছে। তবে খরচ

প্রায় উঠে এসেছে, এ মাস থেকে লাভ পেতে থাকব বলে আশা করছি। আমাদের হাতে যত অর্ডার আছে তাতে এখন থেকে মাসে কমপক্ষে ২ লাখ টাকা করে লাভ করতে পারব বলে আশা করছি। যেভাবে এগুচ্ছি তাতে একটা পর্যায়ে আমরা মাসে ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকা লাভ করতে পারব। আর পুরো অটোমেশনে যেতে পারলে এবং ইউরোপের বাজারে সফল হতে পারলে মাসে ১ কোটি টাকা লাভ করা কোনো ব্যাপারই নয়।

মুকুলের মুখে এমন আশার কথা শুনে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আরো একটি অনুষঙ্গ যোগ হতে যাচ্ছে ভেবে আমার মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। এবার ফিরলাম আমাদের এই গোটা তথ্য সংগ্রহ অভিযানের পথপ্রদর্শক এবং এই শুঁটকি উদ্যোগের অন্যতম অংশীদার বদরুল আলম রিশাদের দিকে। তথ্য সংগ্রহের মূল ছকটি নিয়ে তার মুখোমুখি হলাম। তিনি তার তিন ব্যবসায়ী শরিকের পক্ষ থেকেই তথ্য দিলেন।

এই তিন তরুণ উদ্যোক্তার নাম, বদরুল আলম রিশাদ, মুকাদ্দেসুর রহমান মুকুল এবং মো. ইসমাইল হোসেন। বয়স যথাক্রমে ৩৭ বছর, ৩৬ বছর ও ৩২ বছর।

বদরুল আলম রিশাদের স্ত্রীর নাম আফরোজা খায়ের, একমাত্র মেয়ে বুশরা আলম কেজি ওয়ানে পড়ে; মুকাদ্দেসুর রহমান মুকুলের স্ত্রীর নাম আরফু, একমাত্র ছেলে– ক্লাস ফোরে পড়ে, একমাত্র মেয়ে এখনো শিশু, স্কুলে যায় না; মো. ইসমাইল হোসেনের স্ত্রীর নাম জোনাকি আক্তার, একমাত্র মেয়ে এখনো ছোট্ট শিশু, স্কুলে যায় না।

তাদের এই উদ্যোগের নাম 'আপডেট অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড'। এই উদ্যোগের ধরনটা হচ্ছে বিষমুক্ত নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ। তারা তাদের এই বিষমুক্ত নিরাপদ শুঁটকির উৎপাদন শুরু করেছেন ২০১২ সাল থেকে। শুরু করার সময় তাদের প্রাথমিক পুঁজি ১০ লাখ টাকা। এর পুরোটাই তাদের নিজস্ব পুঁজি। এ কয় বছরে তা বেড়ে তাদের বর্তমান পুঁজি দাঁড়িয়েছে ৬০ লাখ টাকায়। এই উদ্যোগের জন্য এখনো তারা কোনো ঋণ নেননি।

জিজ্ঞেস করলাম তাদের এই উদ্যোগটি প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল কিনা, না থাকলে কতদিন পর থেকে লাভের মুখ দেখছেন? একটু ভেবে নিয়ে রিশাদ বললেন, প্রথম থেকে লাভজনক ছিল না। বছর দুয়েক পর থেকে

এই ওয়াশ রুমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ ধুয়ে লবণমুক্ত করা হয়

'পুঁজির অভাব তো একটা প্রতিবন্ধকতা বটেই, তা ছাড়া আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছি না, যেটি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ এবং টিকে থাকার ব্যাপারে এক বড় প্রতিবন্ধকতা। এখনো এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সক্ষম হইনি।'

একটু একটু লাভ হতে থাকে। তবে এখন থেকে লাভের মুখ দেখব বলে দৃঢ়ভাবে আশাবাদী আমরা।

প্রথম অবস্থায় প্রবৃদ্ধির হার কেমন ছিল জানতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে বললেন– প্রথম অবস্থায় তো কোনো লাভই ছিল না। এরপর জানতে চাইলাম এখন পর্যন্ত যে হারে লাভ করতে পারছেন তাতে তারা সন্তুষ্ট কিনা। জানালেন, 'এখনো বলার মতো তেমন মুনাফা নেই। তবে ভবিষ্যতে বেশ ভালো লাভ করা যাবে বলে আশা রাখছি।'

জানতে চাইলাম– এ উদ্যোগে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন তা কি আপনাদের নিজস্ব, নাকি কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ গুণ অর্জন করেছেন? কোনো দ্বিধা না করেই বললেন, 'আমাদের তিনজনের নিজস্ব। আমার দুই অংশীদারই ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ভালো অভিজ্ঞতা অর্জন করে এই উদ্যোগে এসেছিলেন।'

কোন ভরসায় তারা এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন জানতে চাইলে বললেন, 'আমরা তিনজনই জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করতাম। তাই এই জৈব পদ্ধতিই আমাদের ভরসার স্থল।'

প্রথম অবস্থায় কীভাবে বাজারজাত করতেন জানতে চাইলে বললেন– 'প্রথম অবস্থায় স্থানীয় বাজার, অর্থাৎ শুধু কক্সবাজারেই বাজারজাত করতাম।' এরপর জানতে চাইলাম, এখন কীভাবে বাজারজাত করছেন? বললেন, 'বর্তমানে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির পক্ষ থেকে প্রতিমাসে আমাদের কাছ থেকে দেড় টন শুঁটকি কেনা হচ্ছে। থাইল্যান্ডে চিংড়ির শুঁটকি বাজারজাত করছি। বাংলাদেশের একটি অনলাইন শপিং প্রতিষ্ঠান আমাদের শুঁটকি বাজারজাত করছে। কক্সবাজারে নিজস্ব আউটলেট খুলেছি, সেখান থেকে সরাসরি বিক্রি ছাড়াও অর্ডার নিয়ে থাকি।'

তারপর তার কাছে জানতে চাইলাম বাজার সম্প্রসারণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? জানালেন, 'নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে ক্রেতা আকর্ষণের মাধ্যমে সারাবিশ্বে বাজার সম্প্রসারণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অনলাইনে আমাদের শুঁটকির ছবি এবং গুণগত মানের বর্ণনা পড়ে স্পেন, ফ্রান্স, চীন, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব থেকে ক্রেতারা যোগাযোগ করছেন। এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে প্রবেশের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদফতর এবং কক্সবাজারস্থ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

তাদের পণ্যের চাহিদা কেমন জিজ্ঞেস করায় বললেন– 'বেশ ভালো, বিশেষ করে সচেতন ভোক্তাদের কাছে।'

তারা এখন স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা জানতে চাইলে বললেন, 'ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এখনো সেভাবে পারছি না মূলত পুঁজির অভাবে।'

এ ধরনের উদ্যোগ কেন গ্রহণ করলেন জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'এ ধরনের উদ্যোগে কোনো লোকসান নেই। তা ছাড়া বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশে এখনো আমাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই– এটাও এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের একটা কারণ। এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি এ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল।'

এ পর্যন্ত উঠে আসতে আপনাকে কী কী করতে হয়েছে জানতে চাইলে রিশাদ জানালেন 'আমাদের সবাইকেই অনেক অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এ অবস্থানে আসতে হয়েছে। আমার নিজেকে যেভাবে এ পর্যায়ে আসতে হয়েছে সংক্ষেপে এখানে তাই বলে যাচ্ছি – থাকতাম কুমিল্লায়। পড়তামও কুমিল্লায়। কিন্তু মনের ভেতরে অদম্য ইচ্ছে ছিল ঢাকা কলেজে পড়বো। বাবাকে আমার এ ইচ্ছের কথা অনেক বলেছি, কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো সহায়তা না পেয়ে জেদের বশে ১৯৯৯ সালে ঢাকার বনানীতে বার্ডস মাল্টি মডেল নামে একটি প্রতিষ্ঠানে মাসে আড়াই হাজার টাকা বেতনে পিওনের চাকরি নিই এবং ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। সেখান থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করি। এরপর ঢাকার পান্থপথের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে মার্কেটিং-এ এমবিএ করি। তারপর বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে আমার পিঠেপিঠি ছোট বোনকে ডাক্তারি পড়িয়েছি এবং তারও ছোট বোনকে বিবিএ পড়িয়েছি এবং এ দুই বোনকে বিয়ে দিয়েছি। ২০০৯ সালে বাবা আমাকে বিয়ে দিয়েছেন। এ সময়ে চাকরির পাশাপাশি ভ্যানে যারা পোশাক ফেরি করে বিক্রি করে তাদের কাছে গার্মেন্টসের স্টক থেকে পোশাক কিনে বিক্রি করেছি। সেই ব্যবসার লাভ থেকে খাগড়াছড়ির দিঘিনালায় ১০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে বাউকুল ও আপেলকুলের চাষ করি। প্রথম বছর এ থেকে ৪০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল। পাশাপাশি সেখানে হলুদও চাষ করতাম, তাতে ২০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল। কিন্তু ২ বছর পর বুনো হরিণ সে বাগান নষ্ট করে দেয়। এরপর ২০০৬ সালে পুরনো গাড়ি কেনা-বেচার ব্যবসা শুরু করি। ২ বছর সে ব্যবসা করেছিলাম। মোটামুটি লাভজনক ছিল সে ব্যবসা। এ সময় পত্রিকার বিজ্ঞাপন জোগাড় করেও কিছু বাড়তি লাভ করতাম। এরপর একজন ফাইন্যান্সিং পার্টনার নিয়ে একটি মার্কেটিং কোম্পানি খুলি। সেখানে পার্টনারের ১০ লাখ এবং আমার ১০ লাখ মোট ২০ লাখ টাকার বিনিয়োগ ছিল। ২০০৯ সালে দুইটি মাইক্রোবাস কিনে ভাড়ায় খাটাতাম। ২০১৩ সালে দিনাজপুরে এই মাইক্রোবাস দুটিকে মালামাল পরিবহনের কাজে লাগাই। কিন্তু ২০১৪ সালের লাগাতার অবরোধে ভীষণ লোকসান হতে থাকে। তখন ভাবতে থাকি কী করা যায়। অনেক খোঁজখবর নিয়ে তখন এই শুঁটকি ব্যবসায় যোগ দিই।

এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা কী কী জানতে চাইলে বললেন, 'পুঁজির অভাব তো একটা প্রতিবন্ধকতা বটেই, তা ছাড়া আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছি না, যেটি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ এবং টিকে থাকার ব্যাপারে এক বড় প্রতিবন্ধকতা। এখনো এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সক্ষম হইনি।'

নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে জানতে চাইলে বললেন, 'নতুন অনেক উদ্যোক্তার দরকার এই ধরনের নিরাপদ শুঁটকি প্রস্তুত ও বিপণনে। তাই নতুন উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান– এই ব্যবসায় বিনিয়োগ করুন এবং বিশ্ববাজারে দেশের শুঁটকিকে জনপ্রিয় করে তুলুন।'

প্রযুক্তি প্রসঙ্গে বললেন, 'আমাদের প্রযুক্তি মূলত ম্যানুয়াল, যদিও ওয়াশিং ও প্রসেসিং রুমে কিছু যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এখনো ব্যবহার করার অবস্থানে পৌঁছতে পারিনি।'

তাদের জনবল মোট ২৫ জন। তবে মাছ ধরার মওসুমে ৫০ জনও লাগে। এদের মধ্যে ১০ জন দক্ষ।

তাদের হিসেব পদ্ধতি এখনো সেকেলে। এখনো খাতায় লিখে হিসেব সংরক্ষণ করেন। তবে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন– 'আমাদের এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।'

এরপর তাদের শুভ কামনা করে বিদায় নিলাম।

CIPRB
CIPRB
Lifeboats
Lifeboats
SeaSafe
eaSafe
uard Cox's Bazar

বাংলাদেশে প্রথম সার্ফিংবোর্ড তৈরি করেছেন

আলমগির হোসেন

সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ছুটে বেড়ানোর দুরন্ত এক জলখেলা সার্ফিং। সাগর-মহাসাগরের তল থেকে কী যেন কোন আক্রোশে ফুঁসে ওঠা বিশাল-ভয়ঙ্কর ঢেউকে পায়ের নিচে রেখে সার্ফারগণ অদম্য সাহসে ওড়াতে থাকেন মানব-কেতন। সারাবিশ্বেই এটি এখন খুব জনপ্রিয় ও চ্যালেঞ্জিং জলখেলা। বাংলাদেশের তরুণরাও এখন পিছিয়ে নেই এই দুরন্ত খেলায়। আলমগির হোসেন এমনই এক তরুণ। সার্ফিং প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নিয়ে আসছেন তিনি। গতবছর জাতীয় সার্ফিং প্রতিযোগিতায় চতুর্থ হয়েছেন। তো এক পর্যায়ে তিনি ভাবলেন নিজেই তৈরি করে নেবেন নিজের সার্ফিংবোর্ড এবং সত্যিই এই মহাকর্মটি করে বাংলাদেশের প্রথম সার্ফবোর্ড তৈরির মর্যাদার আসনটি নিজের করে নিলেন।

সারাবিশ্বে শৌখিন পর্যটকদের কাছে সার্ফিং এখন শুধু জনপ্রিয় জলক্রীড়াই নয়, মর্যাদার প্রতীকও। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার। স্বাভাবিক কারণেই বিদেশি পর্যটকরা বহু বছর ধরেই এখানে এসে সার্ফিং করে থাকেন। তাদের দেখে দেখে বাংলাদেশের তরুণরাও এক সময় সার্ফিং শুরু করে। আলমগির হোসেন পেশাগত কারণে সৈকতে থেকে সার্ফিং শিখে ফেলেন। তবে বাংলাদেশের অন্য সার্ফারদের সঙ্গে তার পার্থক্য হচ্ছে তিনি নিজেই এক সময় নিজের সার্ফিংবোর্ড তৈরি করে ফেলেন। উৎসাহী উদ্যোক্তাদের যেন তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন– শুধু সার্ফিংবোর্ডই নয়, স্পিডবোট, সেইলিংবোট, ক্যানুবোট ইত্যাদি প্রস্তুতের কারখানাও করা সম্ভব এই বাংলাদেশে।

৮ জানুয়ারি কক্সবাজারের লাবনী পয়েন্টে সন্ধ্যায় যখন চা খাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ করেই এক তরুণকে নিয়ে হাজির হলেন রিশাদ। কিছুটা বেঁটে আকারের সুঠামদেহী তরুণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রিশাদ জানালেন– ওর নাম আলমগির হোসেন। একজন বে-ওয়াচার, সার্ফার এবং বাংলাদেশের প্রথম সার্ফিংবোর্ডের প্রস্তুতকারী। এখনো উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেনি ঠিকই, কিন্তু সময়োপযোগী এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় এক শিল্প-উদ্যোগের স্বর্ণালি পূর্বাভাস আঁচ করতে পারছিলাম এই তরুণকে ঘিরে। পরিচয়পর্ব সেরে তাই সময় নষ্ট না করে তখনি ছুটলাম এই তরুণের সার্ফিংবোর্ড দেখতে।

সার্ফিং কী, কোথায়, কবে থেকে

সার্ফিং হচ্ছে পানির উপরতলের এক খেলা। সার্ফাররা উপকূলের দিকে ধেয়ে আসা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ভেসে এই খেলা খেলে থাকে। কে প্রথম সার্ফিংয়ের প্রচলন করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে কয়েক শতাব্দী ধরে পোলিনেশীয় সংস্কৃতির এটি প্রধান অনুষঙ্গ। ১৭৬৭ সালে ডলফিন নামের এক জাহাজে করে স্যামুয়েল ওয়ালিস এবং তার সহযাত্রীরা প্রথম ব্রিটিশ অভিযাত্রী হিসেবে টাহিতিতে পৌঁছেন এবং প্রথম এই সার্ফিংখেলা দেখতে পান। ১৮৬৬ সালে মার্ক টোয়েন হাওয়াই দ্বীপ ভ্রমণ করে লেখেন– '... দ্বীপটির এক জায়গায় এসে আমরা স্থানীয় উলঙ্গ নারী-পুরুষের একটি বড় দলের দেখা পাই। তারা পানিতে সার্ফিং-স্নান করে খুব ফুর্তি করছিল।' তবে আধুনিক সার্ফিংয়ের জনক বলে গণ্য করা হয় জর্জ ফ্রিথকে (৮ নভেম্বর, ১৮৮৩ – ৭ এপ্রিল, ১৯১৯)। প্রথম পেশাদার সার্ফিং প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৯৭৫ সালে। সে বছরই প্রথম নারী পেশাদার সার্ফারের স্বীকৃতি পান মার্গো ওবের্গ।

তার বাড়ির দিকে যেতে যেতে জানতে চাইলাম তার নিজের সম্পর্কে। তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে যেতে থাকলেন। তার স্বঃতস্ফূর্ততায় মিশে ছিল সৃষ্টিসুখের পরশ, নতুন কোনো কবিতা বা গল্প লিখে অন্যকে শোনানোর প্রবল-আকুতি। জানালেন– তার নাম যে আলমগির হোসেন তা আগেই জানিয়েছিলেন, এবার জানালেন বাবার পরিচয়। তার বাবার নাম ফজলুল কাদের, যিনি পেশায় একজন মৎস্য ব্যবসায়ী। এরপর তার নিজের পেশা সম্পর্কে জানতে চাইলে জানালেন– তিনি একজন লাইফগার্ড, যাদের কর্মদক্ষতাকে প্রতিফলিত করে নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত টিভি সিরিয়াল বে-ওয়াচ। পালাক্রমে রোজ আটঘণ্টা দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে সেখানে। সমুদ্রস্নানে আসা পর্যটকদের ওপর নিরাপত্তামূলক নজরদারি, তাদের বিপদে-আপদে ছুটে যাওয়া– ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে সেই আট ঘণ্টা। জানতে চাইলাম–

Surf Shope, Cox's Bazar
www.facebook.com/bangladeshmakesurfboardandrescueboard
2016
NTERNATIONAL

প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় সার্ফ ইন্টারন্যাশনালের একজন সদস্য মার্কিন নাগরিক জ্যাফের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তার কাছ থেকে আমি এই টেশনিক্যাল ব্যাপারগুলো শিখে নিয়েছি। তিনি আমাকে খুব সহযোগিতা করেছেন। এমনকি প্রথম বোর্ডটি তৈরির প্রায় পুরোটা সময় তিনি আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন। আমরা দুজনে মিলে প্রথম বোর্ডটির আকার দিয়েছিলাম। তিনি একপাশ তৈরি করেছেন, আমি অন্যপাশ। তখন তিনি আমার কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন– 'তুমি পারবে। লেগে থাকো।'

এটি স্থায়ী না অস্থায়ী চাকরি? জানালেন এটি তার স্থায়ী চাকরি। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখলেন– এই চাকরির পাশাপাশি তিনি সার্ফিংবোর্ড তৈরি করে বাড়তি আয় করতে চান। জিজ্ঞেস করলাম লেখাপড়া কোন পর্যন্ত করেছেন। একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে জবাব দিলেন– ক্লাস এইট পর্যন্ত।

এরই মধ্যে আলমগিরদের বাড়িতে চলে এসেছিলাম। গাড়ি থেকে নেমে বেশ সরু এক গলিতে ঢুকে তার পিছু পিছু মিনিট দুয়েক হাঁটার পর তাদের বাড়িতে পৌঁছলাম।

নিচু ছাদের একতলা বাড়ি। দেয়ালগুলো পাকা, ছাদটা টিনের। যে ঘরে তার সার্ফিংবোর্ডগুলো রাখা সেটি বন্ধ এবং অন্ধকার ছিল। আলমগির বাতির সুইচ অন করতেই আলোতে ঝলমলিয়ে উঠল তার তৈরি সার্ফিংবোর্ডগুলো। ঝটপট ছবি তুলে নিলাম আমি। এরপর তার সার্ফিংবোর্ড তৈরির যন্ত্রপাতি দেখাতে বললে একগাল হাসি দিয়ে জানালেন– এগুলো তৈরিতে তো কোনো যন্ত্রপাতি লাগে না তেমন! বাইরে দরজার পাশে একটি স্ট্যান্ড আছে কাঠের, ওটিতে তৈরি করি। চলুন দেখাই। তার সঙ্গে গিয়ে দেখলাম কাঠের বেঞ্চের মতো একেবারেই মামুলি একটি স্ট্যান্ড, যেটিতে তিনি এই চমৎকার উদ্ভাবনী কর্মটি করেছেন। স্ট্যান্ডটির পাশে তাকে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে নিলাম। তারপর চলে এলাম আগের ঘরটিতে এবং আমার বাকি কৌতূহল মেটাতে থাকলাম। প্রথমে জানতে চাইলাম তার সার্ফিং-এর ইতিহাস। জানালেন– ২০০৫/৬ সাল থেকে বাংলাদেশের ছেলেরা কক্সবাজার সৈকতের কাছকাছি সমুদ্রের ঢেউয়ে সার্ফিং শুরু করে। সৈকতের কাছেই বাড়ি। ছোটবেলা থেকেই সাগরপাড়ে এসে ফুঁসে ওঠা ঢেউয়ের ফনাকে পদানত করে সার্ফিং করতে দেখতেন সাহসী তরুণদের। দেখে দেখে তারও এভাবে সার্ফিং করার সাধ জাগত মনে। বড় ভাইয়াদের পিছু পিছু ঘুরে সুযোগ খুঁজতেন সার্ফিংবোর্ডে পা রাখার। ২০১১ সালে কৈশোরে পা রেখেই সুযোগটা মিলে গেল। এক বছর পরেই নেমে পড়লেন জাতীয় সার্ফিং প্রতিযোগিতায়। ২০১৫ সালের প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ হলেন এবং পরের বছরই নিজের বানানো বোর্ড নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমে চতুর্থস্থান দখল করলেন। সার্ফিংয়ের নেশায় লেখা-পড়া লাটে উঠেছিল। সচ্ছল নয় পরিবার। তাই আয়ের পথ খুঁজতে হলো। কিন্তু সাগরের মায়া ছাড়তে পারলেন না। ২০১৩ সালে সৈকতে ভাড়ায় জেটস্কি (সাগরের তীরের কাছাকাছি ওয়াটারবাইক চালানোকে জেটস্কি করা বলা হয়) করানোর কোম্পানি 'হাসানউল্লা'য় চাকরিতে যোগ দেন। এ ক্ষেত্রে সার্ফিং দলের সদস্য হওয়ায় তার চাকরি পেতে সহজ হয়েছিল। এ চাকরি শুধু তার কর্মসংস্থানই করেনি, পথ বাতলে দিয়েছে সার্ফিংবোর্ড তৈরিরও। ২০১৪ সালের মে মাসে তিনি লাইফগার্ড হিসেবে কাজে যোগ দেন। এরপর আমি তার সার্ফিংবোর্ড তৈরির গল্পটা শুনতে চাইলাম। জানতে চাইলাম– আপনার মাথায় এমন সৃষ্টিশীল ধারণাটা কী করে এলো? যেহেতু আপনি সার্ফিং করেন তাই নিজের বোর্ডটি নিজেই বানিয়ে নেবেন- এমন চিন্তা

থেকেই কি? জবাবে বললেন– আমরা সার্ফিং করার জন্য এখানে যে বিদেশি পর্যটকেরা এসে সার্ফিং করে, একটি বোর্ডের জন্য প্রায়ই তাদের কাছে ধরনা দিতাম। তো এভাবে চেয়েচিন্তে সার্ফিং করার সময় অনেক বিদেশি বলতেন– তোমরা নিজেরা কেন নিজেদের বোর্ড তৈরি করে নাও না? সেই থেকে আমার মাথায় ঘুরছিল– কী করে একটি সার্ফিংবোর্ড তৈরি করা যায়! 'হাসানউল্লা' জেটস্কি (ওয়াটারবাইক) কোম্পানিতে চাকরি করার সময় দেখতাম, বালুর ঘষায় প্রায়ই কোনো না কোনো ওয়াটারবাইকের তলা ফেটে যেত। ওখানে আমার যিনি ওস্তাদ ছিলেন তিনি এগুলো এক ধরনের কেমিক্যাল দিয়ে মেরামত করতেন। খুব কৌতূহল নিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম– ওগুলো কী ওস্তাদ? ঐ যে, যেগুলো দিয়ে ওয়াটারবাইকগুলো মেরামত করছেন? ওস্তাদ জবাব দিতেন– এগুলো দিয়েই তো তৈরি হয় এই ওয়াটারবাইকগুলো। শুধু ওয়াটারবাইকই নয়, সার্ফিংবোর্ড, স্পিডবোট, সেইলিংবোট, ক্যানুবোট– এই সবকিছুই তৈরি হয় এই জিনিস থেকে।

আলমগির তখন নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করেন, এগুলো দিয়ে তা হলে সার্ফিংবোর্ড তৈরি করা যাবে বলছেন? ওস্তাদ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালে আলমগির ব্যাপারটাকে মাথায় গেঁথে রাখেন। তো একদিন ওস্তাদ কাজে আসেননি, অথচ একটি ওয়াটারবাইক মেরামত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। সেদিন আলমগির ওস্তাদকে দেখে দেখে শেখা বিদ্যায় বাইকটি মেরামাত করে ফেললেন। সেদিন থেকেই তার মনোবল দৃঢ় হলো যে তিনি এই জিনিস দিয়ে কাজ করতে পারবেন। এভাবেই তিনি ফোম থেকে ফাইবারগ্লাস তৈরি এবং তা দিয়ে কাজ করার পদ্ধতি শিখে ফেলেন। ধীরে ধীরে নিজের ওপর তার আস্থা তৈরি হলো যে, তিনি সার্ফিংবোর্ডও তৈরি করতে পারবেন। এরপর সে চাকরি ছেড়ে লাইফগার্ডের চাকরি নেয়ার পর থেকেই তিনি তার ইচ্ছে পূরণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। "ফাইবারগ্লাস তৈরির ফোম জোগাড় করার জন্য আমি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি চিংড়ি হ্যাচারির মাদার কন্টেইনার এই ফাইবারগ্লাস দিয়ে তৈরি হয়। এটি তৈরিতে ওরা যেখান থেকে কাঁচামাল অর্থাৎ ফোম কেনে সেখান থেকে ফোম সংগ্রহ করি। এ পর্যায়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম– এটি তো তৈরি করলেই হলো না, নির্দিষ্ট মাপের এবং ওজনের হতে হবে ঢেউয়ের ওপর সঠিকভাবে ভেসে থাকার জন্য। একজন সার্ফার হিসেবে এসব তো আপনার জানা। তো সার্ফিংবোর্ড তৈরির সেই টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো কিভাবে শিখলেন? প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় সার্ফ ইন্টারন্যাশনালের একজন সদস্য মার্কিন নাগরিক জ্যাফের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তার কাছ থেকে আমি এই টেশনিক্যাল ব্যাপারগুলো শিখে নিয়েছি। তিনি আমাকে খুব সহযোগিতা করেছেন। এমনকি প্রথম বোর্ডটি তৈরির প্রায় পুরোটা সময় তিনি আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন। আমরা দুজনে মিলে প্রথম বোর্ডটির আকার দিয়েছিলাম। তিনি একপাশ তৈরি করেছেন, আমি অন্যপাশ। তখন তিনি আমার কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন– 'তুমি পারবে। লেগে থাকো।' সোজা কথা– তিনি আমাকে হাতে-কলমে শিখিয়েছেন। এর পরের বোর্ডগুলো আমি নিজেই তৈরি করেছি। একেকটা সার্ফিংবোর্ড তৈরি করতে এখন আমার ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা খরচ পড়ছে।"

বাজারজাতকরণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে জানালেন এটির বাজার খুব সীমিত। দেশেও তেমন একটা চাহিদা নেই। তা ছাড়া একটি একটি করে হাতে তৈরি করছি বলে উৎপাদন খরচও পড়ছে বেশি। সারাবিশ্বেই যারা প্রফেশনাল সার্ফার তারা তাদের চাহিদামতো বোর্ডের জন্য অবশ্য হাতে তৈরি বোর্ডের ওপরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। সেজন্য আমি আমেরিকান সার্ফার ও ট্রেইনার জ্যাফের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি এবং তিনি আমাকে সব ব্যাপারে খুব সহযোগিতা করছেন। তার মাধমে আশা করছি বিদেশি পেশাদার সার্ফারদের কাছে আমার সার্ফিং বোর্ড বিক্রি করতে পারব এবং আরো অনেক বোর্ড বানানোর বায়না পাবো।

জিজ্ঞেস করলাম, সার্ফিংবোর্ডের হয়তো তেমন একটা বাজার নেই, কিন্তু আপনি যেহেতু এটি তৈরি করতে পেরেছেন তা হলে চেষ্টা করলে ক্যানুবোট, সেইলিংবোট ও স্পিডবোটও তৈরি করতে পারবেন, নাকি? জবাবে বললেন, কারিগরি ও পুঁজি সহযোগিতা পেলে হয়তো পারব। কিন্তু ক্যানু ও সেইলিংবোটের চাহিদা খুবই সীমিত, স্পিডবোটের চাহিদা থাকলেও অত বড় সাধ্য আমার নেই। আমি বরং লাইফগার্ডের চাকরিতে আরো মনোযোগী হতে চাই। পত্রিকায় পড়ে

সারাবিশ্বেই যারা প্রফেশনাল সার্ফার তারা তাদের চাহিদামতো বোর্ডের জন্য হাতে তৈরি বোর্ডের ওপরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। সেজন্য আমি আমেরিকান সার্ফার ও ট্রেইনার জ্যাফের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি এবং তিনি আমাকে সব ব্যাপারে খুব সহযোগিতা করছেন। তার মাধমে আশা করছি বিদেশি পেশাদার সার্ফারদের কাছে আমার সার্ফিং বোর্ড বিক্রি করতে পারব এবং আরো অনেক বোর্ড বানানোর বায়না পাবো।

হয়তো জেনেছেন– এই কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে প্রায়ই অনেক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। সাঁতার কাটতে গিয়ে নিভে যায় অনেক সম্ভাবনাময় তাজাপ্রাণ। এই দুর্ঘটনার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী বাবা-মা। তারা সচেতন হলে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই এড়ানো সম্ভব। আমি চাই একজন লাইফগার্ড হিসেবে এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে। বে-ওয়াচ সিরিজ দেখে এবং আমার প্রিয় তারকা ডেভিড হ্যাসেলহফের উদ্ধার তৎপরতা দেখে আমি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। কিন্তু আমাদের লোকবল প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম বলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেভাবে পারছি না। কক্সবাজারে ৫/৬টা সৈকত পয়েন্ট থাকলেও আমাদের লোকবল মাত্র ১৯ জন। এই লোকবল নিয়ে আমরা কেবল লাবনী ও সুগন্ধা পয়েন্টে পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য নজরদারি করতে পারি। ঐ দুইটি পয়েন্টে আমরা শুক্র ও শনিবার ৪জন করে এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিনে সকাল-বিকেল মাত্র ৩জন করে ডিউটি করি। ■

হ্যান্ডমেড পেপারকে
শিল্পে পরিণত করেছেন

গাজী আব্দুর রব

ব্যবহৃত হচ্ছে দেশের সব চারুকলা শিক্ষালয়ে রফতানি হচ্ছে বিদেশেও

হ্যান্ডমেড পেপার! শুনে অনেকেরই হয়তো ভুরু কুঁচকে উঠবে। নাকও সিটকাবেন কেউ কেউ। কণ্ঠে বিদ্রূপের হুল ফুটিয়ে হয়তো বলে উঠবেন– ও! হ্যান্ডমেড পেপার? প্রযুক্তির চরম বিকাশের এই সর্বাধুনিক যুগে? হ্যান্ডমেড পেপার তো সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে মিশরীয়রা তৈরি করত পেপিরাস গাছ দিয়ে। প্রাচীন আমলে কাগজ তৈরি করত চীনারাও। হ্যান্ডমেড পেপার বলতে হয়তো সে ধরনেরই কোনো কাগজ বুঝে থাকবেন অনেকে।

যারা হ্যান্ডমেড পেপার সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা পোষণ করেন তাদের অবগতির জন্য বলছি, জানেন কি এখন, প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষের যুগে সারা পৃথিবীর শিক্ষানবীশ, নবীন-প্রবীণ চিত্রশিল্পীরা ছবি আঁকার জন্য হ্যান্ডমেড পেপার ব্যবহার করেন? বিশ্বব্যাপী অভিজাত আমন্ত্রণপত্র, গ্রিটিংকার্ড, ভিজিটিংকার্ড ছাপা হয় এই হ্যান্ডমেড পেপারে? এ ছাড়া এটি দিয়ে কলমদানি, পেন্সিলদানি, ব্যাগ ইত্যাদিও তৈরি হয়?

দেশে এবং দেশের বাইরে এই পণ্যটির চাহিদা দিনদিন বাড়ছে। তাই উৎসাহী বিনিয়োগকারীরা এ খাতে বিনিয়োগ করলে লাভবান হতে পারবেন তা অনেকটা জোর দিয়েই বলা যায়। বাংলাদেশে এ খাতে এক সফল উদ্যোক্তা গাজী আবদুর রব। ফেনীর বিসিক শিল্প নগরীতে তার এই হ্যান্ডমেড কাগজের কারখানা। দেশের বাজারে তো বটেই তার হ্যান্ডমেড পেপার এখন ইউরোপ-আমেরিকায়ও রফতানি হচ্ছে।

তার কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছিলাম অনেক আগেই। তাই ১০ ডিসেম্বর কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ফেরার পথে সন্ধ্যায় ঢুঁ মারলাম ফেনীর চাড়িপুরের বিসিক শিল্পনগরীতে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে গাজী আবদুর রবের শতরূপা হ্যান্ডমিল পেপার মিলে যখন ঢুকলাম ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। নিচে বেশ কয়েকজন কর্মচারী কর্মব্যস্ত ছিল, বেশিরভাগই নারী-কর্মচারী।

নিচে কর্মরত কর্মচারীদের কাছে জানতে চাইলাম যে, আমরা তাদের মালিক জনাব গাজী আবদুর রবের সঙ্গে দেখা করতে চাই; তিনি কি আছেন? স্কেল মেশিনে কাজ করতে থাকা একজন পুরুষ কর্মী জানালেন– তিনি আছেন, তবে এখনি বেরিয়ে যাবেন। তিনি একজন নারী কর্মীকে ইশারা করতেই তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন দোতলার অফিসঘরে। গাজী আবদুর রব বেরিয়ে যাবেন বলে তার পোর্টফোলিও ব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। নিখুঁতভাবে ছাঁটা পাকা গোঁফ, পাতলা হয়ে যাওয়া সাদা-কালো চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখে

দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থান রবাবরই ভূমিকা রেখে চলেছেন গাজী আব্দুর রব। ছবিতে তারই প্রতিফলন

হ্যান্ডমেড পেপার তৈরির পদ্ধতি

হ্যান্ডমেড পেপার তৈরির পদ্ধতি মোটামুটি সহজ। অল্প বিনিয়োগেও এ ধরনের কাগজ উৎপাদন সহজ। পুরনো কাগজ, চট, তুলা ইত্যাদি সংগ্রহ করে প্রথমে ময়লামুক্ত করে নিতে হবে। সংগৃহীত কাগজগুলোকে পানিতে ভিজিয়ে বিটার মেশিন বা ব্লেন্ডারে মণ্ড তৈরি করে নেয়া যাবে সহজেই। চট ও সংগৃহীত অন্যান্য উপকরণকে ক্র্যাশিং মেশিনে তুলোর মতো করে নিতে হবে। তারপর এগুলোর সঙ্গে কাগজের মণ্ড নিয়ে পানিতে ভালো করে মিশিয়ে ভিজিয়ে রেখে সিদ্ধ করতে হবে। এর সঙ্গে বার্লি মিশিয়ে মিক্সি ফিল্টারে ছেঁকে ছাঁচে ঢালতে হবে, ৮০ জিএসএম পুরুত্বের কাঠের ফ্রেমের নিচে থাকা বাঁশের ছাকনির ওপর ঢেলে চাপ দিতে হবে। এরপর মণ্ড শুকিয়ে গেলে রোলার মেশিনে চাপ দিয়ে কাগজগুলোকে আরো মসৃণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে কাগজ তৈরির সাধারণ পদ্ধতি। এর সঙ্গে আরো যন্ত্রানুষঙ্গ যোগ করে উৎপাদন ও মান দুটোই বাড়ানো সম্ভব।

রিমলেস চশমা। তামাটে মুখমণ্ডলে কর্পোরেট-বসের অভিব্যক্তি স্পষ্ট। আমাদের দেখে চেহারায় বিরক্তি ফুটে উঠলেও হেসে অভ্যর্থনা জানালেন। এরপর পরিচিতিপর্ব সেরে তাকে আমাদের আসার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলার পর মনে হলো তার মনে ধরে গেল আমাদের লক্ষ্যটা। চেহারা থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বিরক্তির সব চিহ্ন। নির্মল হাসি ফুটে উঠল এক্সিকিউটিভ-গম্ভীর মুখটাতে। করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং খুব ঝাঁকিয়ে করমর্দন করে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। আমাদের উদ্দেশ্যকে বাহবা জানিয়ে বললেন তিনিও চাইছেন এ খাতে নতুন ও তরুণ উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসুক। দেশের এই এগিয়ে যাওয়ার সময়ে প্রগতির চাকার সঙ্গে তাদের অবদান জুড়ে নিতে পারলে গতি অনেক বেড়ে যাবে। এখানে, মানে এই বিসিক শিল্পপল্লীতে 'শুকতারা' নামের আরেকটি হ্যান্ডমেড পেপার মিল রয়েছে। জানালাম সেখানেও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বিকেল পাঁচটায় মিল ছুটি হয়ে যাওয়ায় গেট বন্ধ ছিল। কর্তাব্যক্তিরা কেউ ছিলেন না। সঙ্গত কারণেই দারোয়ান ঢুকতে দেয়নি। একটু মুচকি হেসে বললেন, ভালোই হয়েছে ঢুকতে পারেননি। এখন আপনারা ঠিক জায়গায় এসেছেন। গর্বের সঙ্গে বললেও বলার ধরনকে মোটেও ঔদ্ধত্য মনে হলো না। আমি ডায়েরি ও ফর্ম বের করতেই তিনি যেন বাস্তবে ফিরলেন। বিনয়ের সঙ্গেই বললেন, 'কিন্তু আমাকে যে ক্ষমা করতে হবে! অন্য একটা জায়গায় যাওয়ার

হ্যান্ডমেড পেপার মিল যেভাবে গড়ে তোলেন গাজী আব্দুর রব

বেশ ভালো বেতনে এবং উঁচুপদে চাকরি করতেন ম্যানোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (এমসিসি) নামে একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায়। অনেক আগে থেকেই হ্যান্ডমেড পেপার তৈরির স্বপ্ন দেখতেন। ছবি আঁকার জন্য হ্যান্ডমেড পেপার বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়– দেশের এই ঘাটতিটাই তার ভেতরে এই স্বপ্নের বীজ বুনে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক যে উন্নয়ন সংস্থার চাকরি করতেন, তাদের সুবাদেই ১৯৮৫ সালে ভারত ও নেপালে গিয়ে হ্যান্ডমেড পেপার তৈরির কারখানা দেখে আসেন। অনেক বইপত্র ঘেঁটেও এ ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। এর পর থেকে বাড়িতে কত ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই না করেছেন তিনি এ কাগজ তৈরির জন্য!

জানতেন, যে কোনো পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় অনেকটাই নির্ভর করে কাঁচামালের ওপর। তাই তিনি অত্যন্ত সহজলভ্য কাঁচামাল দিয়ে চেষ্টা করছিলেন। শেষমেশ কচুরিপানা, কড়ইগাছের পাতা, বর্জ্য পাট, বর্জ্য তুলা, কাঁচা ঘাস, চা-পাতা, ধানের তুষ ইত্যাদি ফেলনা জিনিসকে বেছে নিলেন কাঁচামাল হিসেবে। দীর্ঘ পাঁচ বছর চেষ্টার পর অবশেষে সফল হয়েছিলেন। তখন থেকেই বাণিজ্যিকভাবে এটি তৈরির পথ খুঁজছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে অতটা পুঁজি বিনিয়োগের সক্ষমতা তার ছিল না। সুযোগটা পেয়ে গেলেন তার সংস্থার সূত্রেই। সংস্থাটি দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য কিছু করতে চাইছিল। দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে হ্যান্ডমেড পেপার মিল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হলে তিনি থাকলেন তা বাস্তবায়নের প্রথম কাতারে। এভাবেই গোড়াপত্তন হয়েছিল 'শুকতারা হ্যান্ডমেড পেপার মিলে'র। এবার উৎপাদনের সব আয়োজন হাতের নাগালে পেয়ে নিজের দক্ষতা বাড়াতে থাকলেন। একই সাথে মনের গোপন বাসনাকে অবয়ব দিতে নিজেই কিভাবে এমন একটি মিল গড়ে তুলতে পারেন সেই উপায় খুঁজতে থাকলেন। কিছু কিছু করে জমাতে থাকলেন টাকা। সাগ্রহ অপেক্ষায় থাকেন বিসিক শিল্পপল্লীতে ঠাঁই করে নেয়ার সুযোগের। শেষতক সুযোগটা মিলে যায় এবং যন্ত্রপাতি, অবকাঠামোসহ ১৮ হাজার ৮০০ বর্গফুট জায়গা পেয়ে যান বিসিক থেকে। যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো বাবদ বিসিকে তার ঋণ ধরা হয় সাড়ে ২৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ এই সাড়ে ২৮ লাখ টাকা তাকে পরিশোধ করতে হবে বিসিককে। তিনি নিজে বিনিয়োগ করলেন আরো ১২ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে ৪০ লাখ টাকা পুঁজি খাটিয়ে তিনি তার নিজের হ্যান্ডমেড পেপার মিলের গোড়াপত্তন করলেন ১৯৯৪ সালে। ছেড়ে দিলেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার চাকরি।

বর্তমানে ২০ থেকে ৩০ ধরনের হ্যান্ডমেড পেপার তৈরি করছেন তিনি। এখানে উন্নত মানের মার্বেল পেপারও তৈরি হয়। পোশাক কারখানার ট্যাগও তৈরি হয় তার এখানে উৎপাদিত কাগজে। বিভিন্ন বিক্রয় সংস্থা তার কাছ থেকে এসব কাগজ কিনে বিদেশে রফতানি করছে। অনেক প্রতিষ্ঠান তার কাছ থেকে কাগজ কিনে নানা পণ্য তৈরি করেও বিদেশে রফতানি করছে। তবে তার তৃপ্তির জায়গাটা দেশের বাজার। দেশের ছবি আঁকার প্রায় সব প্রতিষ্ঠান, ভিউকার্ড, ইনভাইটেশন কার্ড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান তার কাছ থেকে কাগজ কিনছে। বর্তমানে তার কারখানায় মাসে ৩ থেকে সাড়ে তিন টন কাগজ উৎপাদিত হচ্ছে।

নিজের রোমাঞ্চকর উত্থানপর্ব বলে যান তিনি এভাবে–'এ পর্যন্ত উঠে আসতে আমাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ভারত ও নেপাল সফর করে হ্যান্ডমেড পেপার তৈরির কারখানা দেখে আসার পর থেকেই **মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম দেশে কাঁচামাল হিসেবে এমন কী পাওয়া সম্ভব যা খুবই কম খরচায় প্রচুর পরিমাণে মিলবে এবং যা দিয়ে খুব মানসম্পন্ন হ্যান্ডমেড পেপার তৈরি করা যাবে। একদিন বাজার থেকে কিছু পাট কিনে এনে নিজেই টুকরো টুকরো করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রেখে বাসার কাজের মেয়েটাকে শিলনোড়ায় বেটে দিতে বললাম। অনেক কষ্ট করে সে সেগুলো বেটে দিল। মণ্ড তৈরি করে কাগজ তৈরি করার চেষ্টা করলে সেগুলো তন্দুর রুটির মতো হয়ে গেল। বাসার সবাই তো হেসেই সারা!** এরপর একটার পর একটা জিনিস দিয়ে চেষ্টা করে যেতে থাকলাম। কিন্তু কিছুতেই নিজের তৈরি জিনিসটায় সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। এরপর একাধিক জিনিস মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলাম। মোট কথা এই কাগজ তৈরির উপযোগী মণ্ড তৈরিই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তো চার/পাঁচ বছর অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি মানসম্পন্ন মণ্ড তৈরি করতে পেরেছিলাম। এরপর আরো কয়েক বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বাজারে চালানোর মতো কাগজ তৈরি করতে সক্ষম হলাম। এরপর খুঁজতে থাকলাম কারখানা করার মতো সুবিধাজনক জায়গা। পেয়েও গেলাম এক সময় ফেনীর বিসিক শিল্প নগরীতে। তারপর অবিরাম পরিশ্রম করে যেতে থাকলাম কারখানাটাকে গড়ে তুলতে। অনেকটা ফেরিওয়ালাদের মতো আমার তৈরি হ্যান্ডমেড পেপার ফেরি করে করেই ঢাকার বাজারে ঠাঁই করে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। এভাবে বছর চারেক আদা-নুন খেয়ে চেষ্টা করার পর অবশেষে লাভের মুখ দেখতে পেয়েছিলাম।'

এমনই তাড়া যে না গেলেই নয়। আপনাদের সময় দিতে পারলে আমার নিজেরই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগত, কিন্তু সে উপায়টি একেবারেই নেই।'

আমি আর জবরদস্তি করলাম না। তার কার্ড নিয়ে এবং ফোন নম্বরটা টুকে নিয়ে বললাম, আমি বরং পরে ফোনে আলাপ করে নেব। তিনি সোৎসাহে সম্মতি জানালেন। এরপর আমি তার কাগজ তৈরির মিলটির কিছু ছবি তুলতে চাইলে তিনি নিজেই সঙ্গে করে নিচে নিয়ে এলেন। গেটে তার গাড়ি অপেক্ষমাণ থাকলেও তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন সবকিছু। এই ফাঁকে আমি তারও কয়েকটি ছবি তুলে নিলাম। এরপর ঘড়ির দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠে জিভ কেটে বিদায় নিয়ে দ্রুত গাড়িতে গিয়ে বসলেন। রিশাত আমার সঙ্গেই ছিল। ওর বেশ ভালো লেগে গেল কাগজের মান এবং কর্মীদের সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে চলা। অনুরোধ করল আরো কয়েকটি ছবি তুলে নিতে। ওর কথামতো আরো কয়েকটা ছবি তুলে আমরাও আমাদের গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

মাস দেড়েক পরে ফোনে তার সঙ্গে আলাপ করে জেনে নিয়েছি তার হ্যান্ডমেড পেপারের বেশকিছু তথ্য, সেই সঙ্গে শুরুর চমৎকার গল্পটিও। তবে ফোনে তথ্য নেয়ায় ঘাটতি কিছুটা থেকেই গেছে, এড়ানো সম্ভব হয়নি। তবুও তার সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে নতুন উদ্যোক্তারা এ খাতে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ হবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

তার কারখানার একজন দক্ষ কারিগরের কাছে তাদের হ্যান্ডমেড পেপার তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে জানান – প্রথমে বর্জ্য পাট, বর্জ্য তুলা, কচুরিপানা, গাছের পাতা (বিশেষ করে কড়ইগাছের পাতা), কাঁচা ঘাস ইত্যাদি ভালো করে পরিষ্কার করে বাছাই করা হয়। তারপর এসবকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ঝারাইযন্ত্র দিয়ে ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করা হয়। তারপর এগুলোকে পানিতে বয়লারের পানিতে ফেলে সেদ্ধ করা হয়। এ সময় এতে সামান্য পরিমাণে কেমিক্যাল মেশানো হয়। এরপর তাতে আরো কিছুটা পানি দিয়ে ধুয়ে মণ্ড তৈরি করা হয়। মণ্ডগুলোকে আবার পরিমাণমতো পানিতে মিশিয়ে বাঁশের ছাকনি দিয়ে ছেঁকে তুলে সেগুলোকে একটি কাপড়ের ওপর রাখা হয়। এভাবে বেশ কয়েকটি হয়ে গেলে হাইড্রলিক প্রেস দিয়ে চেপে পানি অপসারণ করা হয়। তারপর সেগুলোকে কন্টাক্ট ড্রায়ার দিয়ে শুকানো হয়। শুকানোর সময় কাপড়টা সরিয়ে নেয়া হয়। এ পর্যায়ে কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কাগজে কোনো ধরনের ময়লা থাকলে তা আবারো পরিষ্কার করা হয়। শুকিয়ে নেয়ার পর কাগজগুলোকে মসৃণ করার জন্য দুটি শিটের মাঝখান দিয়ে রোলারের মাধ্যমে ইস্ত্রি করা হয়। এরপর পেপার কাটিং মেশিন দিয়ে নির্দিষ্ট আকারে কেটে নেয়া হয়। কেটে নেয়ার পর কাগজের বাড়তি ছাঁটগুলো ফেলে দেয়া হয় না। এগুলোকে রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে আবার কাগজ তৈরি করা হয়। কাটার পর কাগজের শিটগুলোকে পুরুত্ব অনুযায়ী ওজন অনুপাতে (গ্রামভিত্তিক) গ্রেডিং করে বিক্রি করা হয়।

বেশ কয়েকদিন চেষ্টা করার পর মোবাইল ফোনে তার সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হই। জেনে নিই তার ব্যক্তিগত তথ্য।

তার পুরো নাম গাজী আবদুর রব। বয়স ৬৮ বছর। তার উদ্যোগের নাম শতরূপা হ্যান্ডমেড পেপার মিল। উদ্যোগের ধরন : বিভিন্ন প্রকারের ও মানের হ্যান্ডমেড পেপার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ। শুরু করেছেন ১৯৯৪ সাল থেকে। এক বছরের ভেতরেই উৎপাদন করতে সক্ষম হন। তার প্রাথমিক পুঁজি ছিল সাড়ে ৪০ লাখ টাকা। এর ভেতর নিজস্ব পুঁজি ছিল ১২ লাখ টাকা।

উদ্যোগটি প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল কিনা, না থাকলে কতদিন পর থেকে লাভের মুখ দেখছেন জানতে চাইলে বললেন, 'প্রথম থেকেই লাভের মুখ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। অনেক চেষ্টা করে, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, আমার কারখানার সবাই মিলে অনেক পরিশ্রম করে, অনেক টাকা লোকসানের পর অবশেষে চার বছর পর থেকে একটু একটু করে লাভের মুখ দেখতে থাকি।'

এখন পর্যন্ত লাভের যে সীমা ছুঁতে পেরেছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট কিনা জানতে চাইলে বললেন, 'সেভাবে সন্তুষ্ট নই। ঠিকমতো সময় দিতে পারছি না, ঠিকমতো সময় দিতে পারলে লাভের পরিমাণ অবশ্যই আরো বেশি হতো।'

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ উদ্যোগে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন তা কি নিজস্ব, নাকি কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ গুণ অর্জন করেছেন? জানালেন, 'একেবারেই

নিজস্ব। অনেক বইপত্র পড়ে, নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিজস্ব একটা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছি। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এমসিসিতে চাকরির সুবাদে নারী কর্মীদের আন্তরিকতার ওপর খুব আস্থাবান হয়ে উঠেছিলাম অনেক আগে থেকেই। তাদের শ্রমনিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করত। তাই আমি নিজে যখন কারখানা খুললাম তখন নারীদেরই সেখানে বেশি সংখ্যায় নিয়োগ দিলাম। তাদের সুশৃঙ্খল নিবিড় শ্রম আমি আমার নিজস্ব উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনায় সর্বাংশে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি।'

তার কাছে জানতে চাইলাম, কোন ভরসায় তিনি এ ধরনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করলেন? জবাবে বললেন, 'দেশের বাজার পর্যবেক্ষণ করে; নিজে বিদেশ সফর করে এবং ওয়াকিবহাল সূত্রে খোঁজখবর করে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, দেশে ও বিদেশ হ্যান্ডমেড পেপারের ব্যাপক চাহিদা। নিজের পর্যবেক্ষণ ও অনুমান-ক্ষমতায় আমি বেশ ভালোমতোই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, এর চাহিদা দিনদিন বাড়বে বৈ কমবে না। সেই ভরসাতেই এই উদ্যোগটি গ্রহণ করেছিলাম।'

প্রথম অবস্থায় কীভাবে বাজারজাত করতেন– আমার এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'প্রথম অবস্থায় উৎপাদিত কাগজ আমি নিজে ঢাকায় নিয়ে দোকানে দোকানে বিক্রি করতাম।' এখন কীভাবে বাজারজাত করছেন জানতে চাইলে বললেন, 'বর্তমানে বিভিন্ন বিক্রয় সংস্থা আমার কাছ থেকে কাগজ কিনে সারাদেশে বিক্রি করে, এমনকি তারা ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ কাগজ রফতানিও করে থাকে।'

বাজার সম্প্রসারণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাইলে বললেন, 'আসলে যে কোনো পণ্যেরই বাজার সম্প্রসারণের জন্য যেভাবে লেগে থাকা দরকার তা আমি মোটেও পারছি না। সময় সেভাবে বেরই করতে পারছি না!'

জানতে চাইলাম তার পণ্যের চাহিদা কেমন; জানালেন– 'অনেক চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে হিমশিম খাচ্ছি।' স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা জানতে চাইলে বললেন, 'এখনো পারছি না। সময়ের অভাব একটা বড় কারণ।' তা হলে এ ধরনের উদ্যোগ কেন গ্রহণ করলেন প্রশ্ন করতেই কিছুটা জবাবদিহিতার সুরে বললেন, 'এ পণ্যের চাহিদা অনেক বেশি, তাই এর কারখানা একবার দাঁড় করাতে পারলে আর লোকসানের আশঙ্কা থাকবে না– এমন ভাবনা থেকেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

এ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল জিজ্ঞেস করলে জানালেন, এ উদ্যোগের ভবিষ্যত বেশ উজ্জ্বল।

প্রসঙ্গে এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা জানালেন, ছোট-বড় অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় এ ধরনের উদ্যোগে। সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সরকারি প্রণোদনার অভাব। সরকারের আর্থিক প্রণোদনা এ শিল্প বিকাশে বিশাল এক ভূমিকা রাখতে পারে।

জানতে চাইলাম তিনি কীভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে পেরেছেন। চোয়াল শক্ত করে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'টিকে থাকতে হবে এবং এ কারখানাকে লাভজনক করে তুলতে হবে– এমন দৃঢ় মনোবলে লেগে থেকেই মূলত আমি এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পেরেছি।'

নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার জন্য তার পরামর্শ কী হবে– এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বললেন, 'নতুন কেউ যদি এ ধরনের উদ্যোগ নেয় তবে প্রথমে তাকে আমি এ শিল্পে স্বাগত জানাব। তারপর আমার পরামর্শ থাকবে– লেগে থাকতে হবে। অনেক বাধা-বিঘ্ন আসবে, কিন্তু সেসবে হেরে গিয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না।'

প্রযুক্তির ব্যাপারে জানতে চাইলে বললেন, 'আমার প্রযুক্তি মূলত ম্যানুয়াল। তবে অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকি।'

তার জনবলের সংখ্যা জানতে চাইলে জানালেন, তার জনবল মোট ৬০ জন, এদের ভেতর ৪৮ জনই নারী কর্মচারী। মোট দক্ষ কর্মচারী ২০ জন।

তার হিসেব পদ্ধতি গতানুগতিক। একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বললেন, 'এখনো খাতায় লিখেই হিসেব রাখছি।' এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সম্পর্কে বললেন, দেশে এবং দেশের বাইরে বিপুল চাহিদা রয়েছে তার হ্যান্ডমেড পেপারের। তাই এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের বেশ সম্ভাবনা রয়েছে। ■

যশোরের ব্যাট বিশ্ববাজারে নিতে চান লিটন হোসেন

CORE

যশোরের নরেন্দ্রপুরের মিস্ত্রিপাড়া ক্রিকেট ব্যাটের গ্রাম বলে পরিচিত হয়ে উঠেছে। দারুণ ব্যস্ত প্রতিটি পরিবারের প্রায় প্রত্যেক সদস্য। ব্যস্ত লিটন হোসেনও। কৈশোরের দুরন্ত কৌতূহল তাকে টেনে এনেছিল ব্যাট তৈরির পেশায়। ক্রিকেটের বিশ্ব আসরে বাংলাদেশের লড়াকু ছেলেরা যখন বুক চিতিয়ে ছিনিয়ে আনছে একের পর এক জয়, গর্বিত হাতে দোলাচ্ছে এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বিজয়-নিশান, মুগ্ধ করছে বাঘা বাঘা ক্রিকেটবোদ্ধাকে– তখন তার ভেতরেও গা-ঝাড়া দিয়ে মাথা তুলতে চাইছে এক অদম্য ইচ্ছে– মাঠে খেলে না পারুন, অন্তত বিশ্ব মানের ব্যাট তৈরি করে ক্রিকেট-বাজারেও জানান দিতে চান বাংলাদেশের গর্বিত উপস্থিতি। আর সেটা যে অসম্ভব কিছু নয় তাও প্রমাণ করতে চান তিনি। কিন্তু চাইলেই তো সব হয় না! ও-পথে হাঁটতে যে ঘাটতিগুলো আছে সেগুলো পূরণ করা চাই। লক্ষ্য অর্জনে তার সবচেয়ে বড় ঘাটতিটা হচ্ছে পুঁজি। যথেষ্ট পুঁজি জোগাড় করতে পারলে বিশ্বকে এদিকটাও দেখিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা তার ষোলো আনা। তিনি পারুন বা না পারুন– এই যশোর থেকেই কারো পক্ষে যে তা করে দেখানো সম্ভব তা বোধ করি চোখ বন্ধ করেই বলে দেয়া যায়। তবে সেজন্য যে অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তির দরকার তা অর্জন করা বেশ দুরূহ। কিন্তু তাই বলে নতুন কোনো উদ্যোক্তা যদি ক্রিকেট ব্যাট প্রস্তুতে বিনিয়োগ করতে চান, তাকে মোটেও হতাশ হতে হবে না। কারণ এই ক্রীড়াপণ্যটির বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারটি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। সে ক্ষেত্রে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য যশোরের অভিজ্ঞতা শিক্ষনীয় হতে পারে।

এক সময় কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো– যশোর কিসের জন্য বিখ্যাত, তা হলে সে চোখ বন্ধ করে উত্তর দিত– খেজুরের গুড়ের জন্য। এখন কিন্তু কেবল খেজুরের গুড়েই থেমে নেই বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী জায়গাটির প্রসিদ্ধি! সবজি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠার পরপরই সারাদেশের মানুষ এটিকে ফুলের জেলা হিসেবে চিনে গেল। পুরো দেশের চাহিদা মেটায় এখানকার গদখালীর ফুল। এ এলাকার গৌরবে হালে যোগ হয়েছে ক্রিকেট ব্যাট। গোটা দেশের হাঁটিহাঁটি পা-পা শিশু থেকে অদম্য তরুণ– প্রায় সবার হাতেই এখন শোভা পায় যশোরের নরেন্দ্রপুরের মিস্ত্রিপাড়ায় তৈরি ব্যাট।

আমরা যশোরে গিয়েছিলাম মূলত সেইসব উদ্যোক্তার খোঁজে, যাদের উদ্যোগ দিনদিনই সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে এবং উৎসাহী উদ্যোক্তারা যাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে পারেন আর এই সম্ভাবনার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারণ করতে পারেন। ১৪ নভেম্বর সন্ন্যাসগাছা থেকে ফিরে আসার পর রাতেই লুৎফর ভাই জানিয়ে রেখেছিলেন পরদিন সকালে আমরা যশোরের ব্যাটের গ্রাম বলে পরিচিত মিস্ত্রিপাড়ায় যাচ্ছি। স্থানীয় এক উৎসাহী তরুণ আনিস আমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন।

যশোরে ক্রিকেট ব্যাট তৈরি একটি শিল্প হিসেবে গড়ে উঠছে সে কথা আগেই জানা ছিল। তাই যশোর যাচ্ছি শোনার পর থেকেই তা দেখে আসার ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। ১৫ নভেম্বর সকাল সাড়ে নটায় আনিস আমাদের নিয়ে চললেন যশোরের ক্রিকেট ব্যাটের গ্রাম নরেন্দ্রপুরের মিস্ত্রিপাড়ায়। জায়গাটি যশোর শহর থেকে ১৯ মাইল দূরে। যশোর-ঢাকা মহাসড়ক ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর আমাদের গাড়ি পুবদিকের এর সরু রাস্তা ধরে এগুতে থাকল। দু পাশের গাছপালাঘেরা বাড়িগুলোতে এরই মধ্যে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে সংসারী মানুষ। গাছের পাতায় প্রাণ ছড়াচ্ছে সকালের রোদ। মাঠগুলোতে ধান পেকেছে। কোনো কোনো ক্ষেত থেকে এরই মধ্যে কেটে নেয়া হয়েছে ধান। বাতাসে নবান্নের ঘ্রাণ।

যেতে যেতে আমি আনিসের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। ওদের বেশ বড়ো একটা সবজির আড়ত আছে স্থানীয় রাজাহাট বাজারে। সবজিচাষিরা ভোর রাত থেকে তাদের আড়তে যে সবজি বিক্রি করে যায় তাতে ভরে ওঠে গোটা বিশাল আড়তঘর। সকাল আটটা-নটার ভেতরেই তাদের আড়তের সব সবজি বিক্রি হয়ে যায়। বেশির ভাগ সবজিই ট্রাকে করে চলে যায় ঢাকায়। কথায় কথায় গেঁয়োপথের এক বাঁকে আসতেই আনিস গাড়ি থামাতে বললেন। ভাবলাম এসে গেছি বুঝি ব্যাটের গ্রামে। এই বাঁক থেকে পথটা দু ভাগ হয়ে গেছে। একটি চলে গেছে দক্ষিণ দিকে, অন্যটি সোজা পুবদিকে। দু পথের সংযোগস্থলে একটি চায়ের দোকান। আনিস নেমে গিয়ে চায়ের দোকানে মিস্ত্রিপাড়ার পথ কোনটা জিজ্ঞেস করতেই আমার ভুলটা ভেঙে গেল। জায়গামতো আসিনি তা হলে এখনো! অজুহাত দেয়ার ঢঙে আনিস আমাদের জানাল– অনেকদিন আগে এসেছিল, ঠিক পথটা তাই মনে করতে পারছে না। যাই হোক, চায়ের দোকান

ক্রিকেট এখন বাংলাদেশের উত্তুঙ্গ ক্রেজ। সব বয়সী বাংলাদেশির নির্মল মোহ। বিশ্বকে আঙুল উঁচিয়ে এই দেশটাকে চিনিয়ে দিচ্ছে ক্রিকেট। আগে যে নীরসতম বাবা-মা তার সন্তানকে খেলতে দেখলেই মুখিয়ে উঠতেন, তেড়ে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে কষে এক থাপ্পড় লাগাতেন, তারাও এখন তাদের সন্তান ক্রিকেট খেলছে দেখলে রেগে না গিয়ে বরং খুশিই হন। কারণ তিনি জানেন, একবার যদি তার সন্তান এই খেলায় বড় কোনো পর্যায়ে ঠাঁই করে নিতে পারে তা হলে তার ভবিষ্যত নিয়ে আর কোনো ভাবনা থাকবে না; অর্থের নহর বইতে থাকবে সংসারে। আগে যে বাবা-মা তাদের শিশুর হাতে ঝুমঝুমি আর অন্যান্য খেলনা তুলে দিতেন তারা এখন সবার আগে খোঁজেন ক্রিকেট ব্যাট আর বল।

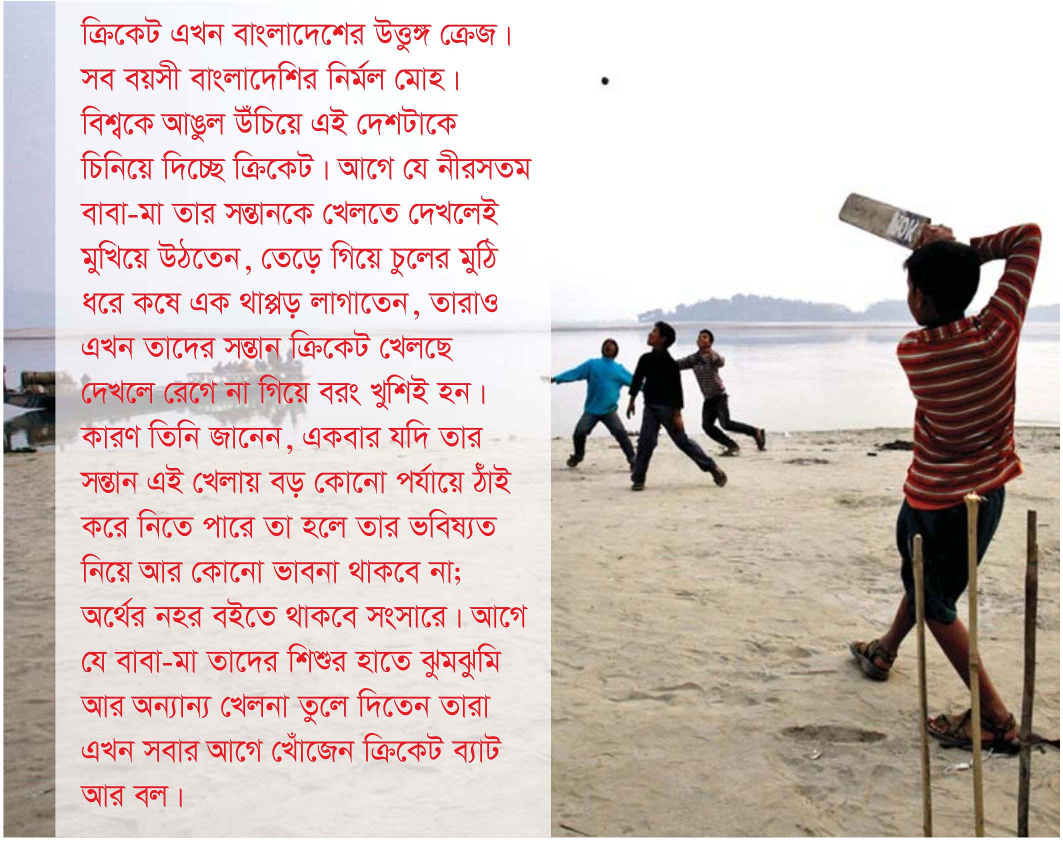

থেকে একজন সোজা পুবের পথে যেতে বললে আমরা ধীরে ধীরে সেদিকেই যেতে শুরু করলাম। সরু এবং কিছুটা ভাঙাচোরা বলে আমাদের খুব আস্তে যেতে হচ্ছিল। বেশ বড় একটি পুকুর ধরে এগিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল পুকুরের শেষ মাথায় পথটা আবারো দু ভাগ হয়ে গেছে। সেখানে পথের পাশে ত্রিশোর্ধ এক মহিলা গোবরের ঘুঁটে তৈরি করছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করায় জানালেন আমরা বেশি দূরে চলে এসেছি। আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে বাঁয়ে দক্ষিণের রাস্তায় যেতে হবে। সরু পথে গাড়ি ঘোরানো সম্ভব হলো না। অগত্যা গাড়ি বেশ কিছুদূর ব্যাক করে পুকুরের অন্যপ্রান্তে গিয়ে ঘোরাতে হলো। সেখানে এক প্রৌঢ়া এবং পাশের ক্ষেতে কাজ করতে থাকা এক মাঝবয়েসী কৃষকের কাছ থেকে পথের দিশা নিয়ে দক্ষিণের পথে চলতে থাকলাম। এবার যে ভুল পথে আসিনি বুঝতে পারলাম কিছুদূর যাওয়ার পর পথের পাশে ব্যাটের আকার দেয়া স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা কাঠের সারি দেখে। এক সময় খেলাধুলা করতাম বলেই বুঝি-বা আমার আগ্রহটা অন্যদের চেয়ে বেশি ছিল। আর তাই ব্যাটের কাঠের প্রথম সারির কাছে গাড়ি থামতেই নেমে চট করে দুটি ছবি তুলে নিলাম ক্যামেরায়।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল এটিই মিস্ত্রিপাড়া। কাঁচা পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে লুৎফর ভাই, রিশাদ ও আনিস একটি বাড়িতে ঢুকে পড়লে আমি তাদের অনুসরণ করলাম। পথের সমতলে বাড়িটিতে ঢুকতেই দেখি একটি গোলা ঘরের মতো, যাতে কাঠ চেরাই করার ছোট্ট এক বৈদ্যুতিক করাত, আর ব্যাটের আকার দেয়া ফালি করা কাঠ গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। ঘরটা পেরিয়ে উঠোনে ঢুকতেই দেখি দুজন মহিলা খুব মনোযোগ দিয়ে ব্যাটের কাজ করছেন। একজন তৈরি করা ব্যাটে পুডিং লাগাচ্ছেন, আরেকজন বাটালি দিয়ে চেঁছে মসৃণ করছেন। একজনের সিঁথিতে সিঁদুর দেখে বুঝলাম এটি হিন্দু বাড়ি। যিনি পুডিং লাগাচ্ছিলেন তার পেছনে গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চরম কৌতূহলে আমাকে উঁকি মেরে

যার হাত ধরে নরেন্দ্রপুর এখন ক্রিকেট ব্যাটের গ্রাম

নরেন্দ্রপুর গ্রামের সঞ্জিত মজুমদার নামে এক তরুণ ১৯৮৬ সালে প্রথম ক্রিকেট ব্যাট তৈরি শুরু করেছিলেন। ১৯৮৪ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় দিদির বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সঞ্জিত। দিদির বাড়ির সেই গ্রামটিতে কাঠের নানা রকম শিল্পকর্ম তৈরি করতে দেখে তরুণ সঞ্জিত দারুণ মুগ্ধ হন। মুগ্ধতার সেই আবেশ নিয়ে ফিরে আসেন দেশে। বলা যায় সৃষ্টির পোকা ঢুকে যায় মাথায়। ভাইপো উত্তম মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে নতুন কিছু তৈরির চেষ্টা করেন। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট তাকে খুব টানতো। তাই ঠিক করলেন ক্রিকেট ব্যাটই তৈরি করবেন। যশোরের এক ক্রীড়াসামগ্রীর দোকানের মালিক এবং ঘোপ এলাকার এক উৎসাহী যুবকের সঙ্গে তার মনের ইচ্ছেটা নিয়ে কথা বলেন। তারা তাকে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিতে থাকেন। তাদের অনুপ্রেরণাতেই সঞ্জিত ভাইপোকে নিয়ে প্রথম ব্যাটটি তৈরি করেন। ক্রীড়াসামগ্রীর দোকানের মালিক কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দিলে সেসব শুধরে সে বছর থেকেই তিনি ব্যাট তৈরি শুরু করেন এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে থাকেন। প্রথম বছরের ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন তিনি। তার এই সফলতায় উজ্জীবিত হয়ে পরের বছর থেকে মিস্ত্রিপাড়ার আরো অনেকেই ব্যাট তৈরি শুরু করেন। ধীরে ধীরে এখানে স্বর্ণকারদের কাঠের ছাঁচের জায়গাটি দখল করে নেয় ক্রিকেট ব্যাট। এ পাড়ার হিন্দু-মুসলমান– সবারই তা লাভের পণ্য হয়ে ওঠে। এখন নরেন্দ্রপুরের মিস্ত্রিপাড়ার এই ব্যাট তৈরির মহোৎসব ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের মহাজেরপাড়া, বলরামপুর, রুদ্রপুর ইত্যাদি গ্রামেও। গোটা এলাকায় এখন ব্যাট তৈরির প্রায় ৭০টি কারখানা। প্রথম প্রথম হাতুড়ি-বাটাল-ছেনি-করাত দিয়ে কাজ করলেও ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং ব্যাটের চাহিদা অনেক বেড়ে যাওয়ায় আধুনিক প্রযুক্তিও গ্রহণ করেছে অনেক কারখানা। কাঠ চেরাই, মসৃণ করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা। এখানকার ব্যাট তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে জীবন, ছাতিম, কদম, নিম, পিঠেগড়া, আমড়া ইত্যাদি কাঠ। মাসে এসব কারখানায় প্রায় ৬০ হাজার ব্যাট তৈরি হচ্ছে। তবে যে সঞ্জিত এ এলাকায় ব্যাট তৈরির ভিত গড়ে দিয়েছিলেন তিনি এখন আর ব্যাট তৈরি করেন না।

দেখছিল তার ৪/৫ বছরের ছেলেটা। এরই মধ্যে বাড়ির কর্তা ফিরে এসে গোলাঘরটিতে কাজে লেগে গেলেন। লুৎফর ভাই তার দিকে এগিয়ে গিয়ে পরিচিত হতে চাইতেই ঘটে গেল এক বিপত্তি। তার প্রথম কথাতেই বোঝা গেল ভীষণ রেগে আছেন। লুৎফর ভাইয়ের মুখের ওপর বলে দিলেন কোনো কথা বলতে পারবেন না। খুব খুশি মনে ছবি তুলে সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি হচ্ছিলাম। দারুণ কিছু তথ্য আবিষ্কারের আশা করছিলাম। আমার সেই আশার পাতে ছাই ঢেলে দিয়ে বাড়ির কর্তা সাফ জানিয়ে দিলেন– কোনো কথাই বলবেন না আমাদের সঙ্গে। আক্ষেপের গোলা ছুড়তে ছুড়তে বললেন– 'আপনাদের সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলব ততক্ষণে আমি আরো দু-চারটি ব্যাট বানাতে পারব, তাতে ঘরে দুটো পয়সা আসবে। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে কথা বলে তো আমার ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই কোনো! রোজই আপনাদের মতো কয়েকটি করে দল আসে আর বিরক্ত করে মারে। ভাই আমাদের বাড়িতে এসেছেন, খুব খুশি হয়েছি। এখন দয়া করে রেহাই দিন!' এরপর আর কোনো কথা খাটে না। হতাশ হয়ে বাড়িটি থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

বাড়িটি থেকে বেরিয়ে আমরা হাঁটতে থাকলাম মিস্ত্রিপাড়ার পথ ধরে। লুৎফর ভাই আগে আগে হাঁটছিলেন আর মনে মনে খুঁজছিলেন কোন বাড়িটিতে ঢোকা যায়। প্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর আমরা সবাই মনে মনে আশঙ্কায় ছিলাম– কেউ কথা বলতে চাইবে তো! আমি অবশ্য আশাবাদী ছিলাম– কেউ না কেউ অবশ্যই বলবে। এই মিস্ত্রিপাড়ার সব বাড়িতেই ক্রিকেট ব্যাট তৈরি হয়। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই মিস্ত্রিদের বাস নরেন্দ্রপুর গ্রামের এই পাড়াটিতে। আগে এদের বেশির ভাগই স্বর্ণকারদের জন্য কাঠের ছাঁচ তৈরি করত। এখন তৈরি করে ব্যাট।

ডাইনে বাঁক নেয়া মাটির রাস্তায় নেমে প্রথম যে বাড়িটি পড়ল লুৎফর ভাই সেটিতেই ঢুকে পড়লেন। সঙ্গে রিশাদ, আনিস, ড্রাইভার শ্যামল এবং আমিও। কোমর সমান উঁচু কাঠের টেবিলের মতো মঞ্চের নিচ থেকে মাথা বের করা গোল চাকতির বৈদ্যুতিক করাতে নির্দিষ্ট মাপের ব্যাটের জন্য কাঠ চেরাই করে নিচ্ছিলেন লুঙ্গির ওপরে খালি গায়ে কালচে-বাদামি রঙের কোট পরা এক প্রৌঢ়। ভয়ে ভয়ে ছিলাম– না জানি এখানে আবার কেমন

বিড়ম্বনায় পড়তে হয়! হাসিমুখে এগিয়ে এলেন কোট পরা প্রৌঢ়। লুৎফর ভাইকে দেখে ব্যস্ত হয়ে ঘরে থাকা চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কুশল বিনিময়ের পর লুৎফর ভাই তার কাজের খোঁজখবর নিলেন। এরপর লুৎফর ভাই এবং অন্যরা ঘুরে ঘুরে ব্যাট তৈরি দেখতে থাকলে আমি গিয়ে আলাপ শুরু করলাম এই অমায়িক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। আমি আমার নাম পরিচয় এবং তার এখানে আসার উদ্দেশ্য জানালাম। তিনি তার নাম জানালেন একাবউদ্দিন। তার এগিয়ে দেয়া চেয়ারটায় বসে তাকেও পাসে বসতে বললাম। কাগজ-কলম বের করতেই বুঝে গেলেন সাক্ষাৎকার নেব। তার প্রতিক্রিয়া থেকে আঁচ করতে পারলাম এ ধরনের সাক্ষাৎকার তাদের প্রায়ই দিতে হয়। সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকরা ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা থেকে নানামুখী জরিপের জন্য আসা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে অভ্যস্ত তারা। তিনি বেশ খোশ মেজাজে বললেন, 'আমি না। কথা তো বলবে আমার ছেলে লিটন। মালিক বলেন, ওস্তাদ বলেন– সবকিছু তো সে-ই! আমাকে এখন তার কর্মচারী বলতে পারেন।' ক্ষেদ নয়, বেশ গর্বের সঙ্গেই বললেন। পুত্রগর্বের যে দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছিল তার মুখ থেকে তা আমাকে মুগ্ধ করে রাখল কয়েক মিনিট। লিটন এগিয়ে এসে আমার পাশটিতে বসতেই তার বাবা লুৎফর ভাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখাতে লাগলেন।

মো. লিটন হোসেন। বয়স ৩২ বছর। বাবার চেয়ে বেঁটে। মুখে কালো দাড়ি, মাথায় সাদা টুপি। চেহারা থেকে তারুণ্যের ছটা ঠিকরে বেরুচ্ছে। প্রাথমিক আলাপ সেরে নিয়ে আমি তাকে প্রশ্ন করতে থাকলাম এবং তিনি বলে যেতে থাকলেন তার এই উদ্যোগের কাহিনি। ছোটবেলায় বাবা একাবউদ্দিনের কাছেই লিটনের হাতুড়ি-বাটাল নিয়ে মিস্ত্রিগিরিতে হাতেখড়ি। কাঠমিস্ত্রির কাজে আয় কমে গেলে একাবউদ্দিন স্থানীয় বাজারে সবজির ব্যবসা শুরু করেছিলেন। লিটন ব্যাট তৈরিতে বেশ জমিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করলে তিনি এবং তার বাকি তিন ছেলেও এ কাজে যোগ দেন। যোগ দেন পরিবারের নারী সদস্যরাও। লিটনের বড় ভাই কুতুবউদ্দিন, মেজোভাই আবু বকর সিদ্দিক এবং সেজোভাই রাজু আহমেদ– সবাই এখন এ পেশায় জড়িত এবং বাবা ও চারভাই মিলেই ব্যবসাটা চালান। সবাই বিবাহিত। বাড়ির মহিলারা ব্যাটে পুডিং এবং স্টিকার লাগান।

লিটন ব্যাট তৈরি করে বিক্রি করতে শুরু করেন ১৯৯০ সালে। চার হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে নেমেছিলেন এবং এর পুরোটাই ছিল নিজস্ব। এখনো পর্যন্ত তিনি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোনো ধরনের ঋণ নেননি। গর্বের সাথে বললেন– প্রথম থেকেই তার এই উদ্যোগটি লাভজনক। প্রথম বছরে লাভের হার ছিল ৫০ শতাংশ। এখন পর্যন্ত এ ব্যবসা থেকে যতটুকু অর্জন করতে পেরেছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট। তবে তিনি মনে করেন, লাভের এই হার আরো অনেক বেশি হতে পারতো। তবে তার ধারণা, যদি তার তৈরি ব্যাট বিপণন ও বাজারজাতকরণে আরো দক্ষতা বাড়াতে পারতেন তা হলে এই লাভের হার আরো অনেক বাড়াতে পারতেন। ব্যাট তৈরি, বাজারজাত, আয়-ব্যয়ের হিসেব, কর্মচারী নিয়োগ– ইত্যাদি ব্যবসাসংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থাপনা তার নিজের। এজন্য তিনি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ নেননি।

এরপর এই ব্যাট তৈরির উদ্যোগ নেয়ার পেছনে তার ভরসার জায়গাটা কোথায় তা জানতে চাইলাম। দূরে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন– যশোরের দড়াটানা মোড়ের ক্রীড়া সামগ্রীর দোকান 'আনন্দ বিপণি' প্রথম থেকেই তার ব্যাটের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। নানা সময়ে নানা পরামর্শ দিয়ে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি লিটনকে অনুপ্রাণিত করছে এখনো। মূলত তাদের ভরসাতেই ব্যাট তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন লিটন।

একেবারে গোড়ার দিকের বাজারজাতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বললেন– প্রথম প্রথম ব্যাট তৈরি করে দড়াটানা মোড়ের আনন্দ বিপণিতে সরবরাহ করতেন। এরপর বিভিন্ন মেলায় এবং বাজারে বাজারে গিয়ে ব্যাট বিক্রি করতেন।

এখন কীভাবে বাজারজাত করছেন জানতে চাইলে বললেন– সারাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার আসে। পাইকারি ক্রেতারা প্রথমে বিকাশের মাধ্যমে ব্যাটের দাম এবং পরিবহন খরচ পরিশোধ করে, এরপর তিনি বিভিন্ন পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে তাদের ব্যাট সরবরাহ করেন।

বাজার সম্প্রসারণে তার বর্তমান পদক্ষেপ জানতে চাইলে বলেন– এজন্য প্রচার খুব বড় ভূমিকা রেখে থাকে। কিন্তু তাদের সেই সঙ্গতি নেই। এ ক্ষেত্রে তারা বরং ব্যাটের গুণগত মান বাড়ানোর চেষ্টা করছেন, যাতে তাদের ব্যাটের চাহিদা বেড়ে যায়। তবে তার ব্যাটের চাহিদা বেশ ভালো বলে জানালেন।

ক্রিকেট ব্যাটের চাহিদা দিনদিনই বাড়ছে। বর্তমানে তারা সবে হাঁটতে শেখা শিশুদের ব্যাট থেকে শুরু করে বড়দের ব্যাটও তৈরি করছেন। কিন্তু মূল ক্রিকেট বল দিয়ে খেলার উপযোগী ব্যাট তৈরি করতে পারছেন না; বাংলাদেশে এমন ব্যাট এখনো কেউ তৈরি করছেন না। এ ব্যাটের চাহিদা ব্যাপক। বিদেশ থেকে এ ব্যাট আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সেরা ক্রিকেট খেলুড়ে দেশগুলোর অন্যতম। এ ধরনের প্রায় সব দেশেই মানসম্পন্ন ব্যাট তৈরির কারখানা আছে। তিনি মনে করেন, সামান্য প্রশিক্ষণ নিতে পারলেই এ ধরনের ব্যাট তৈরি করতে পারবেন। তবে তার এ উদ্যোগকে সে পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে উইলো কাঠ আমদানি করতে হবে। কারণ মূল ক্রিকেট ব্যাট কেবল উইলো কাঠ দিয়েই তৈরি হয়। এ কাঠ পাওয়া যায় ইংল্যান্ড ও কাশ্মীরে। সেরা উইলো পাওয়া যায় ইংল্যান্ডে। আশার কথা হচ্ছে, বিশ্বসেরা মানসম্মত ক্রিকেট ব্যাট হাতেই তৈরি হয়, কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে নয়। পর্যাপ্ত পুঁজি জোগাড় করতে পারলে তার ব্যাট তৈরির এই ছোট কারখানাটিকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে বললেন, তার ব্যাটের চাহিদা দিনদিনই বাড়ছে। কিন্তু পর্যাপ্ত পুঁজির অভাবে চাহিদা অনুযায়ী সব সময় জোগান দিতে পারছেন না। হাতে পর্যাপ্ত নগদ টাকা থাকলে বেশি করে কাঠ কিনে রেখে সারা বছরই ব্যাট সরবরাহ করা যেত। বর্তমানে তারা শুকনো মওসুমের ৫ মাসই কেবল ব্যাট তৈরি করে থাকেন।

মিস্ত্রিপাড়ার অনেকেই এভাবে এখনো স্বর্ণকারদের জন্য ডাইস তৈরি করেন

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার পেছনে কারণ হিসেবে বললেন– তার বাবা আগে সবজি ও কাঁচামালের ব্যবসা করতেন। সেসব পচে গিয়ে প্রায়ই অনেক লোকসান গুনতে হতো। কিন্তু ব্যাটের বেলায় সে আশঙ্কা নেই। মূলত এ কারণেই তিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জানালেন, তিনি যখন ব্যাটের ব্যবসা মোটামুটি বেশ জমিয়ে ফেলেছেন তখন তার বাবা এবং অন্য ভাইয়েরাও এতে যোগ দেন এবং তাতে তাদের উৎপাদনও অনেক বেড়ে যায়।

তবে এ পর্যন্ত উঠে আসতে তাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। ছোটবেলার এক দুর্দমনীয় কৌতূহল এবং ভালো লাগা তাকে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। ছোট বেলায় তিনি ক্রিকেট খেলে খুব আনন্দ পেতেন। যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন তখন পাশের বাড়িতে ক্রিকেট ব্যাট তৈরি হতো। স্কুল ছুটির পর তিনি সে বাড়িতে গিয়ে খুব মন দিয়ে দেখতে থাকতেন কী করে ক্রিকেট ব্যাট তৈরি করা হয়! এভাবে দেখতে দেখতে একদিন মনে মনে ঠিক করে ফেললেন– তিনিও ব্যাট তৈরি করবেন। সেই বাড়ি থেকে ক্রিকেট ব্যাট তৈরির এক ফালি কাঠ চেয়ে এনে ব্যাট তৈরিতে লেগে গেলেন এবং এক সময় পেরেও গেলেন। নিজের তৈরি ব্যাটের দিকে তাকিয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। প্রবল উৎসাহে তখন তিনি রীতিমতো টগবগিয়ে ফুটছেন। এরপর নিজেরা কাঠ কিনে এনে কয়েকটা ব্যাট তৈরি করে দড়াটানার মোড়ে খেলার সামগ্রী বিক্রির দোকান আনন্দ বিপণিতে নিয়ে দেখিয়ে জানতে চাইলেন– তারা এমন ব্যাট কিনবেন কিনা। সেই দোকানের মালিক ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে কিছু ভুলচুক দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই ভুলগুলো ঠিক করে আরো ব্যাট তৈরি করে আনো, আমি তোমার ব্যাট বিক্রি করব।' সঙ্গে খুব উৎসাহও দিলেন। ভুলগুলো শুধরে সেই দোকানে ব্যাট সরবরাহ করতে থাকলেন এবং বেশ সন্তোষজনক দামও পেতে থাকলেন। ভালো লাভ করা যাচ্ছে দেখতে পেয়ে বাবা তার কাঁচামালের ব্যবসা ছেড়ে লিটনের সঙ্গে ব্যাট তৈরিতে লেগে গেলেন। বড় তিন ভাইও যোগ দিলেন। এর আগে অন্য ভাইয়েরা স্বর্ণকারের দোকানের অলঙ্কার তৈরির ছাঁচ তৈরি করতেন। মোট কথা, বাড়ির সবাই এ পেশায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। লেখাপড়ার বেশ ভালো ছিলেন। ক্লাসে তার রোল নম্বর ছিল ৯। তার পিঠাপিঠি বড় বোনও তার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তেন। ক্লাস নাইনে ওঠার পর বাবা তাদের দু ভাই-বোনেরই এসএসসি পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপ করে টাকা জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার বোন পরীক্ষা দিলেও তিনি দিলেন না। বাবাকে সাফ জানিয়ে দিলেন– তিনি ব্যাট তৈরি করবেন, লেখাপড়া আর করবেন না। খুব মন দিয়ে নিখুঁতভাবে কাজ করতেন বলে অল্পদিনেই ভালো কারিগর হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সুবাদে বিক্রিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সেই ধারাটা এখনো ধরে রাখতে পেরেছেন।

নরেন্দ্রপুরের নারীরাও ব্যস্ত থাকেন ক্রিকেট ব্যাট তৈরীতে

এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা কী কী জানতে চাইলে জানালেন– সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধিকতা হচ্ছে– তাদের মতোই অনেক মিস্ত্রি উটকো লাভের জন্য নিম্নমানের ব্যাট তৈরি করে অনেক সস্তায় বিক্রি করছে। এতে তাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। রংপুরে যে ব্যাট তিনি প্রতিটি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি করতেন, একজন সেখানে প্রতিব্যাট ৮৫ টাকায় বিক্রি করে তার সেখানকার বাজার নষ্ট করেছে। তা ছাড়া ভালো মানের কাঠও সব সময় পাওয়া যায় না।

তিনি কীভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে পেরেছেন জিজ্ঞেস করলে বললেন– তিনি তার ব্যাটের মান ধরে রেখে এবং এই মান আরো বাড়িয়ে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে যাচ্ছেন।

জানতে চাইলাম, কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার জন্য তার পরামর্শ কী হবে। বললেন– এ ব্যবসায় নতুন কেউ এলে তাকে সবার আগে বাজারজাতকরণের নিশ্চয়তা তৈরি করে নিতে হবে। প্রযুক্তি হিসেবে তিনি ব্যবহার করছেন দেশি যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক করাত। তার জনবল ৮জন। এদের দুজন মহিলা। মোট ২ জন দক্ষ। ব্যবসার হিসেব তার বাবাই দেখেন। রোজই তিনি হিসেবপাতি খাতায় লিখে রাখেন। ব্যাট তৈরির কাঁচামাল হিসেবে তারা ব্যবহার করছেন জীবন, ছাতিম, কদম, নিম, পিঠেগড়া ও আমড়া কাঠ।

এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন– পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে পারলে এবং ব্যাটের মান আরো বাড়াতে পারলে এ উদ্যোগের সম্ভাবনা বিপুল। ■

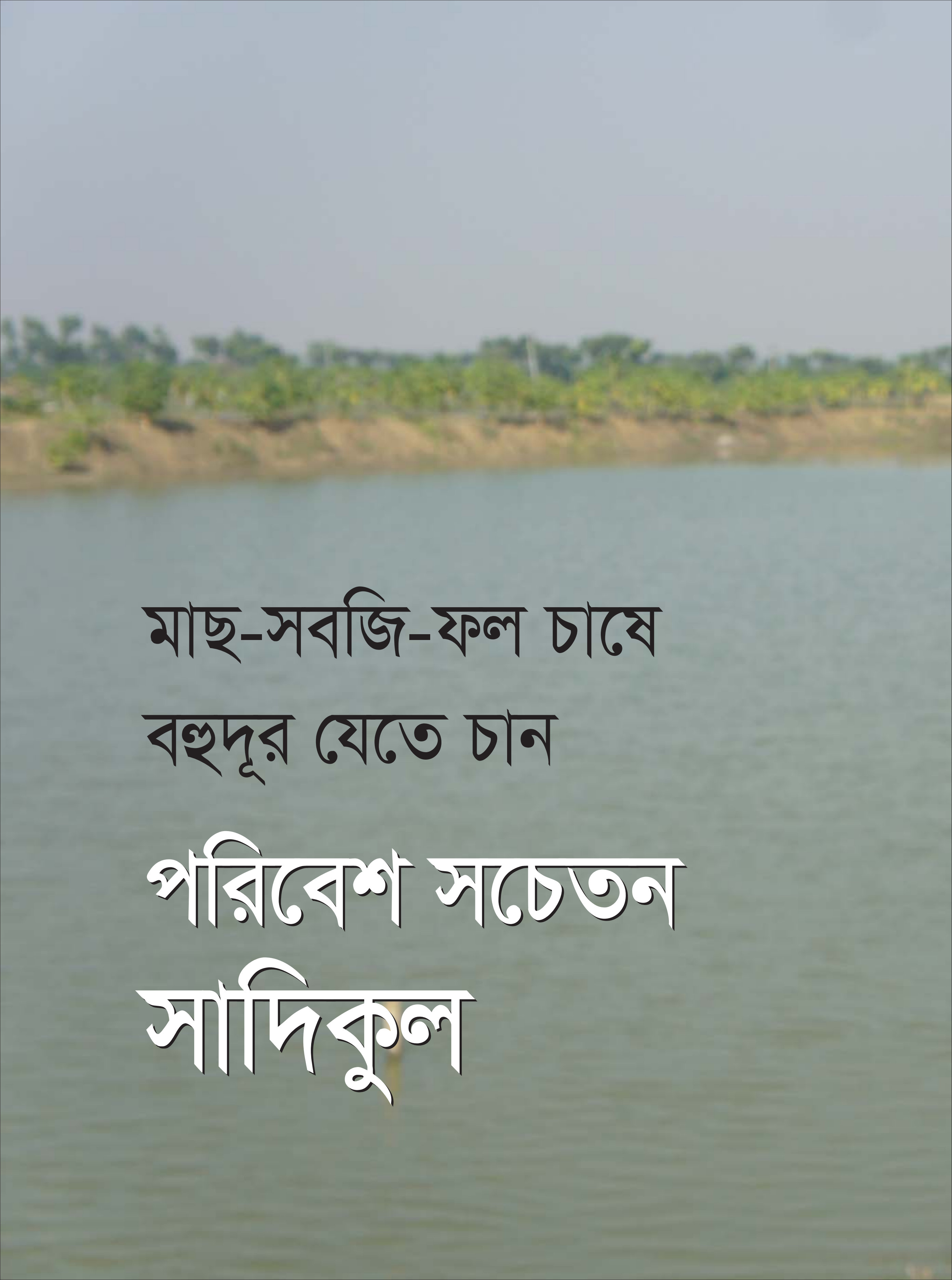
মাছ-সবজি-ফল চাষে
বহুদূর যেতে চান
পরিবেশ সচেতন
সাদিকুল

যশোর থেকে আমাদের গন্তব্য ছিল রাজশাহী। সেখানে মৎস্য-সবজি-ফলের দারুণ এক বহুমুখী খামারের সন্ধান দিয়েছেন রিশাদ। পরিবেশবান্ধব এই খামার ধারণ করছে রাজশাহীর বর্তমান প্রসিদ্ধিও। পরিবেশ বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজশাহী এখন বিশ্বের অন্যতম শুদ্ধ নগরী। এক সময় এটি ছিল এশিয়ার সবচেয়ে দূষিত নগরী। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে জানিয়েছে– বাতাসে মিশে থাকা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কণা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম স্থান অর্জন করেছে এই রাজশাহী নগরী। এই রাজশাহীরই দারুণ কীর্তিমান এক উদ্যোক্তার কাছে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন রিশাদ। রাজশাহীর পবার বাগদানিতে বিশাল জায়গা জুড়ে বিপুল সম্ভাবনাময় এক অ্যাগ্রো-ফিশারিজ ফার্ম গড়ে তুলেছেন সাদিকুল ইসলাম।

যশোরের মিস্ত্রিপাড়ার ক্রিকেট ব্যাটের কারখানা দেখে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হতে হতে ঘড়ির কাঁটা দুপুর সাড়ে বারোটা ছুঁই ছুঁই করছিল। যশোর-ঢাকা মহাসড়ক ধরে উত্তোরমুখো গাড়ি চালাচ্ছিলেন শ্যামল। এর আগে আমি গল্পে গল্পে ওকে জানিয়েছিলাম এই মহাসড়কটি শের শাহ্-এর আমলে নির্মিত এবং সে আমলের অনেক গাছ এখনো কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায় সড়কটির দু পাশে। এক জায়গায় তেমন কয়েকটি প্রাচীন গাছ দেখতে পেয়েই চিৎকার করে বলে উঠল সে– ‘ঠিকই কইছেন স্যার! এইগুলান মনে হয় সেই আমলের গাছ।’

ঢাকা-যশোর মহাসড়ক ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা যশোর-কুষ্টিয়া মহাসড়ক ধরে পশ্চিমমুখো চলতে শুরু করলাম। খুব চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল। লুৎফর ভাইকে বলতেই তিনি একটি বাজারের কাছে গাড়ি রাখতে বললেন। আমরা নেমে গিয়ে চা খেয়ে নিলাম। এরপর আবার শুরু হলো আমাদের যাত্রা।

আধা ঘণ্টা পরেই আমরা যশোর ছাড়িয়ে কুষ্টিয়ার সীমায় ঢুকলাম। মাঠ-ঘাট-পুকুর-গাছপালা– অনেকটা আগের মতোই। সবজি ক্ষেতের সংখ্যা কমতে থাকল। এখানেও নবান্নের রেশ। মাঠে মাঠে পাকা ধান। কোনো কোনো ক্ষেত থেকে এর মধ্যেই কেটে নেয়া হয়েছে, কোনোটায় রয়ে গেছে। তবে একটি নতুন মাত্রা যোগ হতে লাগল দৃশ্যপটে। আর তা হচ্ছে– ছাগল। ‘বেঙ্গল

সাদিকুলের সাফল্যের পেছনে

'খুব অভাবের সংসার ছিল। বাবা সংসার চালাতে খুব হিমশিম খাচ্ছিলেন। আমাদের এ অবস্থা দেখে আমার মামা আমাকে তার সংসারে নিয়ে যান লালন-পালনের জন্য। মামা-মামি আমাকে তাদের নিজেদের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। কিন্তু এইচএসসি পাস করার পর বাউন্ডুলে হয়ে যাই। একেবারে বখেই গিয়েছিলাম বলা যায়। মামা-মামি এবং আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামকৃষ্ণ অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাকে ভালো পথে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দেশে থাকলে বিগড়ে যাব বুঝতে পেরে বন্ধু রামকৃষ্ণ আমাকে ১ লাখ টাকা এবং একটি মোটরসাইকেল কিনে দিয়ে বলেছিল, 'বিদেশে চলে যাও এবং কিছু একটা করে খাও।' পরে আমি সেই মোটরসাইকেলও বিক্রি করে দিয়েছিলাম ৩৫ হাজার টাকায়। ১৯৯৩ সালে প্রথমে আমি ব্যাংকক এবং পরে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলাম। ব্যাংকক আমার মোটেও ভালো লাগেনি। এরপর গেলাম সিঙ্গাপুরে। সেখানে দেখলাম শ্রমিকদের ১১০ তলার ওপর সকাল ৮টায় ছাদে তুলে দিয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ছাদ পেটানোর কাজ করানো হচ্ছে। সারাদিন কাজ করে শান্তিতে ঘুমানোরও উপায় নেই। ১০ বাই ১২ ফুটের একটা রুমে ১৫ জন শ্রমিককে গাদাগাদি করে থাকতে হতো। এসব দেখে কয়েক দিনেই আমার বিদেশের ওপর থেকে মন উঠে যায়। ফিরে আসি দেশে। আবারো কিছুকাল বাউণ্ডুলে জীবনযাপন করলাম। এরপর ২০০০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদফতর থেকে প্রশিক্ষণ নিই। প্রশিক্ষণ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদফতর থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মাছ চাষ করব বলে ৭টি পুকুর ইজারা নিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার চরম ভরাডুবি হয়েছিল। পুরো মূলধনই লোকসান হয়েছিল। শেষমেশ আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধারদেনা করে সে ঋণ শোধ করেছিলাম। আবারো আমাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসে রামকৃষ্ণ। ২০০৩ সালে কিছু টাকা দিয়ে এবার সে তার নিজের বাড়ির ছাদে আমাকে একটি ব্রয়লার মুরগির খামার করে দেয়। মন দিয়ে কাজে লেগে গেলাম। বেশ ভালোই লাভ হচ্ছিল। ব্রয়লার মুরগি বিক্রি করে আমি সোনালি কক মুরগি তুলতাম খামারে। তারপর সোনালি কক বিক্রি করে ব্রয়লার তুলতাম। এভাবে পালাক্রমে ব্রয়লার ও সোনালি কক মুরগি পুষে লাভবান হতে থাকলাম এবং পোল্ট্রি ফার্মে আমার মন বসে গেল। মুরগির সঠিক যত্ন-আত্তির জন্য পড়াশোনাও শুরু করলাম। আশপাশের কোনো পোল্ট্রি খামারে সমস্যা দেখা দিলে পরামর্শের জন্য সবাই আমার কাছে ছুটে আসতো। কয়েক বছর আগে বাবা মারা যাওয়ায় সংসারের পুরো ভার নিজের কাঁধে চেপে গিয়েছিল। এরপর ২০০৪ সালে মামা মারা যাওয়ার পর মামার পরিবারের ৭ সদস্যের সংসারের দায়িত্বও আমাকে নিতে হয়। ২০০৭ সালে ৩ জন অংশীদার মিলে ৪২ বিঘা জমির ওপর ১৩টা পুকুর লিজ নিয়েছিলাম। রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প মাছের চাষ করতাম। ২০১০ সাল পর্যন্ত ৩ বছর এভাবে যৌথ অংশীদারত্বে মাছ চাষ করেছি। কোনো লাভও হয়নি, লোকসানও নয়। সংসার খরচ চলতো। ২০০৭ সালে যৌথ অংশীদারত্বে মাছ চাষের পাশাপাশি মৎস্য খাদ্যের (ফিশ ফিড) একটি দোকান দিই নহাটায়। আড়াই লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করেছিলাম, যার ২ লাখ টাকা দিয়েছিল বন্ধু রামকৃষ্ণ এবং বাকি ৫০ হাজার টাকা ছিল আমার নিজের। দোকানটি এখনো আছে এবং এটি এখনো পর্যন্ত লাভজনক। এদিকে ২০১২ সালে মাছ চাষের অংশীদাররা জানায় মোট ৪ লাখ ৩৯ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। আমি তখন পুরো লোকসান নিজের কাঁধে নিয়ে ১৩টি পুকুরের ভারই নিয়ে নিই। ২০১৪ সালের মাঝামাঝি নাগাদ আমার সেখানে ১০ লাখ টাকা লাভ হয়। এরপর আমি সে পুকুরগুলো ছেড়ে দিয়ে ১ বছরের জন্য ১৩টি পুকুর লিজ নিই ১৩ লাখ টাকায়। সেখানে আমার ২০ লাখ টাকা লাভ হয়। সেই টাকাতেই আমি ৩৫ বিঘা জমিতে এই অ্যাগ্রো ফিশারিজ ফার্ম গড়ে তুলেছি। আমি কোনো রাসায়নিক ব্যবহার করি না। আমার এই পুরো প্রকল্পই চলে জৈব পদ্ধতিতে। অনেক বড় স্বপ্ন দেখি আমি এই প্রকল্পটি নিয়ে। এটিকে বহুমুখী খামার হিসেবে লাভজনক করে তোলার পাশাপাশি ফিশ প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিও গড়ে তুলতে চাই। শুধু রফতানি নয়, দেশের বিশাল বাজারেও প্যাকেটজাত মাছ, সবজি, হাঁস-মুরগির মাংস, সবজি ও ফল পৌঁছে দিতে চাই ভোক্তার দুয়ারে।'

গোট'। আগের চেয়ে অনেক বেশি বেশি ছাগল চোখে পড়তে থাকল। কুষ্টিয়ার এই বিশেষ জাতের ছাগল আন্তর্জাতিকভাবে বেঙ্গল গোট নামে পরিচিত। আর এই কুষ্টিয়া গ্রেডের ছাগলের চামড়া মানগত দিক দিয়ে বিশ্বের এক নম্বর।

ইচ্ছে ছিল এদিনই রাজশাহীতে পৌঁছে পবায় সাদিকুল ইসলামের অ্যাগ্রো-ফিশারিজ ফার্ম দেখতে যাব। কিন্তু রাজশাহীতে পৌঁছতে পৌঁছতে দিনের আলোর আয়ু ফুরিয়ে এলো। হোটেলের সন্ধান করতে করতে পদ্মাপাড়ের কাছাকাছি চলে এলে লুৎফর ভাই পদ্মানদী দেখবেন বলে গাড়ি থামাতে বললেন। আমরা পদ্মার বাঁধানো ঘাটের কাছাকাছি আসতেই আকাশের পশ্চিম দিগন্তের ললাট থেকে বড় গোল লাল সূর্যটা নিচে নামতে নামতে পদ্মার জলে নিজেকে বিসর্জন দিল।

রাজশাহী ছুঁয়ে বয়ে চলা পদ্মায় সূর্যাস্ত

ফুটপাথ ধরে হেঁটে হেঁটে হোটেল খোঁজার সময় একটি দৃশ্য আমার চোখে লেগে গেল। আমি লুৎফর ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ফুটপাথে অন্যান্য পসরার মতো ফুল-ফল-সবজির চারা বিক্রি হচ্ছে এবং মানুষ তা ভিড় করে কিনছেও। বুঝলাম এমনি এমনি রাজশাহী বিশ্বখ্যাত পরিবেশ-বান্ধব নগরী হয়ে ওঠেনি। এটি একটি সমন্বিত সামাজিক প্রয়াস। এখানকার অধিবাসীরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন– পরিবেশকে রক্ষা করতে না পারলে তাদের অস্তিত্ব বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। বড় ভালো হয়ে গেল মনটা।

পরদিন, অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর (২০১৬) সকাল নটায় আমরা রওনা হলাম পবার উদ্দেশে। চলতে চলতে রিশাদ মোবাইল ফোনে যোগাযোগ রেখে পথের দিশা জেনে নিচ্ছিলেন সাদিকুল ইসলামের কাছ থেকে। কাছাকাছি আসতেই একটি পথের মোড় থেকে মোটর সাইকেলে সাদিকুল আগে আগে গিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে গেট দিয়ে ঢুকেই মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকলাম বিশাল বহুমুখী খামার। উঁচু করে পাড় বাঁধানো বেশ কয়েকটা পুকুর। পাড়ে পেঁপে, আম্রপালি, মাল্টা, ড্রাগন, পুঁইয়ের মহা সমারোহ। পেঁপে গাছগুলোয় ধরে আছে থোক থোক পেঁপে। মুগ্ধতার

ঘোর কাটতেই ক্যামেরা তুলে নিলাম হাতে। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে ছবি তোলার পর একটি টিনের শেডে নিয়ে বসালেন এবং পুকুরপাড়ের গাছ থেকে আধাপাকা পেঁপে আনিয়ে ধনেপাতা-মরিচ দিয়ে মেখে পরিবেশন করলেন। রোদে হেঁটেছি বলেই কিনা– দারুণ মজা লাগল। রিশাদ মন্তব্য করলেন, 'অর্গানিক পেঁপে তো, মজাই আলাদা'।

পবা উপজেলার বাগদানি ও হাড়দহ গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় সাদিকুলের এই বহুমুখী খামারটি। তার বয়স এখন ৫১। সংসারের কথা জানতে চাইলে জানালেন– তাকে দুটি সংষার টানতে হয়। নিজের সংসার ৪জনের– স্বামী-স্ত্রী-কন্যা-পুত্র। স্ত্রী মরিয়ম ইসলাম এইচএসসি পাস। ছেলে সাইদ মুল্লা ক্লাস ফাইভে এবং মেয়ে সাদিকা ইসলাম পড়ে ক্লাস ফোরে। এ ছাড়া ৭ সদস্যের মামার সংসারও এখন তাকে চালাতে হয়।

তার উদ্যোগের নাম সাইদ ফিসারিজ। এটি একটি অ্যাগ্রো ফিসারিজ ফার্ম। ২০১৬ সালের মার্চ থেকে এই উদ্যোগ শুরু করেছিলেন। তবে ২০০০ সাল থেকেই তিনি মাছ চাষ করছেন। প্রাথমিক পুঁজি ছিল ৪২ লাখ টাকা (এই উদ্যোগে)। তার ভেতরে নিজস্ব পুঁজি ছিল ২০ লাখ টাকা। এজন্য তিনি এনআরবি-সি (কমার্সিয়াল) ব্যাংক থেকে ২২ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন।

উদ্যোগটি প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল কিনা, না থাকলে কতদিন পর থেকে লাভের মুখ দেখছেন জানতে চাইলে জানালেন– এখনো বাজারজাত শুরু করেননি। সেদিনই (১৬-১১-২০১৬) প্রথম তার এ উদ্যোগের পুকুরগুলোতে তিনি জাল ফেলবেন। এ বছরের মার্চ থেকে ফার্মটি চালু করেছেন। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন পর্যন্ত তিনি এখান থেকে কোনো মাছ বিক্রি করেননি বলে উদ্যোগটির প্রবৃদ্ধিসংক্রান্ত তথ্য অজানাই থেকে গেল। অগত্যা জানতে চাইলাম– আপনার তো বিশাল প্রকল্প। এখন পর্যন্ত এর যতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন তাতে কি আপনি সন্তুষ্ট ? জবাবে জানালেন– হ্যাঁ। তিনি বেশ সন্তুষ্ট।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ উদ্যোগে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন তা কি নিজস্ব, নাকি কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ গুণ অর্জন করেছেন? একটু গর্বের হাসি দিয়ে

বললেন– এ জৈব কৃষিভিত্তিক মৎস্য খামারের পুরো ব্যবস্থাপনা তার নিজস্ব। শুধু ব্যবস্থাপনা নয়, পরিকল্পনা এবং ব্যবসায়িক কৌশলও নিজস্ব। তবে যুব উন্নয়ন অধিদফতর থেকে নেয়া প্রশিক্ষণ এ ক্ষেত্রে তার বেশ কাজে লেগেছে।

কোন ভরসায় আপনি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন জানতে চাইলে জানালেন– নিজের ওপরেই তার সবচেয়ে বড় ভরসা। তবে তাকে তার সকল কাজে একজনের ওপর ভরসা রাখতেই হয়। তিনি হচ্ছেন তার বন্ধু এবং অবশ্যই প্রকৃত অর্থেই বন্ধু শ্রী রামকৃষ্ণ হালদার। এরপর স্মৃতি হাতড়ে বললেন– 'খুব বাউণ্ডুলে ছিলাম। এক সময় তো পুরোপুরি বখেই গিয়েছিলাম প্রায়! আমার এই বন্ধু তখন আমাকে জীবনের সৃষ্টিশীলতায় ফিরিয়ে আনেন। প্রথম থেকেই আমি যা কিছু করেছি তা তার ভরসাতেই করেছি। আমার সকল কাজে সে বটবৃক্ষের আশ্রয়। এখনো আমার সবচেয়ে বড় ভরসা আমার এই বন্ধু।

প্রশ্ন করলাম– প্রথম অবস্থায় কীভাবে বাজারজাত করতেন? জবাবে বললেন, 'আগেই বলেছি, এই প্রকল্প থেকে এখনো বাজারজাত শুরু করিনি। তবে আমি অনেক আগে থেকেই পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করতাম এবং সেখানকার মাছ গাড়িতে করে ঢাকায় নিয়ে বাজারজাত করতাম।'

বাজার সম্প্রসারণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাইলে জানালেন– রাজশাহীর অন্যান্য মাছচাষির মতো তিনিও প্রধানত ঢাকায় মাছ বাজারজাত করে থাকেন। রাজশাহীর ৫টি উপজেলা থেকে রোজ গড়ে ১২০টি তাজা মাছের ট্রাক ঢোকে ঢাকায়। এভাবে মাছ বাজারজাত করা অনেক ঝামেলার। খরচও পড়ে অনেক বেশি। তাই তিনি ভাবছেন কৌশলে বাজার সম্প্রসারণ করবেন। ইচ্ছে রয়েছে, মামুলিভাবে বাজারজাত না করে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বাজারজাত করবেন। সঠিক ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে বাজারজাত করলে তাতে তার বাজার যেমন সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বাড়বে, তেমনি ভোক্তারাও অনেক দিক দিয়ে লাভবান হবেন। প্রক্রিয়াজাত মাছ রফতানিরও ইচ্ছে রয়েছে তার। এ ক্ষেত্রে তিনি অন্য সব মাছচাষির চেয়ে একদিক দিয়ে এগিয়ে আছেন। সেটি হচ্ছে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের নিশ্চয়তা। মাছের পুকুরে তো বটেই, পুকুরের পাড়ে যে শাক-সবজি ও ফল চাষ করছেন সেখানেও তিনি জৈব পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। মুরগির খামার পরিচালনা করে আসছেন প্রায় প্রথমদিক থেকেই। মুরগির রোগবালাইয়ের ওপর তার রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। এ নিয়ে কিছু পড়াশোনাও করেছেন। একবার রাজশাহীর কোনো এক জায়গার পুকুরে মাছের মারাত্মক রোগ হলে তাকে ডেকে নেয়া হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন সে পুকুরের মাছকে খাদ্য হিসেবে মুরগির বিষ্ঠা দেয়া হতো। তিনি সেই মুরগির ব্যাপারে তদন্ত করে জানতে পেরেছিলেন– মুরগিগুলোর এক ধরনের অসুখ হলে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হয়েছিল। তিনি সেই মুরগির বিষ্ঠা পরীক্ষা করে হজম না হওয়া অ্যান্টিবায়োটিকের অস্তিত্ব পেয়েছিলেন। সুতরাং মাছের খাদ্যের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। তার মাছ, সবজি, ফল– সবই অর্গানিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন। প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রফতানি, বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলোতে রফতানি করতে গেলে খাদ্য-নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করতে হয়। আর সেদিক দিয়েই অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছেন তিনি।

যে কোনো ব্যবসায়ই সফলতার অন্যতম শর্ত হচ্ছে চাহিদা। কেউ যদি তার পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করতে না পারে তা হলে তার ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা প্রায় শতভাগ। আপনার পণ্যের চাহিদা কেমন– আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'বেশ ভালো। কারণ আমার পণ্যের ভোক্তাদের একটা অংশকে জানাতে সক্ষম হয়েছি যে আমার মাছ ও কৃষিপণ্য নিরাপদ। এখানে কোনো ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় না।'

চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা জানতে চাইলে বললেন, 'আমি মনে করি স্থানীয় ও দেশীয় প্রেক্ষিতে অনেকটাই পেরেছি। রফতানিতে যাওয়ার আগে আমি অবশ্যই আন্তর্জাতিক চাহিদা খুঁটিয়ে জেনে নেব।'

জানতে চাইলাম– এ ধরনের উদ্যোগ কেন গ্রহণ করলেন? বললেন, 'মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। দিনদিনই এ খাতে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর সঙ্গে যদি নানামুখী মাত্রা যোগ করা যায় তা হলে

মুনাফার পরিমাণ অনেক বাড়ানো সম্ভব। জানেন তো, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রোডাক্টের চেয়ে বাই-প্রোডাক্টে লাভ বেশি থাকে! আমি মাছ চাষের সঙ্গে আপাতত পুকুরপাড়ে ফল ও সবজি চাষ করছি, ইচ্ছে আছে এর সঙ্গে বিশ্বখ্যাত বেজিং ডাক (এ নামেই হাঁসটি সারাবিশ্বে পরিচিত। ডিম নয়, মাংসের জন্য বিখ্যাত এটি। একেকটি হাঁস ৪ থেকে ৫ কেজি ওজনের হয়ে থাকে।) পালনের। মাংসের পাশাপাশি এই হাঁসের পালকও রফতানি করা যায় চীনে, যেখানে সেগুলো দিয়ে শাটল কক তৈরি করা হয়। তো আমি আশা রাখি এইভাবে আমার এই উদ্যোগকে নানা মাত্রা যোগ করে অনেক লাভজনক করে তুলতে পারব। আর এজন্যই আমি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

এ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল জানতে চাইলে বললেন, বেশ উজ্জ্বল। তবে অতিমুনাফালোভী মাছ ব্যবসায়ীরা স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি না মেনে এ উদ্যোগের হুমকি হয়ে উঠতে পারে– সে আশঙ্কা মাথায় রেখেই পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হবে।

অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সবে তিনি হালে পানি পেতে শুরু করেছেন। এখনো তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে অনেক বাধা। তার এখনকার প্রতিবন্ধকতার কথা শুনতে চাইলে বললেন, বাজারজাতকরণের সেকেলে পদ্ধতি অনেক সময় লোকসানের কারণ হয়ে দেখা দেয়। তা ছাড়া রোগবালাইও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। তবে তিনি সচেতন থেকে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারবেন বলে মনে করেন।

কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে– জিজ্ঞেস করলে বললেন, এ ধরনের উদ্যোগ নিতে হলে শুরুর আগেই ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করে, সার্বিক জ্ঞান অর্জন করে কাজে নেমে পড়তে হবে। প্রাথমিক ব্যর্থতায় হতাশ হলে চলবে না।

এখনো পর্যন্ত তিনি তার কৃষি-মৎস্য খামারে ম্যানুয়াল পদ্ধতিই প্রয়োগ করছেন। তবে প্রসেসিংয়ে নামলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিই প্রয়োগ করবেন। বর্তমানে তার জনবল ৭ জন। এর মধ্যে ২ জন দক্ষ। হিসেবের বেলায় তিনি খুব কড়া। কর্মচারিরা তার কাছে যার যার হিসেব দাখিল করে, তিনি সেগুলো নিজে সংরক্ষণ করেন এবং সমন্বয় করে সব সময় হিসেবখাতায় হালনাগাদ করে রাখেন।

'খুব বাউণ্ডুলে ছিলাম। এক সময় তো পুরোপুরি বখেই গিয়েছিলাম প্রায়! আমাকে জীবনের সৃষ্টিশীলতায় ফেরান বন্ধু রামকৃষ্ণ হালদার। প্রথম থেকেই আমি যা কিছু করেছি তা তার ভরসাতেই করেছি। আমার সকল কাজে সে বটবৃক্ষের আশ্রয়।

শেষ করলেন আশার আলো ছড়িয়ে। বললেন, এ উদ্যোগে সফল হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

এরপর আমরা তার সাফল্য কামনা করে বিদায় নিলাম।

কৃষিযন্ত্র

বাংলাদেশে এখন এক লাভজনক ব্যবসা

কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির এক প্রতিষ্ঠান এই ধরনের ধান কাটার রিপার মেশিন বাজারজাত করছে, যা আমরা যশোর থেকে রাজশাহী যাওয়ার পথে দেখেছিলাম

HONDA
GX

কৃষিতে বাংলাদেশের উন্নতি বেশ চোখে পড়ার মতো। এক সময় আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে দেখতাম– উন্নত দেশের লোকেরা কত্তসসব কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করছে! হাতে কোনো কাজই করতে হয় না ওদের। এতে উৎপাদনও বাড়াতে পারে তারা আশ্চর্য রকমের। দেখতাম আর অবাক হয়ে ভাবতাম– আমাদের দেশে কি কোনোদিন সম্ভব হবে কৃষিতে এতোসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার? তারপর সময় যত গড়াতে লাগল ততই উল্টো অবাক হতে হলো। বাংলাদেশের কৃষকেরা এখন এতো ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করে? তাও আবার নিজেদের দেশে তৈরি যন্ত্র! জমিতে চাষ দেয়া, শস্য বোনা, ক্ষেত থেকে শস্য কাটা, মাড়াই কৃষির ইত্যাদি প্রায় সব ধাপেই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে যন্ত্র। আগে পাওয়ারটিলার বলতেই ছিল চীন, জাপান, কোরিয়া, ইতালি, ভিয়েতনাম এসব দেশ থেকে আমদানি করা। এখন গায়ে 'মেড ইন বাংলাদেশ' পাওয়ারটিলারও বেশ চোখে পড়ে। কৃষিতে এমন যান্ত্রিকীকরণে বাংলাদেশের শস্য উৎপাদন বেড়েছে, বাড়ছে এবং বাড়বে ক্রমবর্ধমান হারে। এই যান্ত্রিকীকরণের কারণেই গত ২৫ বছরে শস্য উৎপাদন বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। তবে এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্র রয়ে গেছে সেকেলে পদ্ধতির কবলে। কৃষির প্রতিটি স্তরে কৃষিযন্ত্র ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ত আরো কয়েকগুণ।

ব্যক্তি উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ব্যবসা সম্প্রসারণ– উভয়ভাবেই নির্মিত হচ্ছে কৃষিযন্ত্র। দেশের কৃষি উন্নয়নে তো বটেই অর্থনৈতিক উন্নয়নেও এসব উদ্যোগ ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। অনেক সময় নিজের কৃষিসমস্যা সমাধানে আপন খেয়ালেও অনেকে সংযোজন করে চলেছেন চমৎকার সব উদ্ভাবন। যেমন ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার রুকনাকান্দা গ্রামের কাঠমিস্ত্রি মো. আবদুল্লাহ আল পাঠান– এলাকার সবাই যাকে কেনু মিস্ত্রি নামে চেনে। বছর চল্লিশেক আগে গ্রামের কৃষকদের আগাছা পরিষ্কারে দিশেহারা অবস্থা দেখে এ ব্যাপারে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করলেন প্রচণ্ডভাবে। পুরো একরাত ঘুমুতেই পারলেন না এই চিন্তা করে করে। ঘুমহীন টকটকে লাল চোখে ভোররাতেই হাত লাগালেন কাজে। কল্পনায় নকশা ছকে হাতুড়ি-বাটাল ঠকঠকিয়ে এক সময় তৈরি করে ফেললেন কাঠের হাতলঅলা লোহার পাতের একটি নিড়ানিযন্ত্র। সেই থেকে একে একে ৪৪টি কৃষিযন্ত্র উদ ‌ভাবন করেছেন তিনি।

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার বাসুদেবপুর গ্রামের কৃষক আনোয়ার হোসেন নিজের তাগিদেই তৈরি করে ফেললেন এমন এক যন্ত্র– যা দিয়ে ধান কাটা, মাড়াই এবং চাড়া রোপণ সবই করা যায়।

ক্ষেত থেকে পাটগাছ দ্রুত কাটা এবং গাছ থেকে ছাল তথা আঁশ ছাড়ানোর খুবই সাশ্রয়ী দুটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন বগুড়ার যন্ত্রকৌশলী আমির হোসেন। তার তৈরি অটোকাটিং মেশিনে যেমন খুব দ্রুত ক্ষেত থেকে পাট কেটে নেয়া যায়, তেমনি তার তৈরি অটোরিবন মেশিনে পানিতে জাগ না দিয়েই, অর্থাৎ নদী, বিল, পুকুর বা ডোবায় পাট পচিয়ে পানিকেও দূষিত করার অপকর্মটি না করেই গাছ থেকে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে, পরে তা পানিতে ভিজিয়ে রেখে পাওয়া যাবে উন্নত ও মসৃণ আঁশ। এ যন্ত্রের এক ইউনিটের জন্য খরচ পড়ে মাত্র ১০ হাজার টাকা।

কৃষিযন্ত্র তৈরিতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বগুড়া। দেশের ৮০ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রফতানি হচ্ছে বগুড়ার ফাউন্ড্রি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপগুলোতে তৈরি কৃষিযন্ত্র। এখানকার কৃষি ও সেচযন্ত্র যাচ্ছে ভারত, নেপাল ও ভুটানে। মানের দিক দিয়ে চীন ও জাপানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বগুড়ার কৃষিযন্ত্র।

কৃষিযন্ত্রের এক বিশাল বাজার এখন বাংলাদেশ। আর সে সুযোগটাই নিচ্ছেন বুদ্ধিমান উদ্যোক্তারা। এখন তারা দেশেই তৈরি করে বাজারজাত করছেন নানা রকমের কৃষিযন্ত্র। যশোর থেকে রাজশাহীতে যাওয়ার পথে এমন এক কৃষিযন্ত্রই চোখের সামনে মেলে ধরল দেশে এ ব্যবসার বিপুল সম্ভাবনার বাস্তব ছবি।

হঠাৎ পথের পাশের এক ধানক্ষেতে রিপার মেশিনে ধান কাটা হচ্ছে দেখতে পেয়ে রিশাদ জানালো, সম্প্রতি

আমার খুব আনন্দ হব যদি বাংলার সব কৃষকেরে যন্ত্রপাতিগুলা দিতে পারতাম! তাইলে তাগোর কাজ অনেক সহজ হইতো -

কেনু মিস্ত্রি (মো. আব্দুল্লাহ আল পাঠান): ৪২ প্রকার কৃষিযন্ত্রের উদ্ভাবক

রূপনাকান্দা, ডেউহাকলা, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ

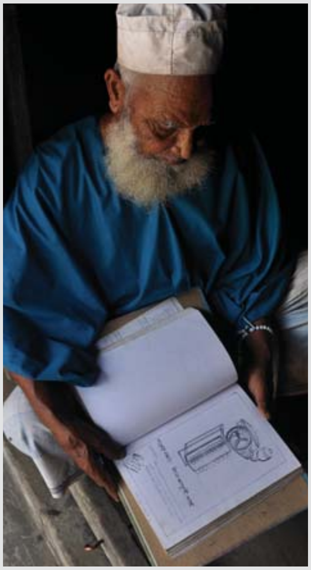

ময়মনসিংহের মো. আব্দুল্লাহ আল পাঠান কেনু মিস্ত্রি নামে পরিচিত। পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই উদ্ভাবন করেছেন ৪২ প্রকারের হস্তচালিত কৃষি যন্ত্র, যা কৃষকের কাছে পৌঁছানো গেলে চাষকে করবে সহজ ও সাশ্রয়ী।

সত্তরের দশকে কাঠের হাতলওয়ালা লোহার পাতের নিড়ানি যন্ত্র উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে উদ্ভাবক কেনু মিস্ত্রির যাত্রা শুরু। তখন ইরি ধানের মৌসুম। গ্রামের সব কৃষক খেতের আগাছা পরিষ্কার করতে দিশেহারা। সারাদিন কাজ করে পাঁচজন মজুর মাত্র আট শতাংশ জমির আগাছা পরিষ্কার করতে পারছেন। কৃষকদের এই নাজেহাল অবস্থায় কেনু মিস্ত্রি উদ্ভাবন করলেন কাঠের হাতওয়ালা লোহার পাতের নিড়ানি যন্ত্র। নাম দিলেন সেনি উইডার। এই নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে একজন মজুর একদিনে ১২ শতাংশ জমির আগাছা পরিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।

তার তৈরি কিছু যন্ত্র হলো: ● ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্র ● মাটি খননের আগর যন্ত্র ● উঁচু গাছে কীটনাশক প্রয়োগ যন্ত্র ● বিভিন্ন ফসলের বীজ বপনে উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন বীজ বপন যন্ত্র ● গুটি সার প্রয়োগ যন্ত্র ● আঁচড় যন্ত্র ও চারধরনের নিড়ানি-যন্ত্র ● সহজে জমিতে সেচ দেয়ার পাড়াকল, সোন ও জাতকন্দা ● আধুনিক কোদাল, খন্তা ● গভীর কাদা থেকে সহজে মাছ শিকার যন্ত্র 'হওড়া'।

গবেষণার মাধ্যমে দেশকে কৃষি প্রযুক্তিতে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান মোঃ ইয়াহিয়া মোল্লা লিপটন

স্বল্পমূল্যে অধিক কার্যকর চারা রোপণ যন্ত্র, সার প্রয়োগ যন্ত্র এবং সহজ ও সাশ্রয়ী বায়োগ্যাস প্লান্ট-এর উদ্ভাবক

বানেশ্বর, পানিতলা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

লিপটন বহুমুখী সার প্রয়োগ যন্ত্র

লিপটন কম্বাইন হারবেষ্টর

কৃষিকে লাভজনক করতে, মো. ইয়াহিয়া মোল্লা লিপটন ব্যক্তিগত উদ্যোগে গবেষণা শুরু করেন। উদ্ভাবন করেন ধান চারা রোপন যন্ত্র, সার ছিটানোর যন্ত্র এবং সহজে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কৌশল।

লিপটন উদ্ভাবিত ধান চারা রোপনযন্ত্র দামে সস্তা, সহজে তৈরিও করা সম্ভব। নির্দিষ্ট দূরত্বে ও সারিবদ্ধভাবে ধান চারা রোপন করতে বীজতলা থেকে চারা উঠিয়ে এই যন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিয়ে মইয়ের মত টেনে নিলেই হবে। দুই জন শ্রমিকের এক একর জমিতে ধান চারা রোপন করতে সময় লাগবে মাত্র একদিন।

লিপটনের সার ছিটানোর যন্ত্র ব্যবহার করলে প্রতি ১০০ কেজিতে কমপক্ষে ৪০ কেজি সার সাশ্রয় হয় এবং ফসল উৎপাদন ২০-২৫% বাড়ে। লিপটনের নামেই এই যন্ত্রের নামকরণ করা হয়েছে।

বিদেশী প্রযুক্তিতে একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করতে একজন অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর তত্বধানে ব্যয় হয় ৩০-৪০ হাজার টাকা। লিপটনের উদ্ভাবিত বায়োগ্যাস প্লান্ট যে কেউ মাত্র ১০-১২ হাজার টাকায় নিজেই স্থাপন করতে পারবেন।

এসব কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেছেন স্বশিক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জাতীয় পুরস্কার ২০১৪। বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ফার্টিলাইজার ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে চুক্তিভিত্তিক গবেষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

লিপটন উদ্ভাবিত কিছু কৃষি যন্ত্র-

- বহুমুখী সার প্রগোয় যন্ত্র
- ধান কাটাই মাড়াই ঝারাই যন্ত্র
- লিপটন ইনজেক্টর গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ যন্ত্র।
- লিপটন সিঙ্গেল হুইল সিলিন্ডার কাপ টাইপ গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ যন্ত্র।
- লিপটন হস্তচালিত আলু বীজ বপন যন্ত্র ।
- লিপটন ভূট্টাবীজ বপন যন্ত্র।

বাংলাদেশের বেশকিছু প্রতিষ্ঠান ভিয়েতনাম, কোরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে যন্ত্রাংশ আমদানি করে রিপার মেশিন বাজারজাত করছে। শস্য কাটার বড় যন্ত্রের নাম হার্ভেস্টার, আর ছোট যন্ত্রের নাম রিপার। বিশাল কৃষিফার্মের জন্য হাভেস্টার উপযোগী, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকদের খেষত ছোট ছোট, তাই এখানে রিপারই এ ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি। আমি একটি ছবি তুলে নেয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। লুৎফর ভাইকে বলতেই সোৎসাহে তিনি গাড়ি থামাতে বললেন। আমি ক্যামেরা নিয়ে মেশিনে ধান কাটতে থাকা ক্ষেতটির দিকে দৌড়ে ছুটে গেলাম। কয়েকটা উৎসাহী তরুণ উদ্যোক্তারা এই উদ্যোগটির ব্যাপারেও ভেবে দেখতে পারেন। কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি তাদের জন্য খুব লাভজনক উদ্যোগ হয়ে উঠতে পারে। দেশে কৃষিতে উৎপাদন এখন অনেক বেড়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ধান রফতানিও হচ্ছে। এখন আর কেবল ধান-পাট-আখ ইত্যাদি প্রচলিত শস্যতেই গণ্ডিবদ্ধ নেই বাংলাদেশের কৃষি, বহুমুখী শস্য উৎপাদনে দিনদিনই সমৃদ্ধ হচ্ছে নানা মাত্রায়। আর এর সবই সম্ভব হয়েছে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায়। অনিবার্য কারণেই কৃষি-যন্ত্রপাতির বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। আগ্রহী উদ্যোক্তারা সুযোগটা

কৃষিযন্ত্র তৈরিতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বগুড়া। দেশের ৮০ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রফতানি হচ্ছে বগুড়ার ফাউন্ড্রি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপগুলোতে তৈরি কৃষিযন্ত্র। এখানকার কৃষি ও সেচযন্ত্র যাচ্ছে ভারত, নেপাল ও ভুটানে। মানের দিক দিয়ে চীন ও জাপানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বগুড়ার কৃষিযন্ত্র

আমির হোসেনের তৈরি পাট রিবন রেটিং মেশিন ও পাটগাছ কাটা মেশিন

বারি বীজ বপন যন্ত্র

ছবি তুলে পেছনে তাকিয়ে দেখি তুমুল উৎসাহে লুৎফর ভাইও এরই মধ্যে নেমে এসেছেন ক্ষেতের কাছে। সঙ্গে রিশাদও। 'মেটাল ফার্ম মেশিনারি হাব' নামে একটি কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির প্রতিষ্ঠান এই মেশিনটি তৈরি করেছে। আমি ছবি তুলছি দেখতে পেয়েই প্রতিষ্ঠানটির ব্যানার নিয়ে ক্ষেতের ভেতরে গিয়ে রিপার মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে গেল কয়েকজন। কাজে লাগাতে পারেন। সঠিক পরিকল্পনা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করলে এ ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই লাভের মুখ দেখাতে থাকবে। ব্যাংক এবং অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানও সময়োপযোগী বিবেচনায় অর্থায়ন করতে পারে এসব উদ্যোগে। ■

কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো এবং সাবেক জার্মান চ্যান্সেলর হেলমুট কোহ্লসহ অনেক বিশ্বনেতার প্রিয় খাবারের মর্যাদা লাভ করেছিল এই হাঁস। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার প্রথমবার চীন সফরে গিয়ে বেজিং ডাকের রোস্ট খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় চীন সফরের পেছনেও ছিল এ হাঁসের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ

বেজিং ডাক

চীনা হেঁশেল থেকে সগৌরব পরিক্রমায় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের খানদানি হেঁশেলগুলোতে ভোজনবিলাসীদের দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে যায় বেজিং ডাক। এই বেজিং ডাকের রোস্ট খেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত অনেক গুণীজন। চীন ভ্রমণে যাওয়া পর্যটকেরা এই হাঁসের সুনাম বয়ে নিয়ে যান পৃথিবীর নানা প্রান্তে এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এটি চীনের অন্যতম জাতীয় প্রতীকে পরিণত হয়। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো এবং সাবেক জার্মান চ্যান্সেলর হেলমুট কোহ্লসহ অনেক বিশ্বনেতার প্রিয় খাবারের মর্যাদা লাভ করেছিল এই হাঁস। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার প্রথমবার চীন সফরে গিয়ে বেজিং ডাকের রোস্ট খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় চীন সফরের পেছনেও ছিল এ হাঁসের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ।

প্রাচীন চীনা সম্রাটদের আমল থেকেই এই হাঁসের রোস্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বেজিং ডাকের এক ধরনের রোস্ট করে পরিবেশন করা হয়েছিল ইউয়ান সাম্রাজ্যের সম্রাটকে। চীনা রাজকীয় হেঁসেলের খাদ্য তালিকায় এর উল্লেখ পাওয়া যায় ১৩৩০ সালে। বেজিংয়ের রেস্তঁরায় এই রোস্ট তৈরি হতে থাকে ১৪১৬ সাল থেকে।

এই হাঁসেরই সন্ধান পেয়ে গেলাম নওগায়। ১৬ নভেম্বর (২০১৬) পবায় সাদিকুলের বহুমুখী খামার দেখে তৃপ্তির মাত্রাটা এতটাই তুঙ্গস্পর্শী ছিল যে, আগামী বাংলাদেশের সমৃদ্ধ চেহারাটা যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারছিলাম।

কল্পনায় সাদিকুলের মতো সৃষ্টিশীল মানুষদের স্বপ্নসৌধে সুখের আবেশে বুঁদ হয়ে ছিলাম বোধ হয়। 'এবার নওগাঁ চলো' রিশাদ ড্রাইভার শ্যামলকে নির্দেশ দিতেই ঘোরটা কেটে গেল। ফিরে এলাম বাস্তবে। সেখানে তখন চলন্ত গাড়ির দু পাশে চিরায়ত বাংলার চলমান প্রতিচ্ছবি। সবুজ-সোনালি-লাল-হলুদের বর্ণিল চিত্রপট। মাঠের পর মাঠ ধান আর ধান। কোথাও আবার কেটে নেয়া ধানের ক্ষেতে বাবুই-চড়ুই-শালিকের চকিত ডানায় রোদের সোনালি চমক। আগে কখনো নওগাঁ যাইনি। ধারণা নেই কতদূর যেতে হবে। জানতেও চাইলাম না। আমাদের নিয়ে যাক না গাড়ি নতুন নতুন গাঁয়ের, মাঠের, নদীর, খালের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে! যেতে থাক! তিন রাস্তার এক মোড় থেকে ভুল পথে চলে গিয়েছিলাম। গাড়িতে যে চারজন আছি তাদের কেউ আগে নওগা যাইনি। যার কাছে যাচ্ছি তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলে বলে রিশাদ আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

দুপুর প্রায় দেড়টায় আমরা পৌঁছে গেলাম নওগাঁর আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামারের গেটে। ডেভেলপমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আমাদের স্বাগত জানিয়ে এই আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামারের ব্যবস্থাপক মহম্মদ আবদুল হামিদের কক্ষে নিয়ে গেলেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমরা পরস্পর পরিচিত হলাম। এরপর আলাপে আলাপে জানা গেল, এখান থেকে তারা সারাদেশের খামারীদের একদিন বয়সের হাঁসের ছানা সরবরাহ করেন। এখন তারা চার প্রজাতির হাঁসের ছানা সরবরাহ করছেন। এই দুই সরকারি কর্মকর্তার উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ক্রমেই মুগ্ধ হচ্ছিলাম। সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যাপারে আমার পূর্বধারণা ভেঙে যাচ্ছিল। সরকারি

এ হাঁসের পাখনার পালক থেকে তৈরি হয় ব্যাডমিন্টন খেলার শাটলকক। এসব পালক কিনে নেয় শাটলকক তৈরির চীনা কোম্পানি।

কর্মকর্তা বলতেই গা-ছাড়াভাবে কোনো রকমে হাজিরা দিয়ে দায়িত্ব পালনে অনীহ যে অলস প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে মনের পর্দায় তার সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না এই দুই তরুণ সরকারি কর্মকর্তার। দুজনের চোখেই কিছু একটা করে দেখানোর অদম্য স্পৃহার দ্যুতি খেলা করছিল। একজন আরেকজনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে তারা সোৎসাহে বলে যাচ্ছিলেন কী করে তারা খামারীদের হাঁস পালনে উদ্বুদ্ধ করছেন, লাভের সহজ ও কার্যকর পথটা দেখিয়ে দিচ্ছেন। তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন ডিমের জন্য কোন হাঁস, আর মাংসের জন্য কোন হাঁস পুষতে হবে। তারা শুধু হাঁসই পালন করেন না, এই বিশাল সরকারি কমপ্লেক্সে তারা হাঁসের বিষ্ঠা পচিয়ে জৈব সার তৈরি করে নানা রকমের সবজি ও ফলমূলও চাষ করেন। পরে ঘুরে ঘুরে জাহাঙ্গীর তার বাগান দেখাতে দেখাতে বলেছিলেন, 'হাঁসের খামারীরা বাড়তি পাওনা হিসেবে হাঁসের বিষ্ঠা থেকে জৈব সার তৈরি করতে পারেন, যা মাটির গুণ রক্ষায় সহায়ক হবে। খোশগল্পে কেটে গেল বেশ খানিকটা সময়। ব্যবস্থাপক আবদুল হামিদ চমকটা দিলেন একটু পরেই। বললেন– নতুন জাতের হাঁস এনেছিলেন তারা বছর তিনিক আগে। বেজিং ডাক। দারুণ সাড়া ফেলেছে এটি হাঁস খামারীদের ভেতর।

বেজিং ডাক? ঠিক শুনলাম তো? নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম– রোস্টের জন্য বিশ্বখ্যাত সেই বেজিং ডাক? আমার প্রশ্ন শুনে তারা দুজনেই হেসে উঠলেন। বুঝলাম আনাড়ির মতো প্রশ্ন করে ফেলেছি। হাসি থামিয়ে জাহাঙ্গীর বললেন, 'হ্যাঁ সেই বেজিং ডাক। আপনার হয়তো জানা নেই, প্রায় বিশ বছর আগে প্রথম এই হাঁস আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু তখন খুব একটা সফলতা পাওয়া যায়নি। তিন-চার বছর পরে, অর্থাৎ কয়েক প্রজন্ম পরেই এ হাঁসের আকার খুব ছোট হয়ে যায়। মূলত মাংসের জন্য এ হাঁস পোষা হয় বলে সেই ছোট আকারের হাঁস পালনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন খামারীরা। বেজিং ডাক বেশি ডিম পাড়ে না এবং আকারেও অনেক ছোট এ হাঁসের ডিম। এরপর বছর তিনেক আগে সরকার এ হাঁসের ডিম আমদানি করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। নারায়ণগঞ্জের কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন কেন্দ্রে সে ডিম ফুটিয়ে আঞ্চলিক খামারগুলোতে সরবরাহ করা হয়। আমাদের এখানেও সে সময়ই এ হাঁসের ছানা আনা হয়েছিল। আমরা ৫ মাস বয়সের ছানা এনেছিলাম।

এরপর আমাদের এখানেই ইনকিউবেটরে এ হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা করে আসছি। মাসে আমাদের এখানে ১৪ থেকে ১৫ হাজার বাচ্চা ফোটাই। খামারীদের ভেতর এ হাঁস জনপ্রিয় করে তোলার জন্য স্যার (ব্যবস্থাপক মহম্মদ আবদুল হামিদ) এবং আমি প্রথম থেকেই তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে। প্রথম যখন এ হাঁস আমদানি করা হয়েছিল তখন যে কারণে ধীরে ধীরে জাতটি আকারে ছোট হয়ে গিয়েছিল তা সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করে আমরা এ জাতটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমরা সফল। এ লক্ষ্যে আমরা বিশেষভাবে নজর দিই হাঁসের জাত-বিশুদ্ধতার ওপর।

'হাঁসের যে বাচ্চাগুলো আমরা এখানে ডিম ফোটানোর জন্য রেখে দিই, সেগুলোর মান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খুব কড়া পদক্ষেপ নিয়ে থাকি। স্বাস্থ্যবান এবং অবিকল আগের প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে, কেবল সে ধরেনের বাচ্চাই আমরা সংরক্ষণ করি। এভাবে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা এ হাঁসের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। এরই মধ্যে খামারীদের ভেতর এ হাঁস এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে আগামী জুন মাস (২০১৭) পর্যন্ত ডিম থেকে যত বাচ্চা ফোটানো হবে তার সবই আগাম বিক্রি হয়ে গেছে। আগেই বলেছি এ হাঁস মূলত মাংসের জন্য পোষা হয়ে থাকে। প্রতিটি হাঁস থেকে ৪ হতে সাড়ে ৪ কেজি মাংস পাওয়া যায়। আরেকটি বাড়তি আয় হয় এ হাঁস থেকে। এ হাঁসের পাখনার পালক থেকে তৈরি হয় ব্যাডমিন্টন খেলার শাটলকক। প্রতিটি পাখনা থেকে ১৪টি পালক ২ টাকা দরে বিক্রি হয়। এসব পালক কিনে নেয় শাটলকক তৈরির চীনা কোম্পানি। ■

রফতানিমুখী কৃষিশিল্প গড়তে চান

সফল ফল খামারী

সেলিম রেজা

১৭ নভেম্বর সকালে আমরা সাড়ে নয়টার দিকে রাজশাহী থেকে রওনা হলাম নাটোরের দিকে। সেখানে আমাদের গন্তব্য নানা রকম ফলের এক বিশাল খামার। রিশাদ জানালেন, এই বিশাল খামারের উদ্যোক্তা জনৈক সেলিম রেজা পুরোপুরি জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকেন। আমাদের উকেণশ্য জৈব পদ্ধতির উদ্যোক্তা খুঁজে বেড়ানো নয়, সফল ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের উদাহরণ তুলে তরুণ উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। রিশাদকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি আশ্বস্ত করলেন যে, উদ্যোগটা লাভজনক তো বটেই, বিপুল সম্ভাবনাময়ও।

রাজশাহী থেকে নাটোর যাওয়ার পথে পুঠিয়াতে থামতে হলো কিছুক্ষণের জন্য। সিদীপ প্রকাশিত 'একশত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সফল জীবন সংগ্রাম' গ্রন্থে এই পুঠিয়ার উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা আবদুস সালামের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছিল। লুৎফর ভাই ও রিশাদ দুজনেই খুব আগ্রহ দেখালেন সেখানে একবার ঢু মারতে। একটি গাভীর খামারকে এতভাবে ব্যবহার করতে পারার শিল্পনৈপুণ্য দেখার সুযোগটা ওরা হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না। আবদুস সালাম তার গাভীর খামারের দুধ প্যাকেটজাত করে বিক্রি করেন রাজশাহী মহানগরে, গরুর গোবর থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে তা গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেন, বায়োগ্যাস প্লান্টের তরল বর্জ্য (স্লারি) থেকে তৈরি করেন কার্যকর কীটনাশক। আর বায়োগ্যাস প্লান্টের উচ্ছিষ্ট গোবর দিয়ে তৈরি করেন কেঁচোসার এবং জৈব সার। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম নিজস্ব বায়োগ্যাস থেকে গাড়িতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারোপযোগী সঙ্কুচিত বায়োগ্যাস উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিলেন। পরীক্ষামূলকভাবে সে গ্যাস গাড়িতে ভরে চালিয়েও দেখা হয়েছে। তবে সরকারি অনুমোদন এবং ছাড়পত্র মিলেছে অনেক পরে। রাস্তার একেবারে পাশেই বলে আমাদের খুব একটা দেরি হওয়ারও আশঙ্কা ছিল না। গাড়ি থেকে নামতেই দেখলাম আবদুস সালাম বড় একটা দা নিয়ে নিজেই রাস্তার পাশের জঙ্গল সাফ করছেন। আমাদের দেখে একগাল হেসে জানালেন, সরকারি অনুমোদন পাওয়ায় পরদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে গাড়িতে গ্যাস সরবরাহ শুরু করবেন। তার খামারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড দেখাতে দেখাতে বললেন– সরকারের কাছে প্রতিটি ইউনিয়নে বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের প্রস্তাব রেখেছেন এবং সরকারের তরফ থেকে মৌখিক সম্মতি জানানো হয়েছে। তার ইচ্ছে এটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিটি ইউনিয়নে একজন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান করবেন। এ ছাড়া সুইডেন সরকার তার মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরের বর্জ্য দিয়ে গ্যাস তৈরির একটি প্রকল্পও হাতে নিতে যাচ্ছে বলে জানালেন। তার পুরো প্রকল্প দেখে লুৎফর ভাই ও রিশাদ দুজনেই খুব মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

নাটোর শহরে পৌঁছার বেশ আগে থেকেই রিশাদ মোবাইলে সেলিম রেজার সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিচ্ছিলেন কোথায় আমাদের যেতে হবে। এরপর রিশাদ আমাদের নাটোর শহরের মাদ্রাসা রোডের এক রেস্তঁরায় নিয়ে বসালেন। আমরা সেখানে এক পেয়ালা চা খেতে খেতে সেলিম রেজা এলেন একটি

মোটরসাইকেলে চেপে। আমরা আর দেরি করলাম না। সেলিম রেজা আগে আগে মোটরসাইকেল চালিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। শহর পেরিয়ে আমরা ছায়াঘেরা পথ ধরে চললাম। এখানে নতুন একটি ব্যাপার খেয়াল করলাম– রাস্তার দু পাশে ধান আর সবজি বাগানের পাশাপাশি

সেলিম রেজার 'দৃষ্টান্ত' সৃষ্টির ইতিকথা

সেলিম তার 'দৃষ্টান্ত' খামারটি গড়ে তোরার কাহিনী নিজেই বলে চললেন-'আমার বাবা ছিলেন এলজন শিক্ষক, এলাকার মানুষ তাকে খুব শ্রদ্ধা করত। তাই এমএমএস পাস করার পর বিএড ডিগ্রি নিয়েছিলাম শিক্ষক হবো বলে। কিন্তু হঠাৎ ঝোঁক চাপে উকিল হবো। সেই ঝোঁকের তাড়নায় ওকালতি পড়ি এবং এলএলবি পাস করি। এতোকিছু করেও কিন্তু আমি কোথাও সুবিধা করতে পারছিলাম না। নাটোর এলাকার ভেষজ পণ্যের সারাদেশে চাহিদা আছে– এটা মাথায় রেখে অগত্যা ভেষজ বাগান গড়ে তুলি। কিন্তু তাতে মার খেয়ে টনক নড়ে। ভাবতে থাকি কী করা যায়! তবে একটি ব্যাপার সব সময় মাথার ভেতর কিলবিল করতো– গর্ব করার মতো একটা কিছু করে সবাইকে চমকে দেব। এক সময় একজনের বাসায় বিদেশি আপেলকুল খেয়ে মনে মনে ঠিক করে ফেলি– এ ফল যে দেশেরই হোক না কেন, আমি এর চাষ করব। এতোদিনের উদ্যানচর্চায় বেশ বুঝতে পেরেছি এ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল।'

'নাটোরের ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদা সারাদেশে। দেশের কবিরাজ, হেকিম, এমনকি কোনো কোনো ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানও এ এলাকা থেকে ভেষজ ও ঔষধি উদ্ভিজ্জ পণ্য সংগ্রহ করে থাকে। কলার বাগানও এখানে বেশ লাভজনক। লেখাপড়ার পাট শেষ হলে চাকরি-বাকরি বা ওকালতিতে তেমন সুবিধা হচ্ছিল না বলে ঠিক করলাম একটি ভেষজ উদ্ভিদের বাগান করব। সে লক্ষ্যে ২০০০ সালে সাড়ে ৪ বিঘা জমিতে ভেষজ এবং কলাবাগান গড়ে তুলি। কিন্তু কিছুদিনের ভেতরেই আমার সে স্বপ্ন ভেঙে যায়। বাজারজাতকরণের নানা সমস্যার কারণে লোকসান গুনতে হয়। এরপর এক জায়গায় আপেলকুল খেয়ে খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এটি বিদেশি ফল। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম এটির আমি আবাদ করব। এরপর ব্যাপক খোঁজখবর শুরু করলাম এবং এর চাষ পদ্ধতির ওপর কিছু পড়াশোনা করলাম। থাইল্যান্ড থেকে এ কুলের বীজ আনিয়ে ২০০২ সালে আমিই প্রথম এ দেশে এ ফলের চাষ শুরু করি ২৬ বিঘা জমি লিজ নিয়ে। বেশ ভালো সারা পড়ে যায় ভোক্তভদের মাঝে। ভালো লাভ হতে থাকে। এর আগের ভেষজ বাগানের লোকসান ভুলে যাই অল্পদিনেই। প্রবল উৎসাহে লেগে যাই আপেল কুল চাষে। ব্যাপক পড়াশোনার কারণে আমি ততদিনে জেনে যাই থাইল্যান্ডেরই আরেক জাত থাইকুলে উৎপাদন খরচ আপেল কুলের চেয়ে কম। আকারেও অনেক বড়। আরো কিছু বেশি জমি লিজ নিয়ে মোট ৩৮ বিঘা জমিতে থাই কুল চাষ করতে থাকি। উল্লেখ্য, থাইকুলও আমিই প্রথম চাষ শুরু করি এ দেশে। সারাদেশে চাহিদা অনেক বেড়ে যায় এ কুলের। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এ কুল চাষ করে আমি ২৬ লাখ টাকা লাভ করি। খুব লাভজনক হওয়ায় ফলচাষিদের ভেতর ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। দেশের প্রায় প্রতিটি এলাকায় এ ফলের চাষ হতে থাকে। বাজার ভরে যায় থাইকুলে। দাম পড়ে যায় অনেক। কিছুটা হতাশ হয়ে যাই। এরপর একদিন চেইন শপ আগোরায় গিয়ে থাই পেয়ারার চাহিদা ও মূল্যমান দেখে এ জাতের পেয়ারা চাষে উদ্বুদ্ধ হই। এ পেয়ারার খোঁজখবর নিতে থাকি। পেয়েও যাই সন্ধান। উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডের প্রজেক্ট ডিরেক্টর কামরুজ্জামানের কাছ থেকে ২৬ বিঘা জমির জন্য ১০ হাজার ৪ শ থাই পেয়ারার চারা সংগ্রহ করি। এ পেয়ারার পুরোপুরি বাজারজাতকরণ শুরু করি ২০০৮ সালে। তখন প্রতিদিন ১ লাখ টাকা লাভ থাকত। থাই পেয়ারার পাশাপাশি এ সময় থেকে আমি পেঁপে, কলা এবং টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বাঙ্গি ইত্যাদির আগাম চাষ শুরু করি এবং এতে বেশ ভালো বাড়তি লাভ হতে থাকে।'

প্রায়ই চোখে পড়ছিল পেয়ারা, শরিফা (আতাফল), কলাসহ নানা ধরনের ফলের বাগান। এ রাস্তা ধরে প্রায় মিনিট বিশেক চলার পর সেলিম রেজা তার মোটারসাইকেল নিয়ে উত্তর দিকের এক শাখা রাস্তায় নেমে গেলে আমরাও তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। গ্রামের ভেতর দিয়ে রাস্তা। এ-বাড়ির উঠোন, ও-বাড়ির পুকুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে বলে রাস্তাটা বেশ আঁকাবাঁকা। মাঝে মাঝে সেলিম রেজাকে আমরা হারিয়ে ফেলছিলাম, কিন্তু রাস্তা একটিই বলে জানতাম এ রাস্তা দিয়েই এগিয়ে গেছেন তিনি, তাই তাকে অনুসরণ করতে খুব একটা বেগ পেতে হচ্ছিল না। পরে জেনেছিলাম সরু এই গেঁয়ো রাস্তাটির নাম ডাল সড়ক। এ শাখা রাস্তা ধরে প্রায় আধাঘণ্টা চলার পর আমরা এসে পৌঁছলাম গোয়ালদিঘির কেষ্টপুরে। এখানে ৫১ বিঘা জমির ওপর ওপর সেলিম রেজার থাই পেয়ারার বাগান। বেশ গর্বের সঙ্গেই সেলিম রেজা জানালেন বাংলাদেশে তিনিই প্রথম থাই জাতের পেয়ারা চাষ শুরু করেন।

তার খামারবাড়ির উঠোনে গাড়ি থামতেই আমি ক্যামেরা নিয়ে ছুটে গেলাম পেয়ারা বাগানের ছবি তুলতে। এর আগে ২০১৫ সালে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের সফল জীবন সংগ্রামের তথ্য জোগাড় করতে এই এলাকায় এসে রাজশাহীর আমিনুল হকের এগারো একরের পেয়ারা বাগান দেখেছিলাম। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি পেয়ারা বাগান দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে সেলিম রেজার এ বাগানে বেশকিছু গুণগত পার্থক্য চোখে পড়ল। তার পেয়ারা বাগানের চেহারা অন্যান্য বাগানের চেয়ে সবুজ-সতেজ। কারণ জিজ্ঞেস করলে সেলিম জানালেন, তিনি তার বাগানে সব সময় জৈব সার ও জৈব কীটনাশক ব্যবহার করেন, রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করেন না। তার বাগানের শ্রমিকরা দেখলাম পেয়ারার মোড়ক বদলাতে ব্যস্ত। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জানালেন– সরকারের তরফ থেকে পেয়ারা বাগানে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তিনি তার বাগানের জন্য ঢাকা থেকে ফুড গ্রেডের ব্যাগ তৈরি করিয়ে এনেছেন, শ্রমিকরা পেয়ারার পলিথিনের মোড়ক খুলে ফুড গ্রেডের মোড়ক লাগিয়ে দিচ্ছে।

বিশাল বাগান, যেদিকে চোখ যায় শুধু পেয়ারা গাছ আর পেয়ারা গাছ। বাগান যেখান থেকে শুরু সেখানে রাস্তার ধার ঘেঁষে পেঁপের আবাদ করেছেন, বেশ বড় বড় পেঁপে ঝুলছে সেসব গাছ থেকে থোকায় থোকায়। বাগানটি ঘুরে দেখা হলে সেলিম রেজা আমাদের নিয়ে চললেন তার আরেক বাগানে। ২০ বিঘা জমিতে বহুমুখী সেই ফলের বাগানটি দত্তপাড়ার চাই পাড়ায়। আগের মতো এবারো আমরা তার মোটরসাইকেলকে অনুসরণ করে যেতে থাকলাম। যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সে পথ ধরে বড় রাস্তায় উঠে কিছুদূর গিয়ে দক্ষিণমুখী এক রাস্তায় নেমে চলতে থাকলাম আমরা। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, পথ যেন আর শেষই হতে চায় না। পথ যতটুকু না দূর তার চেয়েও বেশি দূর মনে হচ্ছিল আমাদের ব্যস্ততার কারণে। দুপুর প্রায় গড়িয়ে যাচ্ছে– ওদিকে আমাদের আবার যেতে হবে পাবনার এক প্রত্যন্ত এলাকায়, সেখান থেকে ঢাকায়। ব্যস্ততার সঙ্গে উৎকণ্ঠা মিশে আমাদের পথকে দীর্ঘ-প্রলম্বিত করে দিচ্ছিল। যাওয়ার পথে সেলিম রেজার একটি প্রদর্শনী পেয়ারা বাগানের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। অবশেষে আমরা এসে পৌঁছলাম সেলিম রেজার বহুমুখী ফল বাগানে। প্রথমেই তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন তার ড্রাগন ফলের বাগানে। মাত্র কয়েকদিন আগেই এ বাগানের ফল বাজারজাত করেছেন। তাই সবুজ গাছে লাল তারার মতো ফুটে থাকা ড্রাগন ফল দেখার সৌভাগ্য হলো না।

ড্রাগন ফল ছাড়াও এখানে তিনি শরিফা (আতা), বেশ কয়েক জাতের লেবু, আম, নারকেলসহ দেশি-বিদেশি অনেক জাতের ফল চাষ করছেন এখানে। এক ধরনের লেবু দেখালেন, তাতে কোনো বিচিই থাকে না। খুব যত্ন করে তিনি আমাদের তার ড্রাগন ফল কেটে খাওয়ালেন। এরপর আমি তার এই উদ্যোগের তথ্য সংগ্রহ করতে থাকলাম।

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার আহমেদপুর গ্রামের করিৎকর্মা ফলচাষি মো. সেলিম রেজা (এমএসএস, বিএড, এলএলবি) তার বয়স ৪০ বলে জানালেন। তার বাবা– আলহাজ নাজিমউদ্দিন অবসারপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক। মা– মোছাম্মৎ ছবেদা বেগম। ১ ভাই, ২ বোন। বড় বোন সেলিনা খাতুন, প্রভাসক, বাংলা বিভাগ, হৈবতপুর ডিগ্রি কলেজ। ছোট বোন সুমি আক্তার (অর্থনীতিতে অনার্স, মাস্টার্স) প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক।

সেলিম রেজার এই উদ্যোগের নাম দৃষ্টান্ত কৃষি খামার ও

নার্সারি। উদ্যোগটির ধরন বহুমুখী ফল বাগান ও নার্সারি (জৈব পদ্ধতিতে চাষ) এবং বাজারজাতকরণ। ২০০০ সাল থেকে তিনি এই উদ্যোগটি পরিচালনা করে আসছেন। প্রথম অবস্থায় সাড়ে ৪ বিঘা জমিতে ভেষজ ও কলাবাগান গড়ে তুলেছিলেন। এতে তার প্রাথমিক পুঁজি ছিল ২৫ হাজার টাকা। এর পুরোটাই ছিল তার নিজস্ব। বর্তমান পুঁজি ১ কোটি টাকার ওপরে। বর্তমানে তার কোনো ঋণ নেই। ২০০৯ সালে কৃষি ব্যাংক থেকে ২৩ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সে ঋণ অনেক আগেই পরিশোধ করেছেন। তিনি দেশের বাজার জয় করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করার জন্য ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ফল থেকে নানা ধরনের পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যপণ্য প্রস্তুতের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছেন– তখন হয়তো ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হবে।

জানতে চাইলাম উদ্যোগটি প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল কিনা, না থাকলে কতদিন পর থেকে লাভের মুখ দেখছেন। বললেন, 'প্রথমে মোটেও লাভজনক ছিল না। শুরুতে আমার বাগানে উৎপাদিত ঔষধি ও ভেষজসামগ্রী এবং কলাবাগানের কলা বাজারজাতকরণে ভীষণ সমস্যায় পড়ে যাই। বছর দুয়েক লোকসান দিয়ে ২০০২ সালে দেশে আমিই প্রথম ২৬ বিঘা জমিতে আপেলকুল চাষ করি এবং তখন থেকেই খুব লাভবান হতে থাকি।'

জানতে চাইলাম– প্রথম অবস্থায় লাভের হার কেমন ছিল? একটু হেসে বললেন, 'প্রথম অবস্থায় লাভ তো ছিলই না, বরং লোকসান দিয়েছি। তবে ২০০২ সালে আপেলকুল চাষ শুরু করার পর ২০০৪ সাল নাগাদ এসে বার্ষিক লাভের হার ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। এখন পর্যন্ত আমি বার্ষিক ৯০ শতাংশ মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছি এবং এতে সন্তুষ্ট, তবে আমি ক্রমাগত এ হার আরো বাড়িয়ে নিতে চাই।'

প্রশ্ন করলাম, আপনি এ উদ্যোগে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন তা কি নিজস্ব, নাকি কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ গুণ অর্জন করেছেন? বললেন, 'আমার এ উদ্যোগের পুরো ব্যবস্থাপনা আমার নিজস্ব। কোথাও কোনো প্রশিক্ষণ নিইনি, তবে বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যায় পড়ে আমি সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছি।' তার মূল ভরসা বাজারে তার উৎপাদিত ফলের ব্যাপক চাহিদা। প্রথম অবস্থায় তিনি ব্যাপারিদের মাধ্যমে ঢাকার কারওয়ানবাজারে কৃষিপণ্য পাঠাতেন। এখন তিনি সারাদেশেই বাজারজাত করছেন। ঢাকার 'আগোরা', 'স্বপ্ন' ইত্যাদি চেইনশপগুলো তার কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের ফল সংগ্রহ করে থাকে।

বাজার সম্প্রসারণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন– এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের জন্য আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিধি নিয়োগের চেষ্টা করছি। আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি সচিবের মাধ্যমে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়ে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছি।'

তার কোন ফলের কেমন চাহিদা তা জানতে চাইলে বললেন, তার সব ফলের চাহিদাই বেশ ভালো। তবে শরিফা বা আতাফলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা– এ প্রশ্নের জবাবে বললেন, ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তবে এখনো পুরোপুরি পেরে ওঠেননি। এ ধরনের উদ্যোগ কেন গ্রহণ করলেন জানতে চাইলে জানালেন, এরপর ২০১২ সাল থেকে সাড়ে ৪ বিঘা নিজস্ব জমিতে ড্রাগন ফল ও শরিফা বা আতাফল চাষ শুরু করি। এ বছরই লেবু চাষ শুরু করি আমি। বাজারের চাহিদা বুঝে বেশ কয়েকটি প্রজাতির লেবু চাষ করছি। এর ভেতরে এক প্রজাতির থাই লেবু চাষ করছি, যাতে কোনো বিচি থাকে না। লেবুতে বেশ লাভ হচ্ছে। ২০১৪/১৫ সাল থেকে আমি ড্রাগন ফল বাজারজাত করছি ২০০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। আমি আমার বাগানে ৬ ধরনের ড্রাগন ফল চাষ করি। এর ভেতরে ৩ ধরনের ড্রাগন ফল আমিই প্রথম চাষ করছি এ দেশে। ২০১৫ সাল থেকে ১৮ বিঘা জমিতে বারি-৪ জাতের কাঁচা-মিঠা আম চাষ করছি। ২০১৬ সাল থেকে ৪ বিঘা জমিতে জার্মান, মালয়েশিয়ান এবং স্থানীয় গৌরমতি নামের বিলম্বিত প্রজাতির (লেট ভ্যারাইটির) আম চাষ করছি। একই বছর আরো ২ বিঘারও বেশি জমিতে ভিয়েতনামী অপি জাতের (OPI, Oil Plant Instutute, ভিয়েতনামের এই সংস্থা থেকে উদ্ভাবিত জাতকে অপি জাতের নারকেল বলা হয়ে থাকে) সিয়াম গ্রিন ও সিয়াম ব্লু এবং ভারতীয় কেরালার ডিজে সম্পর্ণা নামের নারকেল চাষ

'... আমার বিশাল পেয়ারা বাগানের অনেক পেয়ারা পেকে নষ্ট হয়ে যায়, তাই ঠিক করেছি এসব পেয়ারা দিয়ে জ্যাম বা জেলি তৈরি করব। এ ছাড়া রফতানিমুখী ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণেরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সৌদি আরবে একবার এক ধরনের ড্রিঙ্ক পান করেছিলাম– দুধ ও ফলের রস দিয়ে। প্রচুর পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ সে ধরনের পানীয় বাজারজাতেরও আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।'

শুরু করেছি। এ নারকেলগাছগুলো অল্পদিনেই ফলন দিতে শুরু করে। আশা করছি আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে আম ও নারকেল বাজারজাত করতে পারব। আমার বিশাল পেয়ারা বাগানের অনেক পেয়ারা পেকে নষ্ট হয়ে যায়, তাই ঠিক করেছি এসব পেপে দিয়ে জ্যাম বা জেলি তৈরি করব। এ ছাড়া রফতানিমুখী ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণেরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সৌদি আরবে গিয়ে একবার এক ধরনের ড্রিঙ্ক পান করেছিলাম– দুধ ও ফলের রস দিয়ে। প্রচুর পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ সে ধরনের পানীয় বাজারজাতেরও আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।'

এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা কী কী– জানতে চাইলে বললেন, 'পুঁজি, শ্রম, বিপণন, আধুনিক প্রযুক্তি, অর্গানিক পেন (পেস্ট এক্সক্লুসিভ নেট) ইত্যাদির অপ্রতুলতা। সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে করে আমি এসব প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করে থাকি।'

নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে জানতে চাইলে জানালেন– সঠিক জাত ও সঠিক চাষ-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

তার প্রযুক্তি এখনো ম্যানুয়াল। তবে প্রক্রিয়াজাতকরণ করার জন্য পুরোপুরি আধুনিক স্বয়ক্রিয় প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে। তার জনবল ২০০ জন (পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে)। এদের ভেতর ১৫ জন দক্ষ।

তিনি তার হিসেব পদ্ধতি এখনো কম্পিউটারাইজড করেননি, হিসেবের খাতায় তিনি নিজেই হিসেব লিখে রাখেন। পরিকল্পনামতো এগুতে পারলে আধুনিক হিসেব বিভাগ রাখতে হবে। এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বললেন, সঠিক পদ্ধতিতে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে এ উদ্যোগের সম্ভাবনা বিপুল।

তার ইচ্ছেগুলো সফল হোক– এই কামনা করে আমরা বিদায় নিলাম। ■

IDFP

দুধ পাস্তুরিকরণ ও বিপণন

পাবনার চার তরুণের চমক

দুধ পাস্তুরিকরণ ও বিপণনে অনন্য দৃষ্টান্ত গড়েছেন পাবনার বেড়া উপজেলার আমাইকোলা গ্রামের চার উদ্যোমী তরুণ। আগে ছিলেন চার বন্ধু। এখন তারা দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রীর সম্ভাবনাময় এক শিল্প-উদ্যোগের শরিক। আব্দুর রউফ মানিক (৪০), মো. রেজাউল করিম (৪৩), আজমল হুদা (৪৫) ও মাসুদ শেখ (৪২)– এই চার বন্ধু আগে থেকেই জড়িত ছিলেন দুগ্ধশিল্পে। আব্দুর রউফ মানিক দীর্ঘদিন দেশের অন্যতম বড় দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রীর প্রস্তুতকারক 'প্রাণ' কোম্পানিতে দুধ সরবরাহ করেছেন। মো. রেজাউল করিম দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান 'আফতাব' কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অন্য দুই শরিক-বন্ধু আজমল হুদা ও মাসুদ শেখও দুধ সরবরাহ করতেন 'প্রাণ' কোম্পানিতে।

পাবনা: দুধ উৎপাদনে অগ্রণী

এখানে বলে রাখা ভালো, পাবনা হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বেশি দুধ উৎপন্নকারী এলাকা। পাবনা-সিরাজগঞ্জ এলাকায় ঘরে ঘরে গাভীর খামার। মিল্কভিটা, ব্র্যাক ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রোডাক্টস (আড়ং দুধ), প্রাণ ফুডস (প্রাণ দুধ), রংপুর ডেইরি প্রোডাক্টস (আরডি মিল্ক), আকিজ ডেনরি, নিউজিল্যান্ড ডেনরি প্রোডাক্টস বাংলাদেশ লি., এমা মিল্ক, আফতাব মিল্ক, ফার্ম ফ্রেশ মিল্ক, আল্ট্রা মিল্ক ইত্যাদি দেশের শীর্ষস্থানীয় তরল দুধ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান এ এলাকা থেকেই তাদের বেশির ভাগ দুধ সংগ্রহ করে থাকে। শুধু তাই নয়, এ এলাকার দুধ থেকে তৈরি ঘি ও মাখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বেশ কয়েকটি দেশে রফতানিও হচ্ছে।

১৭ নভেম্বর নাটোরের বহুমুখী ফলবাগান দেখে আমরা পাবনার উদ্দেশে রওনা দিলাম বেলা সাড়ে তিনটারও পরে। পাবনার দুধ পাস্তুরিত করার কারখানা দেখে এদিনই আমরা ঢাকায় ফিরে যাব। সময় বাঁচাতে তাই এদিন দুপুরের খাবার আর খাওয়া হলো না। অবশ্য সেলিম রেজার ফলবাগান থেকে পেয়ারা ও ড্রাগন ফল খেয়ে পেট ভরিয়েছিলাম। পথ যেন আর শেষ হচ্ছিল না। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। পাবনা জেলার সীমায় ঢোকার একটু পরেই অন্ধকার নেমে এলো। এরপর পাবনা পেরিয়ে বেড়া এবং বেড়ার প্রায় শেষ সীমায় আমাইকোলা গ্রামে ইছামতি নদীর তীরে আমাদের গন্তব্য। যেতে যেতে রিশাদ এ কারখানার উজ্জ্বল সম্ভাবনার নানা তথ্য বলে যাচ্ছিলেন। এখানে মূল্য সংযোজনের অনেক সুযোগ রয়েছে। আগেই বলেছি এ এলাকার ঘি ও মাখন এখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ অনেক পশ্চিমা দেশেও রফতানি হচ্ছে। দুগ্ধজাত আরো অনেক পণ্য উৎপাদন করে এ শিল্পকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে বাজারজাত করে ব্যাপক লাভজনক করে তোলা সম্ভব।

আমাদের আমাইকোলার দুধ পাস্তুরিকরণের কারখানায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রায় ৮টা বেজে গেল। উদ্যোক্তাদের চারজনই উপস্থিত ছিলেন। খুব উৎসাহের সঙ্গে তারা আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে থাকলেন কারখানার নানা অংশ। প্রথমেই নিয়ে গেলেন দুধ পাস্তুরিত করার যন্ত্রপাতিতে ঠাসা বিশাল ঘরটায়। ঘরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে স্টেইনলেস স্টিলের বিশাল এক দুধের ট্যাঙ্ক। এরপর তারা দেখালেন পাস্তুরিকৃত দুধ প্যাকেটজাত করার কয়েকটি মেশিন, যেখানে সাদা অ্যাপ্রণ এবং মাথা ও নাক বিশেষ স্যানিটারি টুপি ও মুখোশে ঢেকে কাজ করছিলেন কয়েকজন কর্মচারি। পাশেই শীতলকক্ষ। এখানে সংগৃহীত দুধ রাখা হয় প্রাথমিক পর্যায়ে। তারপর আমরা গেলাম ল্যাব চেম্বারে। এখানে দুধের গুণগত মান নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি।

ইছামতি নদীর কিনারে অবস্থিত বলে উদ্যোক্তারা তাদের এই উদ্যোগের নাম দিয়েছেন 'ইছামতি ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রোডাক্ট'। গত দু বছর ধরে তারা ধাপে ধাপে গড়ে তুলছেন তাদের এই ড্রেইরি অ্যান্ড ফুড প্রোডাক্ট কারখানা। পুরো প্রকল্প এখনো বাস্তবায়ন করে তুলতে পারেননি। প্রথমেই তারা দুধ পাস্তুরিত করে বাজারজাতের উদ্যোগ নেন। সে উদ্যোগ এখনো সর্বাংশে কার্যকর হয়নি। তবে দুধ পাস্তুরিত করে সীমিত পর্যায়ে বাজারজাত করতে শুরু করেছেন ২০১৫ সালের রোজার মাস থেকে। তাদের দুধ পাস্তুরিত করার

পুষ্টিকর আদর্শ খাদ্য দুধ : চাহিদার অর্ধেকেরও বেশি এখনও আমদানি করে বাংলাদেশ

পুষ্টিমানের দিক দিয়ে মানুষের খাদ্যতালিকায় এক নম্বর স্থানে রয়েছে দুধ। মায়ের দুধ পান করা শিশুকে এমনকি পানি না খাওয়ালেও চলে। স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনে দুধের বিকল্প নেই। অথচ এখনো চাহিদার অর্ধেকেরও বেশি দুধ আমদানি করতে হয়। আমাদের সমৃদ্ধ জনসংখ্যাকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় তা হলে দুগ্ধশিল্পও বিশাল এক অবদান রাখতে সক্ষম জাতীয় অর্থনীতিতে। দেশের বিকাশমান দুগ্ধশিল্পকে সমৃদ্ধ করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ববাজারে ঠাঁই করে নিতে উৎসাহী তরুণ উদ্যোক্তারা এক বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন এখনো প্রায় অর্ধেক হলেও দুধ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি এ খাতে বহুমুখী বিনিয়োগকে দিনদিনই উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশে এখন বছরে দুধের চাহিদা ১ কোটি ৪৭ লাখ মেট্রিক টন। ২০০০ সালে যেখানে বছরে দুধ উৎপাদিত হতো ২ লাখ মেট্রিক টন, ২০১৬ সালে সেখানে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে বছরে ৭২ লাখ মেট্রিক টনে।

বিশাল যন্ত্রটি কেনার ঘটনা বেশ বিস্ময়কর।

তখন তাদের সঙ্গে অংশীদার হিসেবে ছিলেন আব্দুর রউফ মানিকের ভগ্নিপতি আবু সাইদও। অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আবু সাইদ একটি দুধ পাস্তুরিত করার যন্ত্রের সন্ধান পান চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে। সেকেন্ডহ্যান্ড হলেও যন্ত্রটি একদম নতুন। এর মালিক যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী এক শৌখিন মানুষ। এলাকার দুধ পাস্তুরিত করার জন্য শখের বশেই এক কোটি টাকা দিয়ে যন্ত্রটি কিনে এনেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। কিন্তু ব্যবহার করার আগেই তার সেই শখ মিটে যায়। ক্রেতা খুঁজলেন। কিন্তু কে নেবে এত টাকা দিয়ে এত বড় যন্ত্র? খোঁজ-খবর নিয়ে আবু সাইদ সুযোগটা বেশ ভালোভাবেই নিয়েছিলেন। তারা প্রথমে যন্ত্রটি দেখতে গেলে মালিক জানান, তিনি এক কোটি টাকায় এটি কিনেছেন, কিন্তু এখন লোকসান দিয়ে ৬০ লাখ টাকায় বিক্রি করতে রাজি। তারা জানান, দুধ পাস্তুরিত করার কারখানা গড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও যন্ত্রটি কেনার জন্য তাদের অত টাকা নেই। বেশ কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করার পর মালিক বলেন, 'যাও, তোমাদের ১০ লাখ টাকাতেই দিয়ে দিচ্ছি।' কিন্তু আবু সাইদ বলেন তাদের কাছে ১০ লাখ টাকাও নেই। মালিক তখন বলেন, 'একটা ভালো কাজ যখন করতে যাচ্ছ, তোমাদের এমনি এমনিই দিয়ে দিলাম।' আবু সাইদ তখন বুঝতে পারেন এটা তার অভিমানের কথা; তবে এই সুযোগটা হাতছাড়া করা চলবে না ! শেষমেশ ৮ লাখ টাকা দিয়ে তারা যন্ত্রটি কিনে আনেন।

বিএসটিআইয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছেন তারা। চূড়ান্ত অনুমোদন মিললে ডিলার নিয়োগ করে সারাদেশে বাজারজাত করতে শুরু করবেন তাদেও 'পিউরা মিল্ক'।

পুরো কারখানা ঘুরে দেখার পর উদ্যোক্তারা আমাদের নিয়ে এলেন তাদের অফিসে। তাদের পরিবেশিত ফল এবং চা খেতে খেতে আমি তাদের তথ্য জেনে নিতে থাকলাম।

এই চার যুবকের নাম মো. রেজাউল করিম, আব্দুর রউফ মানিক, আজমল হুদা ও মাসুদ শেখ। বয়স যথাক্রমে ৪৩, ৪০, ৪৫ ও ৪২ বছর। তাদের উদ্যোগের নাম ইছামতি ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রোডাক্টস। উদ্যোগের ধরন হচ্ছে দুধ পাস্তুরিতকরণ ও বাজারজাতকরণ (ভবিষ্যতে দই, মাঠা, রসমালাই, ম্যাঙ্গো মিল্ক, চকোলেট মিল্ক ইত্যাদি দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত করার ইচ্ছে আছে)। ২০১৫ সালের জুলাই মাস থেকে তারা এই উদ্যোগটি শুরু করেছেন। শুরু করার সময় প্রাথমিক পুঁজি ছিল ৫০ লাখ টাকা। এর পুরোটাই ছিল চার শরিকের নিজস্ব পুঁজি। তাদের বর্তমান পুঁজি ৩ কোটি টাকারও বেশি। এখনো পর্যন্ত তাদের কোনো ঋণ নিতে হয়নি।

উদ্যোগটি প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল কিনা, না থাকলে কতদিন পর থেকে লাভের মুখ দেখছেন জানতে চাইলে তারা জানালেন, প্রথমে লাভজনক ছিল না। তিন মাস পর আয়-ব্যয় সমান হয়ে যায়। পাঁচ মাস পর থেকে কিছুটা লাভের মুখ দেখতে থাকেন। প্রথম অবস্থায় মুনাফার বার্ষিক হার ছিল ৫ থেকে ৬ শতাংশ। বর্তমানে তা ১৫ থেকে ১৮ শতাংশ। মুনাফার ক্ষেত্রে

মার্কেটিং ম্যানেজার, ফিল্ড ওয়ার্কার, সেল রিপ্রেজেন্টিটিভ মিলে দক্ষ একটি মার্কেটিং টিম কাজ করছে। বর্তমানে এদের দিয়ে তারা শুধু ঢাকায় দুধ সরবরাহ করেন। বিএসটিআই থেকে পূর্ণাঙ্গ ছাড়পত্র পেলে শিগগিরই তাদের এই মার্কেটিং টিম সারাদেশে দুধ বাজারজাত শুরু করবেন। তাদের বাজার সম্প্রসারণের সার্বিক প্রয়াস থেমে আছে মূলত বিএসটিআইয়ের পূর্ণাঙ্গ ছাড়পত্রের অপেক্ষায়।

এখন পর্যন্ত তারা যতটুকু অর্জন করতে পেরেছেন তাতে সন্তুষ্ট কিনা জানতে চাইলাম। বললেন– এখন পর্যন্ত অর্জিত লাভের হারে তারা সন্তুষ্ট নন। তাদের ধারণা, প্রথম থেকে বাই-প্রোডাক্ট অর্থাৎ মাঠা, লাবাং ইত্যাদি বাজারজাত করতে পারলে এই প্রবৃদ্ধির হার অনেক বেশি হতে পারত।

তারা এ উদ্যোগে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন তা কি নিজস্ব, নাকি কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ গুণ অর্জন করেছেন জানতে চাইলে জানান, তাদের চারজনেরই এ ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। আব্দুর রউফ মানিক, আজমল হুদা ও মাসুদ শেখ প্রাণ কোম্পানিতে দুধ সরবরাহ করতেন। আর রেজাউল করিম ছিলেন আফতাব মিল্ক কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং মার্কেটিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের সবারই কম- বেশি পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল। সেই অভিজ্ঞতা তারা তাদের নিজেদের কারখানায় কাজে লাগাচ্ছেন।

জিজ্ঞেস করলাম কোন ভরসায় তারা এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন? জবাবে জানালেন– তাদের মনে হয়েছিল– মিল্কভিটা, প্রাণ, আড়ং ইত্যাদি কোম্পানি যদি বাইরে থেকে এসে ব্যবসা করতে পারে তা হলে স্থানীয় হয়ে তারা পারবেন না কেন? মূলত এই মনোস্তাত্ত্বিক ভরসাতেই তারা এই ব্যবসা শুরু করেছেন।

প্রথম অবস্থায় কীভাবে বাজারজাত করতেন জানতে চাইলে বললেন, উৎপাদনে যাওয়ার আগেই তারা দুটি ডেলিভারি ভ্যান কিনেছিলেন। তা দিয়ে ঢাকা, গাজীপুর, সাভার ও আশুলিয়ায় প্যাকেটজাত পাস্তুরিত দুধ বাজারজাত করতেন।

জিজ্ঞেস করলাম– এখন কীভাবে বাজারজাত করছেন? জবাবে বললেন, এখন তাদের মার্কেটিং ম্যানেজার, ফিল্ড ওয়ার্কার, সেল রিপ্রেজেন্টিটিভ মিলে দক্ষ একটি মার্কেটিং টিম কাজ করছে। বর্তমানে এদের দিয়ে তারা

শুধু ঢাকায় দুধ সরবরাহ করেন। বিএসটিআই থেকে পূর্ণাঙ্গ ছাড়পত্র পেলে শিগগিরই তাদের এই মার্কেটিং টিম সারাদেশে দুধ বাজারজাত শুরু করবেন।

তারা বাজার সম্প্রসারণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাইলে জানালেন, তাদের বাজার সম্প্রসারণের সার্বিক প্রয়াস থেমে আছে মূলত বিএসটিআইয়ের পূর্ণাঙ্গ ছাড়পত্রের অপেক্ষায়। এর আগে ঐ সংস্থার পরিদর্শকরা তিনবার তাদের কারখানা পরিদর্শনে এসেছিল। প্রথমবার পরিদর্শন শেষে পরীক্ষামূলক অনুমোদন দেয়ায় তারা সীমিত পর্যায়ে দুধ বাজারজাত করতে পারছেন। প্রতিবার পরিদর্শনে এসেই তারা কিছু নির্দেশনা দিয়ে গিয়ে বলেছিল– এই শর্তগুলো পূরণ করলেই দেয়া হবে চূড়ান্ত অনুমোদন। কিন্তু সেই শর্ত পূরণ করার পর পরিদর্শনে এসে তারা আবার নতুন কোনো শর্ত জুড়ে দেয়। ২৩ নভেম্বর সর্বশেষ পরিদর্শন শেষে তারা একটি পানির প্লান্ট এবং প্যাকেজিং ও ল্যাবরেটরিরুমে দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসাতে বলেছে। পরে ৫ জানুয়ারি পরিদর্শনে এসে এসব ঠিক থাকলে চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে বলে জানিয়ে গিয়েছে (আমরা গিয়েছিলাম ১৭ নভেম্বর। পরের ঘটনা টেলিফোনে পরে জানতে পারি)।

জানালেন, তাদের দুধের মান ভালো বলে চাহিদা বেশ ভালো। মিল্কভিটা যেখানে খামারীর কাছ থেকে দুধ সংগ্রহের সাতদিন পর ভোক্তার কাছে দুধ সরবরাহ করতে পারে তারা সেক্ষেত্রে ভোক্তার দুয়ারে দুধ সরবরাহ করতে সময় নেবেন বড়জোড় দুইদিন। ব্যাপারটা ব্যাপক প্রচারিত হলে তাদের চাহিদা আরো অনেক বেড়ে যাবে বলে তাদের বিশ্বাস।

স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা জানতে চাইলে বললেন, আপাতত পারছেন না। পুঁজির ঘাটতিই এর প্রধান কারণ। এ ব্যাপারে সহায়তা পেলে স্থানীয়, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবেন বলে দৃঢ় আশা তাদের।

জিজ্ঞেস করলাম– এ ধরনের উদ্যোগ কেন গ্রহণ করলেন? বললেন– তাদের এলাকাটি দেশের অন্যতম প্রধান দুগ্ধ উৎপাদনকারী অঞ্চল। তা ছাড়া তারা চারজনই এ ব্যবসায় বেশ অভিজ্ঞ ও দক্ষ। সুতরাং তারা মনে করেন, ভালোমতো লেগে থাকতে পারলে এ উদ্যোগ খুব লাভজনক করে গড়ে তুলতে পারবেন। সেজন্যই তারা এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আরো জানালেন, এ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা কী কী জানতে চাইলে বললেন, মূলত প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবই এ ধরনের উদ্যোগের প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

কীভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে তারা এগিয়ে যেতে পারছেন বা আদৌ এগিয়ে যেতে পারছেন কিনা জানতে চাইলে তারা জানালেন– আপাতদৃষ্টিতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য এ ধরনের উদ্যোগে ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল এবং কেউ এমন উদ্যোগ নিলে তাদের করণীয় সম্পর্কে কিছু পরামর্শ জানতে চাইলে বললেন– নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার জন্য তাদের পরামর্শ হবে– ধৈর্য ধরে লেগে থেকে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে।

বেশকিছু আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ লক্ষ্য করলাম তাদের এ উদ্যোগে, যেমন– পাস্তুরিকরণ মেশিন, কুলিং মেশিন, প্যাকেজিং মেশিন, হোমোজিনাইজার (দুধ মিশ্রণের যন্ত্র), শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেকনোলজি ইত্যাদি।

তাদের দক্ষ, অদক্ষ মিলে মোট জনবল (১৭ নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত) ৩০ জন কর্মী রয়েছে। এদের ভেতর ১০ জন দক্ষ।

তাদের অফিসে আলাদা হিসেব বিভাগ আছে। পুরো হিসেব পদ্ধতি এ বিভাগই নিয়ন্ত্রণ করে। এ বিভাগ এখনো কম্পিউটারাইজড করা হয়নি। তবে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনে যাওয়ার পর এটি সম্ভব হবে বলে জানালেন তারা।

এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে মন্তব্য করে তারা জানালেন, নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সারাদেশে তাদের দুগ্ধজাত পণ্য বিপণনের প্রয়াস তারা আরো বেগবান করতে চান।

এই চার তরুণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হোক– এই শুভ কামনা করে আমরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ■

SCAFE
Quality Product
ISO
n 1 coffee
পুর থেকে প্রস্তুতকৃত এবং আমদানিকৃত
HSCAFE
NiCE
TRADE INTERNATIONAL
Bangladesh Sole Distributor
city centre, link road, south sastapur
fatullah, narayanganj - 1420
02-7648393 | 01795312511

কফি ভেন্ডিং মেশিন তৈরি করছেন

হুমায়ুন খান

ছুঁতে চান দেশের আগামী কফি-সম্ভাবনা

কফি নিয়ে কাজ করছেন দীর্ঘদিন। ১৮ বছর সিঙ্গাপুরে যুক্ত ছিলেন কফি ব্যবসায়। অবশ্য নিজের নয়, এইচএসক্যাফ নামের এক কফি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। শেষের দিকে সেই কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজারও ছিলেন। তাই কফি ব্যবসার নাড়ি-নক্ষত্র সবই তার জানা। ছুটিতে যখন দেশে আসতেন তখন বাংলাদেশের মানুষের ভেতর কফির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা তার দৃষ্টি এড়াতো না। বিদেশে কফি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে খুব উৎসাহ নিয়েই পর্যবেক্ষণ করতেন দেশে কফির বাজার। তাই ২০১২ সালে দেশে ফিরেই নেমে পড়েছিলেন কফি ব্যবসায়। নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছেন ‘নাইস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল’। সিঙ্গাপুরে যে কোম্পানিতে কাজ করতেন তাদের ব্র্যান্ড এজেন্সি পেতে একটুও বেগ পেতে হয়নি সেখানে দীর্ঘদিন বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে এসেছেন বলে। সেখানে

ভেন্ডিং মেশিনের ইতিহাস

ভেন্ডিং মেশিনের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে প্রথম ভেন্ডিং মেশিনটি তৈরি করেছিলেন আলেক্সান্দ্রিয়ার গ্রিক প্রকৌশলী ও গণিতজ্ঞ হিরো। তার সেই মেশিনটিতে একটি মুদ্রা ঢুকিয়ে দিলে তা থেকে পবিত্র পানি নির্গত হতো। এতে মুদ্রা ফেলামাত্র তা একটি কড়াইতে গিয়ে পড়তো, যে কড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকত একটি লিভার। লিভারটি তখন একটি ভাল্ব খুলে দিত, এর ফলে বেরিয়ে আসতো কিছু পানি।

একই যন্ত্রকৌশলে, অর্থাৎ মুদ্রা ব্যবহার করে তামাক বের করার ভেন্ডিং মেশিন তৈরি হয় ইংল্যান্ডের ট্যাভার্নে। এই মেশিনগুলো ছিল সহজে বহনযোগ্য এবং এগুলো তৈরি হতো পিতলে। রিচার্ড কার্লাইল নামের এক ইংরেজ বই বিক্রেতা পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বাড়াতে একই পদ্ধতিতে খবরের কাগজ নির্গত করা ভেন্ডিং মেশিন তৈরি করেন ১৮২২ সালে। এ প্রথম স্বয়ংক্রিয় মেশিনটি ছিল ডাকটিকেট নির্গমন করানো ভেন্ডিং মেশিন, যেটি তৈরি করেছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক সিমিয়ন ডেনহ্যাম, ১৮৬৭ সালে। মুদ্রা নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ মুদ্রা ফেললে জিনিস বেরোয় এমন প্রথম

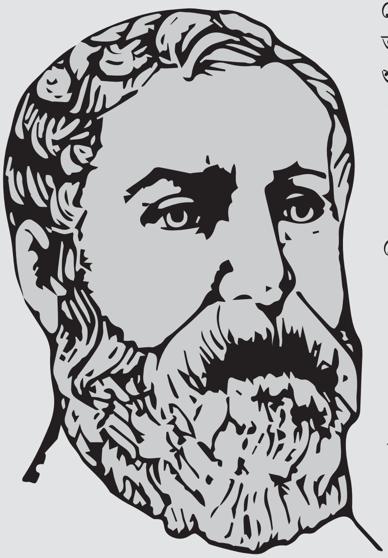

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে ভেন্ডিং মেশিন আবিষ্কার করেন গ্রিসের এন্টিকুইটির হিরো অব আলেকজান্দ্রিয়া

আধুনিক মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল ১৮৮০-এর দশকের শুরুর দিকে ইংল্যান্ডের লন্ডনে। এসব মেশিন থেকে পোস্টকার্ড বের হতো। ১৮৮৩ সালে এ ধরনের মেশিন আবিষ্কার করেছিলেন পারসিভ্যাল এভিরিট। ১৮৮৭ সালে এই ইংল্যান্ডেই মিষ্টি বের-করা ভেন্ডিং মেশিন চালু করেছিল ‘সুইটমিট অটোমেটিক ডেলিভারি কোম্পানি’ নামের এক প্রতিষ্ঠান। তারাই প্রথম ভেন্ডিং মেশিন বিপণন শুরু করেছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে জাপানে প্রথম স্ট্যাম্প ও পোস্টকার্ড বের-করা ভেন্ডিং মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ১৮৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ভেন্ডিং মেশিন তৈরি করেছিল থমাস অ্যাডামস গাম কোম্পানি নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এভাবে বিভিন্ন ধরনের জিনিস স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোক্তার হাতে পৌঁছে দিতে ব্যবহৃত হতে থাকে ভেন্ডিং মেশিন। তারই ধারাবাহিকতায় কফি বিক্রিতেও ভেন্ডিং মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর সটোরি কাটো আবিষ্কার করেন ইন্সট্যান্ট কফি। ১৯৬০ সালে সিঙ্গেল কাপ কফি ভেন্ডিং মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৬৮ সালে অফিস কফি সার্ভিস চালু হয়। ১৯৮৮ সালে কফি ভেন্ডিং মেশিনে যুক্ত হয় কফি বিন চূর্ণ করার প্রযুক্তি। ১৯৯১ সালে কফি ভেন্ডিং মেশিন থেকে ফ্লেভার্ড কফি, এসপ্রেসো, কাপুকিনো ইত্যাদি ধরনের কফি সার্ভ করা শুরু হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় বেভারেজের মর্যাদা লাভ করে কফি। তখন থেকে বছরে ৪০০ বিলিয়ন কাপেরও বেশি কফি পান করে আসছে বিশ্ববাসী।

নিজের একটা অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিলেন বলেই ছোটভাইকে সেখানে নিয়ে গিয়ে চাকরি দিতে পেরেছিলেন ভালো বেতনে। একই কারণে তিনি যখন দেশে কফির ব্যবসা করবেন বলে ওই কোম্পানির এজেন্সি চেয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ তাতে তখন একটুও বাদ সাধেনি। নিজের ৪০ লাখ এবং ছোট ভাইয়ের ৮০ লাখ– মোট ১ কোটি ২০ লাখ টাকার প্যাকেটজাত কফি আমদানি করেছিলেন সিঙ্গাপুরের সেই কোম্পানি থেকে। আগ্রহের আতিশয্যে যে দারুণ আবেগপ্রবণ ছিলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্যই বোধ করি বাস্তবতার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। কফি আমদানি করতে গিয়ে ভুল ব্র্যান্ডের কফি আমদানি করে বসলেন। তার আমদানিকৃত সেই কফি ছিল ফ্লেভার কফি– যা এ দেশের মানুষ খায় না। তাই শুরুতেই খেলেন এক বেমক্কা হোঁচট। সেই বিনিয়োগের পুরোটাই গচ্চা গিয়েছিল। আশাহত হয়ে মনে ভীষণ আঘাত পেলেও দমে যাননি। সরে আসেননি তার ভালো লাগার কফি থেকেও। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিলেন দেশে বেড়ে চলেছে কফিশপের সংখ্যা। যে কোনো মুদিদোকানে তাকিয়েই বুঝতে পারতেন কী পরিমাণে বেড়ে চলেছে দেশে কফিপায়ীর সংখ্যা।

২০১৪ সালে কফি ব্যবসায় অন্য এক মাত্রা যোগ করে নতুন করে শুরু করলেন। বিভিন্ন হোটেল-রেস্তরাঁ এবং ফাস্টফুডের দোকানগুলোতে কফি তৈরির মেশিন দেখে ভাবলেন এই মেশিন, অর্থাৎ কফি ভেন্ডিং মেশিন তৈরি করে বিক্রি করবেন বিভিন্ন কফিশপ, হাইওয়ে রেস্তরাঁ এবং হোটেল-রেস্তরাঁয়। এতে তার কফি ব্যবসা বেড়ে যাবে অনেকগুণ, বাড়তি পাওনা হিসেবে থাকবে কফি ভেন্ডিং মেশিন বিক্রি বাবদ টাকা। এ বিষয়ে হাত পাকিয়ে এসেছিলেন সিঙ্গাপুর থেকেই। পরে যখন জানতে পারলেন বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে কফি চাষ হচ্ছে এবং ব্যাপকভাবে কফিবাগান গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখান থেকে পাঁচ বছর পর থেকেই কফির ফলন পাওয়া যাবে তখন থেকেই তিনি আরো উজ্জীবিত হয়েছেন কফি ব্যবসায়। চোখ রাখছেন কফি চাষের দিকে। একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তৈরি হচ্ছেন বাংলাদেশের সেই কফি-সম্ভাবনাকে ছুঁতে।

২০১২ সালে ভীষণ লোকসান গোনার পর হুমায়ুন খান নতুন করে কফি ব্যবসা শুরু করেন ২০১৪ সালে। বিনিয়োগ করেন ১৪ লাখ টাকা, ২০১৭-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যা ২০ লাখে এসে দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগ করা পুরো টাকাই তার নিজের, কারো কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়নি। দ্বিতীয় দফায় ব্যবসা শুরু করার পর প্রথমে মোটেও লাভজনক ছিল না তার এ ব্যবসা। এক বছর পর থেকে ধীরে ধীরে কিছুটা লাভের মুখ দেখতে থাকেন। এ পর্যন্ত বার্ষিক লাভের হার ৪০ শতাংশের বেশি বাড়াতে পারেননি। এই প্রবৃদ্ধিতে তিনি মোটেও সন্তুষ্ট নন।

তিনি তার ব্যবসায় যে ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করছেন তা তার সিঙ্গাপুরের এইচএসক্যাফ কোম্পানি থেকে শেখা। তার ভরসার জায়গাটাও সেখানকার অভিজ্ঞতা। প্রথম অবস্থায় আমদানি করা কফি পাইকারি দামে কিনে সে অবস্থায়ই বিক্রি করতেন। পরবর্তীতে মূল কোম্পানির অনুমতি নিয়ে আমদানিকৃত ইনস্ট্যান্ট কফি ঐ কোম্পানির নামেই প্যাকেটজাত করে বিক্রি শুরু করেন। যারা কফি আমদানি করে তাদের কাছ থেকে কিনে বিক্রি করতে হচ্ছে পুঁজির অভাবে। যথেষ্ট পুঁজি জমাতে পারলে নিজেই আমদানি করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা তার।

প্রথম প্রথম নিজেই বাজারে বাজারে ঘুরে বিক্রি করতেন। এখন তিনি বিক্রি-প্রতিনিধির মাধ্যমে বাজারজাত করছেন। তার পণ্যের চাহিদা কেমন জানতে চাইলে জানালেন– খুব ভালো। এরপর জিজ্ঞেস করেছিলাম স্থানীয় ও দেশীয় চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন– পারছেন না।

কফি ব্যবসা করতে হলে এজেন্টদের কফি ভেন্ডিং মেশিন সরবরাহ অনিবার্য বিষয়। কারণ এজেন্টদের কাছে এ মেশিন বিক্রি করতে পারলে তার কফিও বাজারে বেশি বিক্রি হয়। প্রথম প্রথম তিনি চীন, মালয়েশিয়া ও ভারত থেকে কফি ভেন্ডিং মেশিন আমদানি করতেন। চীন থেকে যে বিশটি মেশিন আমদানি করেছিলেন তা এখনো তার গুদামে পড়ে আছে। কারণ চীনে কফি বিক্রি হয় মগে, আর বাংলাদেশে ওয়ানটাইম ছোট্ট প্লাস্টিক কাপে। ফলে ঐ মেশিনে ওয়ানটাইম কাপে কফি বিক্রি করতে গেলে মেশিনের পানি ভালোমতো গরম হওয়ার আগেই কাপ ভরে যায়। কেই-বা খেতে যাবে কফির গুঁড়ো-দুধ-চিনি

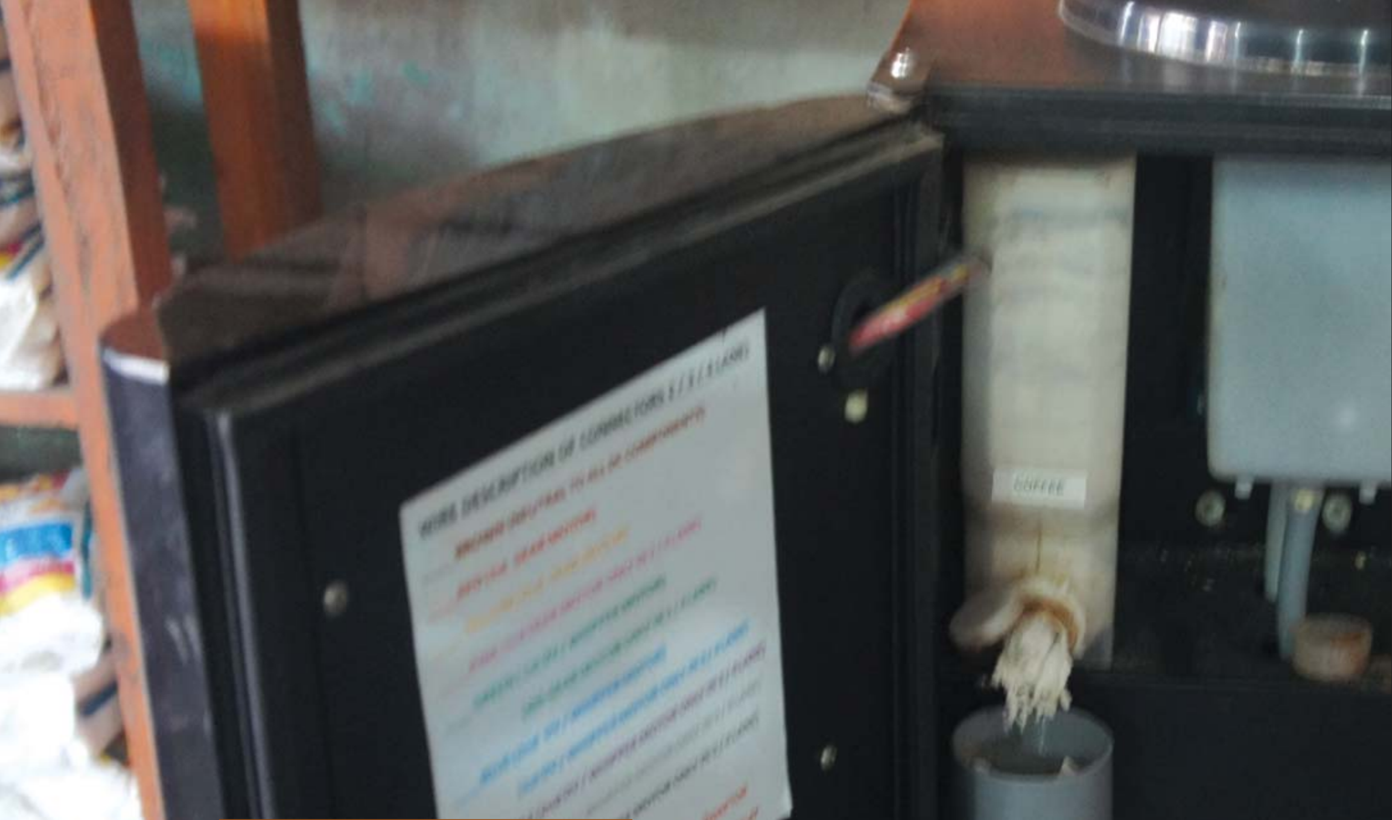

প্রেরণায় সিঙ্গাপুর

২০০৪ সালে স্টুডেন্ট ভিসায় সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। খরচ জোগাতে সেখানকার এইচএসক্যাফ কোম্পানিতে পার্টটাইম চাকরি নেন। তার কাজে খুশি হয়ে কোম্পিানি তাকে ম্যানুফাকচারিং বিভাগে চাকরি করার প্রস্তাব দেয়। তিনি সে প্রস্তাব লুফে নেন। বছরখানেক পরেই হয়ে যান প্রোডাকশন সুপারভাইজর। কয়েক বছরের মধ্যেই পদোন্নতি পেয়ে হন অ্যাসিসট্যান্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার। কোম্পানিটির প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিলেন মালিক নিজেই। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে তিনি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় চলে গেলে হুমায়ুন খানকে প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি দেন। হুমায়ুনের তখন বেতন দাঁড়ায় ৩২০০ সিঙ্গাপুরি ডলারে।

এক সময় নিজেই কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন দেশে ফিরে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন। ছোট ভাইকে সিঙ্গাপুরে রেখে এসে তিনি তাই শুরু করেন এই কফি ব্যবসা।

গুলানো ঠাণ্ডা পানি! তাই চীন থেকে আমদানি করা সেসব মেশিন এখন তার গুদামেই পড়ে আছে। আর ভারত ও মালয়েশিয়া থেকে তাকে যে ভেন্ডিং মেশিন আমদানি করতে হয় এজেন্টদের কাছে তা বিক্রি করে তাতে লাভ প্রায় থাকে না বললেই চলে। তাই এক সময় উপলব্ধি করতে পারলেন– নিজে যদি কফি ভেন্ডিং মেশিন তৈরি করতে পারেন তা হলে তার লাভের মাত্রা বেড়ে যাবে। বাস্তবেও রূপ দিলেন নিজের এই ভাবনা। এ ধরনের কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছিলেন সিঙ্গাপুর থেকেই। তাই শুরু করে দিলেন এ মেশিন তৈরির কাজ। ২০১৬ সালের নভেম্বর থেকে এ মেশিন তৈরি শুরু করে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৬০টি কফি মেশিন তৈরি করে বিক্রি করেছেন তিনি। আরো বেশ কিছু আছে বিক্রির অপেক্ষায়। দিনদিন এ মেশিনের ব্যবহার-উপযোগিতা বাড়িয়ে চলেছেন তিনি। আগে এ মেশিন থেকে কেবল কফি বিক্রি করা যেতো। এরপর তিনি এ মেশিনে যোগ করেছেন চা সার্ভ করার প্রক্রিয়াও। এতে কফির সঙ্গে চায়ের ব্যবসাও করতে পারছেন। সিঙ্গাপুরে তিনি একই মেশিন থেকে পাঁচ-ছ'টি নজেল দিয়ে কফি, চা, সিরিয়াল, ট্যাং, ওট, স্যুপ ইত্যাদি বিক্রি করে এসেছেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি তার ব্যবসাটাকেও সেভাবে বাড়িয়ে নিতে চান। শুরুও করে দিয়েছেন সে প্রক্রিয়া। বর্তমানে প্রতিটি মেশিন তৈরিতে তার খরচ পড়ে ১৫ হাজার টাকা, আর বিক্রি করছেন ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকায়। তিনি অবশ্য এ মেশিনের নিখাদ প্রস্তুতকারক নন। ভেতরের সার্কিটটা এখনো দেশে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ভারত থেকে তা আমদানি করতে হয়। বাকি প্রায় সব যন্ত্রানুষঙ্গ তৈরি করে অ্যাসেমব্লিং করে বিক্রি করেন তিনি। এতে তার দুদিক দিয়ে লাভ। কফি ভেন্ডিং মেশিন বিক্রি করে নগদ কিছু আয় তো হচ্ছেই, সঙ্গে যে তার এ মেশিন কিনে নিচ্ছে সে তার আমদানিকৃত এইচএসক্যাফ কফিও কিনে নিচ্ছে এবং নিয়মিত তা সরবরাহের অর্ডারও পাচ্ছেন।

জানতে চেয়েছিলাম– সিঙ্গাপুরে তো বেশ ভালো বেতনে চাকরি করতেন, তো সেই চাকরি ছেড়ে এসে এই ব্যবসা শুরু করলেন কেন? নির্দ্বিধায় জানালেন, সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে এবং দেশে নেসলে বা এ ধরনের বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য। তিনি মনে করেন এ দেশে এ ব্যবসার ভবিষ্যত বেশ উজ্জ্বল।

প্রতিবন্ধকতার কথা জানতে চাইলে জানালেন, পুঁজির অভাবই তার প্রধান প্রতিবন্ধক।

তার ব্যবসার জনবল মোট ৫জন। এর মধ্যে তিনি নিজেই কেবল দক্ষ। এখানো তিনি খাতায় হাতে লিখে ব্যবসার হিসেব সংরক্ষণ করেন।

এ ব্যবসার সম্ভাবনার কথা জানতে চাইলে জানালেন– এ দেশে এ ব্যবসার রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। নতুন উদ্যোক্তারাও এ ব্যবসা বেছে নিতে পারেন। ■

ওবায়দুলের

সম্রাট কেমিক্যাল কোম্পানি

নির্মাণশিল্পে নতুন সম্ভাবনা

GCC

বাংলাদেশে মোট উৎপাদনের সাত শতাংশ আসে নির্মাণশিল্প থেকে। দেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান। তবে যে জরিপ থেকে এ তথ্য জানা গেছে তাতে নির্মাণশিল্পের উৎপাদিত পণ্যতালিকায় সিমেন্ট, ইট-বালু, রডের উল্লেখ থাকলেও এ খাতে উৎপাদিত কেমিক্যালের কোনো উল্লেখ নেই। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এ খাতের অনেক কেমিক্যালও তৈরি হয় দেশে, এবং তার পরিমাণও খুব একটা কম নয়। বড় প্রতিষ্ঠান 'সানোয়ারা গ্রুপ', 'ফিনিশ' তো আছেই, ব্যক্তি পর্যায়ে ছোট পরিসরে শুরু করে ব্যবসাটা এতোদিনে বেশ জমিয়ে তুলেছেন এমন এক উদ্যোক্তার সন্ধানও পেয়ে গেলাম। আর তাই তার এই উত্থানপর্বের খুঁটিনাটি তথ্য জানতে ছুটলাম কুমিল্লার ময়নামতিতে। নতুন যে উদ্যোক্তারা পুঁজি প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে আস্থা রাখা যায় এমন উদ্যোগ খুঁজছেন তারা তার এই উদ্যোগ থেকে পেয়েও যেতে পারেন রত্ন-আকরের সন্ধান।

নির্মাণসামগ্রীর চাহিদাকে চিরন্তন চাহিদা বললে বোধ করি একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না। এর চাহিদা শুধু বাংলাদেশে নয়, সব দেশেই– সব সময়। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ চাহিদা আরো বেড়ে চলেছে। নতুন বাড়ি, ভবন বা যে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণে তো বটেই, রক্ষণাবেক্ষণেও প্রয়োজন হয় নানা ধরনের নির্মাণসামগ্রীর। সারাবছরই চলে নির্মাণকাজ। বাংলাদেশে এর বাজার বিশাল। নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এই সুযোগটা বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগাচ্ছে। তা ছাড়া সিমেন্টসহ নানা নির্মাণসামগ্রী এখন বিদেশেও রফতানি হচ্ছে। আমাদের এ গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সামনে লাভজনক ও সম্ভাবনাময় শিল্প-উদ্যোগের উদাহরণ তুলে ধরা। তাই সন্ধানে ছিলাম নির্মাণ খাতের এ ধরনের উদ্যোগ কোথাও পাওয়া যায় কিনা। এক সময় মিলেও গেল তেমনই এক উদ্যোগের সন্ধ্যান। সিদীপের ময়নামতি এরিয়ার ম্যানেজার মো. আবুল কাশেম খোঁজ দিলেন তার এলাকায় এ ধরনেরই এ উদ্যোক্তার। নানা কাজের ফাঁকে তাই সময় বের করে নিলাম এই উদ্যোক্তার সার্বিক কর্মকাণ্ড দেখে আসার। **১১** মার্চ সন্ধ্যা নামার পর ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম সিদীপের ময়নামতি শাখায়।

১২ মার্চ সকাল নয়টায় সিদীপের ময়নামতি শাখা-২-এর ব্যবস্থাপক মো. মোতাহার হোসেন আমাকে নিয়ে চললেন সম্রাট কেমিক্যালসের মালিক ওবায়দুল হক চৌধুরীর (রাশেদ) সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। ময়নামতি মোড় থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে পশ্চিমমুখো চলে কুমিল্লা সেনানিবাস পেরিয়ে মোটরবাইক নিয়ে তিনি দক্ষিণের সরু রাস্তায় নেমে এলেন। রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছিল। পথের দুপাশে দাপটে মাথা তুলে দাঁড়ানো গাঢ় সবুজ ধানের ক্ষেতে, নানা বয়সী সবজিক্ষেতে ছোপ ছোপ পানি, ধুলো ধুয়ে যাওয়া গাছের পাতায় সকালের মিষ্টি রোদের ঝিলিক আর দিনের কর্মব্যস্ততা শুরু করা বাড়িঘর, দোকানপাট, স্কুল-মাদ্রাসার মাঝ কেটে যাওয়া বৃষ্টিধোয়া পথ ধরে আমরা ছুটে চলছিলাম গোপালসার গ্রামের দিকে। মোতাহার আমাকে বলেননি কতদূর যেতে হবে। শুধু জানিয়েছেন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণে অলিপুর গ্রামে যেতে হবে, সেখানেই ওবায়দুল হকের কেমিক্যাল কারখানা। তাই ক্যান্টনমেন্টের উল্টোদিকে গ্রামের রাস্তায় ঢোকার পর থেকেই পথের দুপাশে তাকিয়ে খুঁজছিলাম সম্ভাব্য কারখানাটি। কিন্তু মোতাহারের বাইক চলছে তো চলছেই। অচেনা পথ হলে অবশ্য এমনটিই হয়, অল্প পথকেও মনে হয় বহুদূর। ধৈর্যের বাধ ভেঙে মোতাহারকে যখন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম– আর কতদূর, ঠিক তখনই তিনি রাস্তা থেকে কাঁচাপথে নামলেন এবং একটি বাড়ির পাশে রাস্তায় কাদা দেখে গাড়ি থামালেন। প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম কাদা পেরিয়ে গিয়ে আবার বাইকে ওঠার। কিন্তু মোতাহার টিনের বেড়ায় ঘেরা এবং বাঁশ ও পলিথিনের বস্তা দিয়ে তৈরি একটি গেট দেখিয়ে বললেন– এটিই সেই কারখানা। নিজের অজান্তেই ভুরুটা কুঁচকে গেল আমার। এতো আশা নিয়ে এসে শেষে কিনা এই দেখতে হলো! ভেতরে ঢুকে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। কোথায় কারখানা? এ তো দেখছি পাশাপাশি দুটি গুদামঘর! ঘর দুটির সামনে ছোট্ট এক উঠোন। উঠোনের পশ্চিমদিক ঘেঁষে তিন-চারটি লিচুগাছ। তারই তলায় প্লাস্টিকের চেয়ার পেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন চল্লিশ ছুঁইছুঁই এক লোক। মোতাহার পরিচয় করিয়ে দিলেন– ইনিই মো. ওবায়দুল হক চৌধুরী (রাশেদ)।

সততা ও পরিকল্পনা: ওবায়দুলের ব্যবসার মোক্ষম অস্ত্র

স্কুলজীবনেই রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। কলেজ জীবনে সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন ছাত্রলীগের। এক সময় দলীয় সংঘাতের শিকার হন এবং খুবই জটিল এক পরিস্থিতিতে পড়ে যান। তাই পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছায় এইচএসসি পাস করার পরেই লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে ব্যবসায় নেমে পড়েন। ব্যবসাপাতির খোঁজ-খবর নিয়ে নিজে যাচাই-বাছাই করে এবং অবশ্যই পারিবারিক সিদ্ধান্তক্রমে হার্ডওয়্যারের দোকান দেবেন বলে ঠিক করলেন। স্থান বাছাই করলেন ময়নামতির ক্যান্টনমেন্ট বাজার। তার ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির জোগান দিলেন তার বাবা, বড় ভাই ও বোন। আঠারো পেরুনো টগবগে যুবক তখন তিনি। মগজে-শরীরে কর্মস্পৃহার জোয়ার। ছাত্র রাজনীতিতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছেন বলে কিছু একটা করে দেখানোর তাগিদ তাকে তখন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তাই দোকনটা দাঁড় করাতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি।

১৯৯১ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে করেছেন হার্ডওয়্যার ব্যবসা। সেই হার্ডওয়্যার ব্যবসা করতে করতে বাজার সম্পর্কে তার বেশ ভালো ধারণা জন্মে গিয়েছিল। হার্ডওয়্যারসামগ্রী বিক্রির দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি এক সময় খেয়াল করলেন টাইলস জোড়া লাগানোর পুটিং, টাইলস ক্লিনার, ডাম্প ক্লিনার ইত্যাদি সামগ্রী তার দোকানে খুব বেশি বিক্রি হচ্ছে। আরো কিছুকাল খুব মন দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করলেন। এরপর খোঁজ নিলেন আশপাশের হার্ডওয়্যারের সব দোকানেই। সেসব দোকানেও একই ব্যাপার লক্ষ করলেন। এরপর কাছাকাছি শহর-বাজারগুলোতে গিয়ে হার্ডওয়্যারের দোকানগুলোতেও খোঁজ করলেন। সেসব দোকান থেকেই পেলেন একই ধরনের তথ্য। এরপর তিনি যেখান থেকে দোকানের মাল কিনতেন সেই মোকামে গিয়েও খোঁজ নিলেন এবং এখানেও একই তথ্য পেলেন। নানা হিসেব-নিকেশে কাটালেন আরো কিছুকাল। এরপর সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন– এসব পণ্য তিনি নিজেই তৈরি করে বাজারজাত করবেন। পরিবারের সবার সম্মতি নিয়ে নেমে পড়লেন এই পণ্যগুলো তৈরির কাজে। হার্ডওয়্যারের দোকানটা বিক্রি করে দিলেন। তা থেকে পাওয়া পুরো ২০ লাখ টাকাই খাটালেন তার নতুন উদ্যোগে। কোথায় কোথায় বিক্রি করবেন আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, তাই নতুন উৎপন্ন পণ্য বাজারজাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। যতই দিন যেতে লাগল ততই সফলতা পেতে থাকলেন। প্রথম বছরেই পনেরো লাখ টাকা লাভ করায় আরো আগ্রহী হয়ে উঠলেন তিনি এই ব্যবসায়। ব্যক্তি জীবনে তিনি খুব ধার্মিক। ব্যবসা সম্প্রসারণে ব্যবসায়ী-সততা তার এক মোক্ষম অস্ত্র। এভাবে তার ব্যবসা আরো বড় হতে থাকে।

রাশেদ আমাকে স্বাগত জানিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে করমর্দন করে আমার আসার কারণ জানালাম। এরপর ছবি তুলতে চাইলে তিনি আমাকে বড় গুদাম ঘরে নিয়ে ঢোকালেন। সেখানে স্তূপ করে রাখা সারি সারি রাসায়নিক ডাস্টের বস্তা। এর কোনোটা হলুদ, কোনোটা সাদা। দু-তিনজন কর্মচারী সেখানে কাজ করছিল। বড় গুদামঘরের ছবি তোলার পর রাশেদ আমাকে ছোট গুদামঘরটিতে নিয়ে চললেন। সেখানে একজন কর্মচারী বিভিন্ন কেমিক্যালস মিশিয়ে তৈরি টাইলস ক্লিনার বোতলজাত করছিলেন। কাজের ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল খুব দক্ষ কর্মী তিনি। এরপর রাশেদ আমাদের কারখানা লাগোয়া তার বাড়ির বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন। সেখানে চা খেতে খেতে জেনে নিতে থাকলাম তার এই উদ্যোগের আদ্যোপান্ত। আর ধীরে ধীরে আমার মনের মেঘ কেটে গিয়ে প্রত্যাশার হাসি ফুটে উঠতে থাকল চেহারায়।

দেখতে মধ্য চল্লিশের মনে হলেও মো. ওবায়দুল হক চৌধুরী (রাশেদ) জানালেন তার বয়স ৩৮ বছর। তার এই উদ্যোগের নাম 'সম্রাট কেমিক্যাল কোম্পানি'। তিনি এখানে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক কিনে এনে ফর্মুলা অনুযায়ী টাইলস ক্লিনার, টাইলস পুটিং (জয়েন্ট ফিলার), থিনার, ডাম্প ক্লিনার (লিকুইড), ডাম্প ক্লিনার (পাওডার) তৈরি করে বাজারজাত করেন। এই উদ্যোগটি তিনি শুরু করেছিলেন ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই ব্যবসা

প্রথমে তিনি নিজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে খুঁজে বের করতেন কোথায় তার পণ্য সহজেই বাজারজাত করা যাবে। উৎপাদনে যাওয়ার পরেই দুজন বিক্রি-প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাদের দিয়ে তার পণ্য কোম্পানিগঞ্জ, লাকসাম ও চান্দিনায় বাজারজাত করতেন। এখন তার বাজারের পরিধি অনেক বেড়েছে। বর্তমানে তিনি চারজন বিক্রি-প্রতিনিধির মাধ্যমে চট্টগ্রাম, ফেনী, হাজীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কসবা, আখাউড়া, কুটি, বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর, দাউদকান্দি, গৌরীপুর, বগুড়া ও ঢাকায় তার পণ্য বাজারজাত করছেন। পণ্য সরবরাহের জন্য তার নিজস্ব একটি কাভার্ড ভ্যান আছে। খুব শিগগিরই তিনি এই প্রক্রিয়ার আরো দুটি কাভার্ড ভ্যান যোগ করবেন। বাজার সম্প্রসারণের জন্য তিনি সময় পেলেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গিয়ে বাজার যাচাই করে সম্ভাব্য নতুন বাজার খোলার চেষ্টা করেন।

শুরু করার জন্য প্রাথমিকভাবে তাকে ২০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়েছিল। বিনিয়োগকৃত সেই টাকার পুরোটাই ছিল তার নিজের। কারো কাছ থেকে বা কোনো ঋণদানকারী সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়নি। অবশ্য এজন্য তাকে নিজের প্রথম ব্যবসাটা গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ১৯৯১ সালে ময়নামতির ক্যান্টনমেন্ট বাজারে হার্ডওয়্যার আর সাইকেল পার্টসের দোকান দিয়েছিলেন। লাভও হচ্ছিল বেশ ভালোই। কিন্তু নতুন এই উদ্যোগটাতে তিনি আরো অনেক বেশি মুনাফার সম্ভাবনা দেখছিলেন। তাই কোনো দ্বিধা না করেই ১০ বছরের হার্ডওয়্যারের ব্যবসা গুটিয়ে এই উদ্যোগে টাকা খাটিয়েছিলেন। তার সেই প্রত্যাশা তাকে বিমুখ করেনি। বর্তমানে তার এই ২০ লাখ থেকে বেড়ে ১ কোটি ২০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এর ১ কোটি ৭ লাখ টাকা তার নিজস্ব। বাকিটা ঋণ। সিদীপ থেকে ঋণ নিয়েছেন ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা, উদ্দীপন থেকে ১ লাখ, পূবালী ব্যাংক থেকে ১০ লাখ টাকা এবং বাকি টাকা ঋণ নিয়েছেন আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে।

বুঝতে পারছিলাম, বাইরে থেকে যতই ম্লান, বিবর্ণ দেখাক না কেন, নির্মাণ সামগ্রীর কেমিক্যালের ব্যবসায় যে সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন তিনি তা বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছেন। এরপর আমি জানতে চাইলাম– প্রথম থেকেই উদ্যোগটি লাভজনক ছিল কিনা, যদি না থেকে থাকে তা হলে কতদিন পর এটি লাভজনক হয়ে

উঠেছিল? একটুও সময় না নিয়ে জোরের সঙ্গে বললেন, প্রথম থেকেই লাভজনক ছিল। প্রথম বছরেই লাভ হয়েছিল ১৫ লাখ টাকা! তার মানে বার্ষিক লাভের হার ছিল ৭৫ শতাংশ! জানতে চাইলাম, এখন পর্যন্ত তিনি বার্ষিক লাভের যে মাত্রা অর্জন করতে পেরেছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট কিনা। একটু ভাবলেন, তারপর জানালেন– সন্তুষ্ট, তবে তিনি মনে করেন রাভের এই হার আরো অনেক বাড়ানো যেতো। প্রথম কয়েক বছর যে হারে লাভ হয়েছিল পরে তা কিছুটা কমে যায়। বিশেষ করে ২০১৪ সালের টানা অবরোধে লাভের হার খুবই কমে গিয়েছিল। তবে বছর দুয়েক ধরে এ হার ক্রমেই বাড়ছে।

এবার তার ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে এলাম। জিজ্ঞেস করলাম– আপনাকে এখন ব্যবসার সবদিক সামলাতে হয়, এ ক্ষেত্রে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যে দক্ষ ব্যবস্থাপনার দরকার তা অর্জন করার জন্য তিনি কি কারো পরামর্শ বা এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিনা। একটুও দ্বিধা না করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জানালেন– এ ব্যবসার পুরো ব্যবস্থাপনা একেবারেই তার নিজস্ব। তবে এ ক্ষেত্রে তার জন্য সহায়ক হয়েছে দীর্ঘদিনের হার্ডওয়্যার ব্যবসার অভিজ্ঞতা। কোন কাজ কাকে দিয়ে কতটুকু করানো যাবে এবং করানো উচিৎ হবে, ব্যবসা বাড়ানোর জন্য কোথায় কাকে কাজে লাগাতে হবে– এসব ব্যাপারে তাকে দক্ষ হয়ে উঠতে হয়েছে কাজ করতে করতেই। জানতে চাইলাম, আগে একটা ব্যবসা করতেন, তা ছাড়া আরো অনেক সম্ভাবনাময় ব্যবসা করারও সঙ্গতি তার ছিল, কিন্তু সেসবে না গিয়ে কোন ভরসায় তিনি এই ব্যবসায় নামলেন? কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, হার্ডওয়্যারের ব্যবসা করার সময় তিনি খুব খেয়াল করে দেখেছেন গৃহনির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সামগ্রীর মধ্যে কোন কোন পণ্যের চাহিদা বেশি। দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন– টাইলস জোড়া লাগানোর পুটিং, টাইলস ক্লিনার, ডাম্প ক্লিনার– বিশেষ করে পাডলু– এইসবের যে চাহিদা তাতে এসব তৈরি করে সঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারলে হার্ডওয়্যার ব্যবসার চেয়ে বেশি লাভবান হওয়া যাবে। নিবিড় বাজার-যাচাই থেকে তিনি এও বুঝতে পেরেছেন– সানোয়ারা কর্পোরেশন, ফিনিশ ইত্যাদি কোম্পানির এসব পণ্য বাজারে বেশ চললেও বাজারের চাহিদা আরো অনেক বেশি। দিনদিন এই চাহিদা আরো অনেক গুণে বেড়ে যাচ্ছে। তাই তিনি এই সুযোগটা গ্রহণ করতেই পারেন। নিজস্ব সেই উপলব্ধিই তার এই ব্যবসায় নেমে পড়ার মূল ভরসা।

প্রথম অবস্থায় কীভাবে বাজারজাত করতেন জানতে চাইলে বললেন– প্রথমে তিনি নিজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে খুঁজে বের করতেন কোথায় তার পণ্য সহজেই বাজারজাত করা যাবে। উৎপাদনে যাওয়ার পরেই দুজন বিক্রি-প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাদের দিয়ে তার পণ্য কোম্পানিগঞ্জ, লাকসাম ও চান্দিনায় বাজারজাত করতেন। এখন তার বাজারের পরিধি অনেক বেড়েছে। বর্তমানে তিনি চারজন বিক্রি-প্রতিনিধির মাধ্যমে চট্টগ্রাম, ফেনী, হাজীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কসবা, আখাউড়া, কুটি, বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর, দাউদকান্দি, গৌরীপুর, বগুড়া ও ঢাকায় তার পণ্য বাজারজাত করছেন। পণ্য সরবরাহের জন্য তার নিজস্ব একটি কাভার্ড ভ্যান আছে। খুব শিগগিরই তিনি এই প্রক্রিয়ার আরো দুটি কাভার্ড ভ্যান যোগ করবেন। বাজার সম্প্রসারণের জন্য তিনি সময় পেলেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গিয়ে বাজার যাচাই করে সম্ভাব্য নতুন বাজার খোলার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তিনি ক্রমাগতভাবে পণ্যের মান বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মনে করেন পণ্যের মান বাড়াতে পারলে সম্রাট কেমিক্যালের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে এবং এতে তার পণ্যের বাজারের পরিধি অনেক বেড়ে যাবে। চোখ-মুখে আশার ঝিলিক খেলিয়ে বললেন– তার সুনাম দেশ থেকে বিদেশে ছড়িয়ে পড়লে এক সময় হয়তো রফতানিও করতে পারবেন।

এ সময় আমি তার পণ্য প্রস্তুতের প্রক্রিয়া জানতে চাইলে বললেন– তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, যিনি খুব ভালো একজন কেমিস্ট। তার বিভিন্ন পণ্যের ফর্মুলা তিনিই করে দেন। সে অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন রাসায়নিক ও কাঁচামাল কিনে এনে এই কারখানায় তার পণ্য তৈরি করেন। এজন্য তার রয়েছে কয়েকজন দক্ষ কারিগর, যারা আগে এসব পণ্য তৈরির কারখানায় কাজ করতো। তৈরি পণ্য বাজারজাতের আগে সেই বন্ধুকে দিয়ে পরীক্ষাও করিয়ে নেন।

বর্তমান বাজারে তার পণ্যের চাহিদা কেমন জিজ্ঞেস করতেই জানালেন, এখন বাজারে তার পণ্যের চাহিদা অনেক ভালো এবং দিনদিন আরো ভালো হচ্ছে। এরপর জানতে চাইলাম স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারছেন কিনা। প্রথমে মনে হলো তিনি আমার এই প্রশ্নটা বুঝতে পারেননি। তার চেহারায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেখতে পেয়ে আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। এবার তিনি বুঝতে পেরে জানালেন, কিছুটা পারছেন বলে মনে করেন। তবে এও জানালেন, এ ব্যাপারে পুরোপুরি সক্ষম হতে হলে উৎপাদন আরো অনেক বাড়াতে হবে। সম্ভাবনার কথা জানতে চাইলে বললেন– এ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। দেশে নির্মাণ কর্মকাণ্ড ক্রমবর্ধমান। পার্কিং টাইলস সেট করতে অনেক পুটিংয়ের দরকার হয়। বাড়ি ও ভবন নির্মাণে পার্কিং টাইলসের ব্যবহার বাড়ছে এবং বাড়তে থাকবে। সুতরাং তার পণ্যের চাহিদাও দিনদিন বাড়বেই।

ব্যক্তি জীবনেও খুব সুখী তিনি। বিয়ে করেছেন ১৯৯৯ সালে। স্ত্রী বিএ পাস। নাম সাহানুর আক্তার। তাদের এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে এইচএসসি পাস করেছে আর মেয়ে ক্লাস ফোরে পড়ে।

তার ইচ্ছে রয়েছে যেসব রাসায়নিক তিনি কিনে এনে পণ্য তৈরি করেন সেসব নিজেই তৈরি করবেন। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ কারখানা গড়ে তুলবেন। তবে এজন্য তার বাজার সারাদেশে বিস্তার করা ছাড়াও বিদেশে রফতানির যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে। অবশ্য এজন্য অনেক বেশি পুঁজির দরকার হবে। তবে তিনি মনে করেন– সদিচ্ছা যেহেতু রয়েছে, তাই লেগে থাকলে অবশ্যই তিনি তা পারবেন।

এরপর জানতে চাইলাম তার এই উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা কী কী। প্রথমেই বললেন পুঁজির স্বল্পতার কথা। তারপর জানালেন সরকারী প্রশাসনের নানা ধরনের নাজেহালের ব্যাপারটি। নানা অজুহাতে সরকারি নানা সংস্থার কর্মচারীরা খুব নাজেহাল করে তাকে। অবশ্য আরো কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে, তবে তা খুব সহজেই উতরে যাওয়া যায়।

কিছু নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করে তিনি এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে তার লক্ষ্য পূরণ করে চলেছেন। প্রমাণ করে চলেছেন সততা, আস্থাশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছেন তার বাজার।

জিজ্ঞেস করলাম নতুন কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তার জন্য তার পরামর্শ কী হবে। সারা মুখে এক নির্মল হাসি ছড়িয়ে বললেন, নতুন এ ধরনের উদ্যোগ নিতে হলে শতভাগ সৎ হতে হবে। সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস থাকতে হবে। বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে। এবং অবশ্যই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

তার ইচ্ছে রয়েছে যেসব রাসায়নিক তিনি কিনে এনে পণ্য তৈরি করেন সেসব নিজেই তৈরি করবেন। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ কারখানা গড়ে তুলবেন। তবে এজন্য তার বাজার সারাদেশে বিস্তার করা ছাড়াও বিদেশে রফতানির যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে। অবশ্য তাতে অনেক বেশি পুঁজির দরকার হবে। তবে তিনি মনে করেন– সদিচ্ছা যেহেতু রয়েছে, তাই লেগে থাকলে অবশ্যই তিনি তা পারবেন।

আপাতত তিনি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদন করছেন। ইচ্ছে রয়েছে ভবিষ্যতে অটোমেশনে যাবেন। তার জনবল মোট ১৮ জন। ১৭ জনই দক্ষ। এখনো তিনি খাতায় লিখে নিজেই গোটা ব্যবসার হিসেব সংরক্ষণ করেন। তবে জানালেন, ব্যবসা আরো বড় হলে আলাদা অ্যাকাউন্ট সেকশন খুলবেন।

সবশেষে তিনি জানালেন– এ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

এরপর আমি তার আরো উন্নতি কামনা করে বিদায় নেব, ঠিক সেই সময়ে একজন এসে কী বলতেই তিনি জানালেন, তার কাভার্ডভ্যান এসে গেছে এবং তাতে মাল লোড করা হচ্ছে। আমি সেই কাভার্ড ভ্যানের ছবি তুলে বিদায় নিলাম। ■

অ্যাকুয়াপনিক্স

একই সঙ্গে মাছ ও সবজি চাষ

ছাদে, বারান্দায়
বিদ্যুৎহীন গ্রামে নতুন সম্ভাবনা

জীবনকে বিলাসে মোড়াতে, সস্তায়-সহজে হাতের কাছে সব ভোগ-তুষ্টি-বিনোদন খাবলে খাবলে টেনে আনতে আমাদের কী নিষ্ঠুর-বিবেকহীন প্রতিযোগিতা! নিজেরটুকু আদায় করতে গিয়ে একটুও কসুর করি না প্রকৃতির স্নিগ্ধ-সৌন্দর্যে আলকাতরা লেপে দিতেও। দূষণে দূষণে মাটি-পানি-বাতাসকে বিষ করে দিতে একটুও বাধে না। আগে তো নিজে ভোগ করে নিই!– তাতে দুনিয়ার যা ঘটে ঘটুক। প্রকৃতির প্রতিটি কল্যাণ-কণা হাঁসফাঁস করতে থাকে আমাদের স্বার্থপর-নির্দয়-আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে। এইসব দেখে সচেতন মানুষের অনুতপ্ত আত্মার অতল থেকে গুঙিয়ে ওঠে রফিক আজাদের 'ক্ষমা করো বহমান হে উদার অমেয় বাতাস' কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা–

'আমি করজোরে ক্ষমা চাই :
ক্ষমা করো বহমান হে উদার অমেয় বাতাস
ক্ষমা চাই– লতাগুল্মময় বনভূমি, ক্ষমা করো'

আমরা বংলাদেশের বন উজাড় করছি, নদী দখল করে কারখানা গড়ে বাতাসে মেশাচ্ছি কালো ধোঁয়া, পানিতে ছাড়ছি তরল বর্জ্য। ঢাকা মহানগরী তো আবার এ ব্যাপারে আরেক কাঠি বাড়া! ধুলো-ধোঁয়া-আবর্জনা-কারখানাবর্জ্য-যানজট-দূষণে দিনদিনই বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে ঢাকা মহানগরীসহ দেশের অধিকাংশ নগর। এর রূঢ় বৈজ্ঞানিক প্রমাণও মিলেছে এই সেদিন। নেচার পত্রিকার বরাত দিয়ে ২০১৭ সালের ২৫ মার্চ বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের নাসার এক বিশেষ স্যাটেলাইটের পাঠানো তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের নেতৃত্বে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় বিশ্বের ১৮টি মেগাসিটির পরিবেশ দূষণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে সার্বিক বায়ুদূষণে ঢাকার অবস্থা পঞ্চম এবং বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস নিঃসরণের দিক দিয়ে ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে।

কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে চরম হতাশায় মানুষ কখনো থেমে যায়নি তার অগ্রযাত্রা থেকে। একটা না একটা উপায় সে ঠিকই বের করে ফেলেছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের রাহুগ্রাস থেকে উদ্ধারের উপায় নিয়ে যখন ভাবছিলাম ঠিক তেমনই এক সময় রিশাদ সন্ধান দিলেন প্রবল আশাজাগানিয়া এক গবেষণাকর্মের।

জানালেন ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের এক বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ফাইবার গ্লাস এবং জিআই শিটের ট্যাঙ্কে একই সঙ্গে মাছ ও শাকসবজি ফলাতে সক্ষম হয়েছেন। রিশাদ যেন কানে মধু ঢেলে দিল। কল্পনায় তাকিয়ে দেখলাম– ঢাকার প্রতিটি ছাদে এভাবে একইসঙ্গে মাছ ও সবজি চাষ হচ্ছে। ঢাকা হয়ে উঠেছে বিশ্বের সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব নগরীর অন্যতম। ঘোরটা কেটে যেতেই রিশাদকে পাকাকথা দিয়ে ফেললাম– ময়মনসিংহে যাব। সে অনুযায়ী ২২ ফেব্রুয়ারি (২০১৭) ভোরে আমি, রিশাদ এবং সিদীপের জেনারেল ম্যানেজার শেখ সেলিম রওনা হয়ে গেলাম ময়মনসিংহের পথে। দুপুর দেড়টা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এম ডি রায়হান হোসেন গন্তব্যে ঢোকার আগেই আমাদের স্বাগত জানালেন। তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন তাদের গবেষণাস্থল অ্যাকুয়াপনিক গার্ডেনে। দেখে যতটা না মুগ্ধ হলাম, ভেতরে ঢোকার পর তার প্রথম কথাটি শুনে মুগ্ধ হলাম তার চেয়ে অনেক বেশি। মাছ-গাছের যুগল বৈভবের প্রাণস্পর্শে দাঁড়িয়ে রায়হান প্রথমেই বললেন– 'জানেন তো, মাছের কাছাকাছি থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায় অনেক! মন ভালো হয়ে যায়। আমি নিজে পরীক্ষা করে করে এর সত্যতা পেয়েছি। অনুমতি পাওয়ার পরপরই ২০১২ সালে এ গার্ডেনটি যখন গড়ে তুলছিলাম তখন প্রায় সারাক্ষণ কাটত মাছের ট্যাঙ্কের কাছে। পানিতে মাছের এঁকেবেঁকে চলা আমাকে চুম্বকের মতো টানতো। মাছের কাছে গেলেই মন ভালো হয়ে যেতো। নিজের হাতে তখন এই স্থাপনার ইটও গেঁথেছি, জানেন?

তারপর তার মাছ ও গাছের ট্যাঙ্ক ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বললেন– আমাদের দেশের মাছচাষিরা টাকা খাটিয়ে মাছ চাষ শুরু করার পর খুব প্রয়োজনেও চার মাসের আগে এ থেকে টাকা তুলতে পারে না, কিন্তু আমি আমাদের এই অ্যাকুয়াপনিক পদ্ধতিতে এমন এক উপায় খুঁজে বের করেছি যাতে এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে একজন মাছচাষি প্রতি বিশদিন পরপরই মাছ বিক্রি করতে পারবেন। আমরা তিনজনই দারুণ অবাক হয়ে একইসঙ্গে তার দিকে ঘুরলাম। জেনারেল ম্যানেজার শেখ সেলিম তো প্রশ্নটা করেই ফেললেন–

... মানবসভ্যতার ইতিহাসে চরম হতাশায় মানুষ কখনো থেমে যায়নি তার অগ্রযাত্রা থেকে। একটা না একটা উপায় সে ঠিকই বের করে ফেলেছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের রাহুগ্রাস থেকে উদ্ধারের উপায় নিয়ে যখন ভাবছিলাম ঠিক তখনই সন্ধান পেলাম প্রবল আশাজাগানিয়া এক গবেষণাকর্মের। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের এক বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা একই সঙ্গে সম্পূরক উপায়ে মাছ ও শাকসবজি ফলাতে সক্ষম হয়েছেন। কল্পনায় তাকিয়ে দেখলাম– ঢাকার প্রতিটি ছাদে এভাবে একইসঙ্গে মাছ ও সবজি চাষ হচ্ছে। ঢাকা হয়ে উঠেছে বিশ্বের সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব নগরীর অন্যতম ...

'কীভাবে?' রায়হান এবার তাদের মাছের আধার, অর্থাৎ ট্যাঙ্কগুলো দেখাতে দেখাতে বুঝিয়ে বলতে শুরু করলেন– ' এই যে দেখেন, এখানে ৭টি মাছের ট্যাঙ্ক আছে। এই ৭টি ট্যাঙ্কে আমি একই বয়সের মাছ চাষ করব না। করব বিভিন্ন বয়সের মাছের চাছ। তাতে হবে কি– বিশদিন পরপরই একটি ট্যাঙ্কের মাছ বিক্রির উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর আমি প্রতি একুশ দিন পরপর হাইড্রোপনিক ট্রেগুলো থেকে লেটুস, টমেটো, কলমিশাক ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকি। এখানে আমি সফলভাবে স্ট্রবেরি চাষও করেছি!' ' কথাটা লুফে নিলেন শেখ সেলিম। বললেন– 'আপনি বলছেন বিশদিন পরপর, তা হলে আমি যদি মাছের ট্যাঙ্ক সাতটির বদলে বিশটি বা ত্রিশটি করি, তা হলে তো প্রতিদিনই মাছ বাজারে দিতে পারব, নাকি?' রায়হান তার কথায় সায় দিতেই তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনি প্রতি কিউবিক মিটারে কয়টি করে মাছের

পোনা ছাড়ছেন?' রায়হান জানালেন, তারা বাণিজ্যিক কারণে মাছ চাষ করেন না, করেন গবেষণার জন্য। তবে এখন তারা বিশ থেকে ত্রিশ গ্রামের আশিটি করে তেলাপিয়া ছাড়ছেন এক ঘন মিটারের প্রতিটি ট্যাঙ্কে। এ পর্যায়ে তার কাছে জানতে চাওয়া হলো তেলাপিয়া ছাড়া অন্য মাছ চাষ করা যাবে কিনা। রায়হান জানালেন, মনোসেক্স মাছ হলেই ভালো। তবে পাবদা, গুলসাও চাষ করা যাবে। সেক্ষেত্রে প্রতি ঘন মিটারে আড়াই শ পাবদার পোনা ছাড়া যাবে। এ কথার পিঠে শেখ সেলিম বললেন– 'আমরা যদি একুশটি ট্যাঙ্কে পাবদা চাষ করি তবে প্রতি তিনদিন পরপর আড়াই শ করে পাবদা বাজারে পাঠাতে পারব। প্রতিটির ওজন যদি দেড় শ গ্রাম হয় তা হলে তো বিশাল ব্যাপার! পাবদা অবশ্য বেশি বড় হয় না; আচ্ছা এক শ গ্রাম করেই ধরুন। তাহলে আড়াই শ মাছের ওজন হচ্ছে ২৫ কেজি। মন্দ না তো! খুবই ভালো! ৫০০ টাকা কেজি ধরলে সাড়ে ১২ হাজার টাকা!' এ সময় রিশাদ জানতে চাইলেন, এতে খরচ পড়ে কেমন? রায়হান জানালেন, এ ধরনের প্রতিটি ট্যাঙ্ক তৈরিতে খরচ পড়ে ৮ হাজার টাকা করে। তার মানে বাণিজ্যিকভাবে করতে গেলে একুশটি ট্যাঙ্কে খরচ পড়বে ১ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। রিশাদ তখন আমাদের দুজনকে বললেন– আপনারা তো আপনাদের অফিসের ছাদেই করতে পারেন!

এরপর আমরা অন্য প্রসঙ্গে এলাম। কিছুদিন আগে আমরা এই তিনজনেই ঘরের ভেতর মাছ চাষের এক চমৎকার প্রকল্প দেখতে গিয়েছিলাম সাইন্স ল্যাবরেটরিতে। সেখানে 'রিসার্কুলেটিং অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম (আরএএস) নামের এক চমৎকার মাছচাষ প্রকল্প দেখে এসেছিলাম। তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে দু জায়গায় এ পদ্ধতিতে মাছচাষ চলছিল– একটি সেই সাইন্স ল্যাবরেটরিতে, অন্যটি ব্যক্তি পর্যায়ে মংমনসিংহে। বেশ সফলভাবে তারা পাবদা ও তেলাপিয়া চাষ করে বাজারজাত করতে পেরেছেন। তবে এতে খরচ করতে হয় অনেক। অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি লাগে– যার পুরোটাই প্যাকেজ হিসেবে বিদেশ থেকে আনতে হয় চড়া দামে। সাইন্স ল্যাবরেটরির পুরো এই সিস্টেম আমদানি করা হয়েছে নেদারল্যান্ডস থেকে, আর ময়মনসিংহেরটা কানাডা থেকে। পুরো সেটআপের জন্য সে পদ্ধতিতে ৭০/৮০ লাখ টাকা খরচ করতে হয়। সেখানকার মূল যন্ত্রকৌশল হচ্ছে অক্সিজেন তৈরি করে তা ট্যাঙ্কের পানিতে সরবরাহ করা। সেখানকার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আমাদের জানিয়েছিলেন– এ পদ্ধতিতে তারা ৯৫ শতাংশ অক্সিজেন মেশাতে পারেন পানিতে। জবাবে জানালেন, ওরা রোজই পানিতে অক্সিজেন মেশালেও এখানে তারা নিয়মিত পানি পরীক্ষা করেন। পানিতে মাছের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে অক্সিজেন আছে কিনা তা তারা নিশ্চিত হয়ে নেন এসব পরীক্ষায়। মাছের জন্য দরকার ৫ থেকে ৯ পিপিএম অক্সিজেন, সেটি তারা পুনঃপুন ব্যবহৃত এ পানিতে পেয়ে যান। দিনে তারা চারবার আধাঘণ্টা করে পানি আন্দোলিত করে তাতে বাতাসের অক্সিজেন মেশান। যে সেটআপটি তিনি দেখাচ্ছিলেন সেটি মূলত ছাদে মাছ ও সবজি চাষের উপযোগী করে তৈরি করেছেন। মাছ ও গাছপালার (তারা এখানে কেবল লেটুসশাক, পালংশাক, কলমিশাক, টমেটো ইত্যাদি শাক-সবজি চাষ করে থাকেন) একসঙ্গে চাষের চক্রটা বুঝিয়ে বললেন এরপর। মাছের ট্যাঙ্ক থেকে মাছের বিষ্ঠা ও বাড়তি খাবার ট্যাঙ্কের নিচে জুড়ে দেয়া একটি পাইপ দিয়ে চলে যায় আলাদা একটি পাত্রে। সেখানে এসব বর্জ্যের কঠিন অংশ বের করে নিয়ে জৈবসার তৈরির জন্য রাখা হয় এবং তরল বর্জ্য নেয়া হয় আরেকটি বড় ট্যাঙ্কে। সেখানে মাঝখানে বায়ো ফিল্টারের ব্যবস্থা করেছেন তারা ট্যাঙ্কের মাঝামাঝি নুড়ি পাথর, বালু. ঝিনুকের গুঁড়ো ইত্যাদি। সেই বায়োফিল্টারে পরিশুদ্ধ পানিকে একটি পাম্পের সাহায্যে কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত হাইড্রোপনিক ট্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পানিতে মিশ্রিত নাইট্রেটকে গাছ তার শেকড় দিয়ে শুষে নেয় এবং পানিকে পরিশুদ্ধ করে। এই পরিশুদ্ধ পানিকে আবার একটি পাইপ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মাছের ট্যাঙ্কে। এরপর তিনি কিছুটা ব্যাখ্যা দেয়ার ঢঙে বললেন– 'এই অ্যাকুয়াপনিক সিস্টেম আমরা কেন করেছি জানেন? এটি গড়ে তোলার পেছনে অন্যতম কারণ পানির অভাব মোকাবেলা করে মাছ চাষ করা। আমাদের দেশে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে পানির খুব অভাব। তাই একই পানিকে পুনঃপুন ব্যবহারোপযোগী করে মাছ চাষ সম্প্রসারণই আমাদের মূল উকেণশ্য। তা ছাড়া এই পদ্ধতি খাদ্যনিরাপত্তার শতভাগ নিশ্চয়তা দেয়। এতে কোনো রকমের সার-কীটনাশক বা অন্য

অ্যাকুয়াপনিক কী?

অ্যাকুয়াপনিক হচ্ছে মিথোজীবী পরিবেশে একই সঙ্গে অ্যাকুয়াকালচার– অর্থাৎ শামুক, মাছ, বাগদাচিংড়ি বা চিংড়ি এবং হাইড্রোপনিক– অর্থাৎ পানিতে গাছপালা চাষ করা। সাধারণ অ্যাকুয়াকালচার পদ্ধতিতে চাষকৃত মাছ বা অন্যান্য জলজ প্রাণী পাত্রের পানিকে নোংরা করে এক সময় বিষাক্ত করে তোলে। কিন্তু অ্যাকুয়াপনিক পদ্ধতিতে অ্যাকুয়াকালচারের পাত্রের পানিকে হাইড্রোপনিক আধারে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে অ্যাকুয়াকালচার পাত্রে চাষকৃত মাছ বা অন্যান্য জলজপ্রাণীর বিষ্ঠা, বাড়তি খাবারসহ অন্য ময়লা মিশ্রিত পানিকে নাইট্রিফাইয়িং ব্যাকটেরিয়া (যে ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন চক্র কাজে লাগিয়ে অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়ামকে নাইট্রাইটে রূপান্তর করে বা নাইট্রাইটকে নাইট্রেডে রূপান্তর করে) প্রাথমিকভাবে নাইট্রাইটে এবং পরবর্তীতে নাইট্রেটে পরিণত করে, যাকে হাইড্রোপনিক আধারের ট্রেতে চাষ করা গাছপালা পুষ্টিদায়ক তরল হিসেবে ব্যবহার করে, অর্থাৎ এ পানি থেকে গাছ পুষ্টি সংগ্রহ করে এই পানিকে পরিশুদ্ধ করে এবং এই পরিশুদ্ধ পানিকে তখন আবারো অ্যাকুয়াকালচার পাত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অ্যাকুয়াপনিক ও হাইড্রোপনিক সমন্বয়ের মুনশিয়ানা, দক্ষতার সঙ্গে মাছ ও গাছের প্রজাতি বাছাই এবং যথোচিত ব্যবস্থাপনা একজন উদ্যোক্তাকে যেমন নিশ্চিত মুনাফার মুখ দেখাতে পারে, তেমনি ছাদে-বারান্দায়-আঙিনায় এর ব্যাপক ব্যবহার পরিবেশ বিপর্যয় রোধের যুতসই এক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

নিচের দুটি তথ্যই বলে দেয় অ্যাকুয়াপনিক্সের শেকড় প্রাচীন ইতিহাস পর্যন্ত বিস্তৃত, যদিও প্রথম তথ্যটির ক্ষেত্রে অনেকেই সন্দিহান।

- অ্যাজটেকরা কৃষিদ্বীপ তৈরি করে চাষ করতো, যা চিনাম্পাস নামে পরিচিত। এই চিনাম্পাস পদ্ধতির চাষাবাদকে অনেকেই কৃষিতে অ্যাকুয়াপনিক্সের প্রথম ব্যবহার বলে বিবেচনা করেন। এ পদ্ধতিতে কোনো অগভীর হ্রদে স্থির দ্বীপ বা ভাসমান কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করে তাতে চাষ করা হতো।
- দক্ষিণ চীন, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় ধানক্ষেতে মাছ চাষ করা হয়ে আসছে অনেক আগে থেকেই– যা ছিল অ্যাকুয়াপনিক্সের প্রথমদিকের জন্য অন্যতম উদাহরণ।

কোনো রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় না। এরপর তিনি কোন কোন খাতে কী পরিমাণ টাকা খরচ করতে হবে তার ফিরিস্তি তুলে ধরে বললেন– ছাদে অ্যাকুয়াপনিকের এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ সেটআপ তৈরিতে খরচ পড়বে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা।

এরপর তিনি আমাদের নিয়ে চললেন বিদ্যুৎবিহীন গ্রাম বা চর এলাকার জন্য তার তৈরি করা অ্যাকুয়াপনিক সেটআপটা দেখাতে। এটি করা হয়েছে খোলা জায়গায়। ঠিক গ্রামে একজন চাষি বা চাষিবউ যেমনটি করতে পারবেন। মূল পদ্ধতিটা প্রায় একই রকমের, শুধু পরিশুদ্ধ পানিকে আবারো মাছের ট্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটি চাপকল। তবে এখানে কোনো পাম্প ব্যবহার না করে অটো গ্রাভিটেশনের মাধ্যমে পানিকে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামের একজন গৃহবধূ সকালে সংসারের কাজ সেরে চাপকল চেপে মাটির নিচে তৈরি করা ট্যাঙ্ক থেকে পানি মাছের ট্রেতে দিতে পারেন। দিনে তিনবার দশ মিনিট করে এভাবে চাপকল চেপে পানি দিতে পারলেই যথেষ্ট।

এরপর তিনি আমাদের বড় শেডটিতে বড় পরিসরে করা অ্যাকুয়াপনিক সিস্টেম দেখাতে নিয়ে চললেন। হাঁটতে হাঁটতে জানালেন– কী করে ইন্টারনেট ঘেঁটে এই অ্যাকুয়াপনিকের সন্ধান পান। যুক্তরাষ্ট্রের সেই অধ্যাপক ড. জেমস র‍্যাকোসির পুরো সেটআপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বাংলাদেশের উপযোগী করে এটিকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার মূল কৃতিত্বটুকু তার। রাতদিন পাগলের মতো লেগে থেকে ২০১২ সালে ছয়মাসে তিনি এটির বাস্তব রূপ দিতে পেরেছিলেন। তবে তার আক্ষেপ একটাই– যুক্তরাষ্ট্রে ড. র‍্যাকোসি প্রতিদিন একটি মাছকে চার গ্রাম করে বাড়াতে পারছেন, আর তিনি এ ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে আছেন। তবে জোর গলায় বললেন– এখানে উৎপাদিত মাছ বাজারের মাছের চেয়ে সুস্বাদু এবং মানবস্বাস্থ্যের জন্য শতভাগ নিরাপদ।

রায়হানের এই গবেষণা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের জন্য তা এক বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। শুরুতে যেমনটি বলেছিলাম– ঢাকার প্রতিটি ছাদে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব হলে শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নয়, নিরাপদ-সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতেও তা অনন্য দৃষ্টান্ত রাখবে– এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এক স্বাপ্নিক, লড়াকু তরুণ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম তখন আমার হৃদয় ভরা আশালতায় ফুটতে শুরু করেছে ফুল।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনে পুকুরে একই সঙ্গে মাছ এবং বহুমুখী কৃষি– অর্থাৎ একেক প্লটে একই সাথে আড়াই একরেরও বেশি জায়গায় বেশ কয়েক রকমের শস্য– যেমন ধান, গম, চান্না শাপলা নামের এক ধরনের শাপলা ইত্যাদি চাষ করা হয়।

অনেকেই আধুনিক অ্যাকুয়াপনিকের কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের নিউ আলকেমি ইনস্টিটিউট এবং নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটির ড. মার্ক ম্যাকমার্টি ও অন্যদের, যারা এই পদ্ধতির বেশকিছু উন্নতিসাধন করেছেন। তবে অ্যাকুয়াপনিকর আধুনিক পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন যুক্তরাষ্ট্রেরই ইউনিভার্সিটি অব দ্য ভার্জিনিয়া আইল্যান্ডের অধ্যাপক ড. জেমস র‍্যাকোসি এবং তার সঙ্গীরা। অ্যাকুয়াপনিক পদ্ধতি নির্ভর করে বিভিন্ন জৈব উপাদানের সফলভাবে ব্যবহারের ওপর। এ পদ্ধতির প্রধান তিনটি জৈব উপাদান হচ্ছে মাছ বা অন্য যে কোনো জলজ প্রাণী, গাছপালা ও ব্যাকটেরিয়া। কোনো কোনো অ্যাকুয়াপনিক পদ্ধতিতে কেঁচোও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাকইয়ার্ড অ্যাকুয়াপনিক ম্যাগাজিনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আধুনিক অ্যাকুয়াপনিকর জনক ড. জেমস র‍্যাকোসিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিন আইল্যান্ডে এই অ্যাকুয়াপনিক পদ্ধতি কীভাবে চালু হয়েছিল? জবাবে তিনি বলেছিলেন– তিনি ৩০ বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এ কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত। ২৩ বছর আগে থেকে তিনি এখানকার 'অ্যাগ্রিকালচারাল এক্সপেরিমেন্ট স্টেশনে'র পরিচালক হিসেবে কর্মরত। প্রথমে তারা এ পদ্ধতিকে 'ইনটেগ্রেটেড সিসটেম' বলতেন। একটি সংক্ষিপ্ত কোর্সের আগে ছাত্ররা এটির নাম দিল 'অ্যাকুয়াপনিক'। আগের নামের চেয়ে এ নামটা তার ভালো লেগে গেল এবং সেই থেকে এটি অ্যাকুয়াপনিক নামেই পরিচিত। পিএইচডি রিসার্চের জন্য এই পদ্ধতিতে তারা একই সঙ্গে তেলাপিয়া মাছ, জলজ গাছ– পানিফল, কলমি

বিদ্যুৎবিহীন গ্রাম বা চর এলাকার জন্য তার তৈরি করা অ্যাকুয়াপনিক সেটআপটা গড়ে তোলা হয়েছে খোলা জায়গায়। ঠিক গ্রামে একজন চাষি বা চাষিবউ যেমনটি করতে পারবেন। মূল পদ্ধতিটা প্রায় একই রকমের, শুধু পরিশুদ্ধ পানিকে আবারো মাছের ট্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটি চাপকল। তবে এখানে কোনো পাম্প ব্যবহার না করে অটো গ্রাভিটেশনের মাধ্যমে পানিকে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামের একজন গৃহবধূ সকালে সংসারের কাজ সেরে চাপকল চেপে মাটির নিচে তৈরি করা ট্যাঙ্ক থেকে পানি মাছের ট্রেতে দিতে পারেন। দিনে তিনবার দশ মিনিট করে এভাবে চাপকল চেপে পানি দিতে পারলেই যথেষ্ট।

শাক ও শালুক চাষ শুরু করেছিলেন। এরপর পরীক্ষামূলকভাবে তারা এতে স্থলজ উদ্ভিদ চাষ শুরু করলে বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছিলেন ডাঙার গাছও এ পদ্ধতির হাইড্রোপনিক ট্রেতে বেশ ভালো জন্মে। তিনি আরো অবাক হয়ে দেখলেন মাছের বর্জ্য গাছের পুষ্টি হিসেবে বেশ ভালো ফল দিচ্ছে।

এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই পদ্ধতির শুরুটা কেমন ছিল? তিনি জানিয়েছিলেন– তখন তাদের তেমন কোনো গবেষণা সুযোগ-সুবিধা ছিল না। ইস্পাতের দেয়ালের ওপর ভিনিলের (এক ধরনের প্লাস্টিক) আবরণ দেয়া সস্তা কয়েকটা সুইমিংপুল ছিল এবং তাদের এ দিয়েই অ্যাকুয়াকালচারের একটি প্রদর্শনী খামার গড়ে তুলতে বলা হয়। তবে অ্যাকুয়াপনিক পদ্ধতির প্রথম পরীক্ষামূলক খামারটি গড়ে তোলা হয়েছিল তিনটি ধাতব তেলের পিপে দিয়ে। একটা পিপে ব্যবহার করা হয়েছিল মাছ চাষের

জন্য। অন্য পিপেটি মাঝখান থেকে কেটে দু ভাগ করে দুটি হাইড্রোপনিক বেড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এর একটিকে নিচে মোচাকৃতির একটি আলাদা ধাতব অংশ ওয়েল্ডিং করে জুড়ে দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল পানি পরিশুদ্ধকাজে। বাকিটির নিচ দিয়ে বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। অ্যাকুয়াপনিক পদ্ধতির প্রথম পিপেতে তারা কাজ শুরু করেছিলেন ৩০ বছর আগে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বড় মাপের খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া গড়ে তোলা। আর তাই তারা ট্যাঙ্কগুলোতে ৩ হাজার গ্যালন পানি ব্যবহার করার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে ছিল ২০ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া এবং ১৬ ইঞ্চি গভীর দুটি হাইড্রোপনিক ট্যাঙ্ক। তাদের তখন এ ধরনের ৬টি সেট গড়ে তোলার দরকার ছিল, যাতে বৈজ্ঞনিক নির্ভুলতার জন্য ২ পর্যায়ে এগুলোকে তিনবার করে ব্যবহার করা যায়। প্রথমে তারা ট্যাঙ্কের তলায় নুড়ি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু দেখলেন নুড়ি দিয়ে কাজ চালানো খুব কঠিন এবং বাণিজ্যিকভাবে বড় পরিসরের উৎপাদনে এগুলো ব্যবহার সুবিধাজনক নয়। প্রথমে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কঠিন বস্তু অপসারণের পর ভাসমান পদ্ধতি ব্যবহার করে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবেন। কিন্তু বাণজ্যিক উৎপাদনের জন্য অবশেষে তারা বর্তমানের এই পদ্ধতিটিই বেছে নেন। এতে তারা মাছ চাষের জন্য ৪টি ট্যাঙ্ক ব্যবহার করছেন, বড় ধরনের উৎপাদনে যাচ্ছেন না, যাতে কোনো তালগোল পাকিয়ে না যায় এবং ছয় সপ্তাহ পরপর একপ্রস্থ মাছ উৎপাদন করা যায়। আর শাক-সবজি, শস্য উৎপাদনের জন্য তারা ৬টি ১০০ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া এবং ১৬ ইঞ্চি গভীর হাইড্রোপনিক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করছেন। এটি কোনো উচ্চতর প্রযুক্তি নয় ঠিকই, কিন্তু এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে চাষিরা খুব সহজেই তা ব্যবহার করতে পারে।

এর পর ড. জেমস র‍্যাকোসির কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, অ্যাকুয়াপনিক পদ্ধতির বড় বড় সুবিধাগুলো কি কি? জবাবে তিনি জানান, 'আমি কখনো ভাবতেই পারিনি নিছক শখ থেকে বাড়ির পিছন-উঠোনে মাছ ও সবজি চাষে এতো মানুষ এটি ব্যবহার করবে! যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রায় ১৫০০ অ্যাকুয়াপনিক খামার রয়েছে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে স্কুলগুলোতে এর ব্যবহার। হাতে-কলমে বিজ্ঞানশিক্ষা দিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১০০০ স্কুলে অ্যাকুয়াপনিক পদ্ধতি গড়ে তোলা হয়েছে। আমি রোজ ভূরি ভূরি ই-মেইল পাচ্ছি– যাতে থাকছে এ পদ্ধতি নিয়ে হাজারো প্রশ্ন। এতেই বোঝা যায় এ পদ্ধতির ভবিষ্যত কতটা উজ্জ্বল! ■